KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫০৮/২, যোধপুর পার্ক, কল-৬৮
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 23/4 24/1 26/1 26/2	Year of Publication : Sep - 2002 Oct - 2002 Oct - 2004 May - 2005 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, রাহুল সেন	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

গ্রীষ্ম ১৪১২

বিশেষ কবিতা সংখ্যা

প্রধান সম্পাদক ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
সম্পাদক ॥ রাহুল সেন

কবিতাসমগ্রের কাছাকাছি

রাম বসু-র

কাব্যগ্রন্থের এক পূর্ণাঙ্গ সংকলন

একুশ শতক
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা - ৭৩

বিনিময় - ৩০০ টাকা

❖❖❖❖

সাংস্কৃতিক খবর
আগামী সংখ্যা: বিষয় **ওমর খৈয়াম**

প্রায় দেড়শোটি রুবাই-এর অনুবাদ

অনুবাদক : সৈয়দ মুজতবা আলী, কাজী নজরুল ইসলাম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অক্ষয়কুমার বড়াল, নরেন্দ্র দেব, কান্তি ঘোষ, কান্তি সিংহ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি দাশ, কাজল চক্রবর্তী প্রমুখ

অন্যান্য আকর্ষণ

ওমর খৈয়াম বিষয়ক অন্যান্য লেখা

ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদার, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, আনন্দ ঘোষ হাজরা, অনির্বাণ রায়চৌধুরী, অরুণ বসু, ড. সুমিতা চক্রবর্তী

এছাড়া

সমকালীন বাঙালি কবিদের ওমর খৈয়ামকে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ

সাংস্কৃতিক খবর

ই ই - ১৫০/১ এ, সল্টলেক, কলকাতা-৯১
কলেজ স্ট্রিট
প্রযত্নে: *কিশোর দুনিয়া*, ৬ ডি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বিশেষ কবিতা সংখ্যা
১৪১২

সূচি

সম্পাদকীয়

অপ্রকাশিত কবিতা

জীবনানন্দ দাশ ৩
প্রেমেন্দ্র মিত্র ৪
বুদ্ধদেব বসু ৫
সঞ্জয় ভট্টাচার্য ৭
বিষ্ণু দে ১০

অপ্রকাশিত আলেখ্য

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১১

কবিতাগুচ্ছ

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় (তিনটি কবিতা) ❑ রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী ❑ নরেশ গুহ (দুটি কবিতা) ❑ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ❑ রাম বসু ❑ সিদ্ধেশ্বর সেন ❑ অরবিন্দ গুহ (তিনটি কবিতা) ❑ কৃষ্ণ ধর (দুটি কবিতা) ❑ শঙ্খ ঘোষ ❑ সুনীলকুমার নন্দী ❑ শামসুর রাহমান ❑ বেণু দত্তরায় (দুটি কবিতা) ❑ মণীন্দ্র গুপ্ত ❑ দীপংকর দাশগুপ্ত (চারটি কবিতা) ❑ তরুণ সান্যাল (তিনটি কবিতা) ❑ আনন্দ বাগচী (দুটি কবিতা) ❑ বটকৃষ্ণ দে ❑ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় (দুটি কবিতা) ❑ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ❑ যুগান্তর চক্রবর্তী ❑ আল মাহমুদ ❑ শিবশম্ভু পাল (তিনটি কবিতা) ❑ তারাপদ রায় (দুটি কবিতা) ❑ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ❑ সুধেন্দু মল্লিক (তিনটি কবিতা) ❑ দিব্যেন্দু পালিত ❑ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ❑ অমিতাভ দাশগুপ্ত (দুটি কবিতা) ❑ উৎপলকুমার বসু ❑ বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ❑ প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

❑ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ বিনয় মজুমদার ❑ সমীর রায়চৌধুরী (দুটি কবিতা) ❑ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (দুটি কবিতা) ❑ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ❑ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (দুটি কবিতা) ❑ ভূমেন্দ্র গুহ ❑ নবনীতা দেব সেন ১৭-৭০

অপ্রকাশিত চিঠি

বিষ্ণু দে ❑ বুদ্ধদেব বসুকে লেখা (ভূমিকা ও সূত্রনির্দেশ সহ) ৭১

কবিতাগুচ্ছ

মণিভূষণ ভট্টাচার্য (দুটি কবিতা) ❑ কবিরুল ইসলাম (তিনটি কবিতা) ❑ বাসুদেব দেব ❑ রত্নেশ্বর হাজরা ❑ বিজয়া মুখোপাধ্যায় ❑ শান্তি সিংহ (তিনটি কবিতা) ❑ তুষার রায় ❑ পবিত্র মুখোপাধ্যায় (দুটি কবিতা) ❑ বিনোদ বেরা (তিনটি কবিতা) ❑ বেলাল চৌধুরী ❑ নির্মলেন্দু গুণ ❑ হেমোপম দস্তিদার ❑ অরুণেশ ঘোষ ❑ সুবিনয় ধর (দুটি কবিতা) ❑ জগদিন্দ্র মণ্ডল ❑ দেবী রায় (দুটি কবিতা) ❑ আনন্দ ঘোষ হাজরা (দুটি কবিতা) ❑ তুলসী মুখোপাধ্যায় (দুটি কবিতা) ❑ অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ❑ প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ ❑ কমল দে সিকদার ❑ উত্তম দাশ ❑ চিন্ময় গুহঠাকুরতা (দুটি কবিতা) ❑ সুব্রত চক্রবর্তী ❑ বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত (দুটি কবিতা) ❑ অভী সেনগুপ্ত ❑ দেবারতি মিত্র ❑ অরণি বসু ❑ কালীকৃষ্ণ গুহ ❑ আশিস সান্যাল ❑ রবিউল হুসাইন ❑ মৃণাল বসুচৌধুরী ❑ গৌরী ধর্মপাল (দুটি কবিতা) ❑ বিজয়কুমার দত্ত ❑ মতি মুখোপাধ্যায় ❑ খালেদা এদিব চৌধুরী ❑ প্রণব চট্টোপাধ্যায় ❑ গোবিন্দ গোস্বামী (দুটি কবিতা) ❑ অর্চনা আচার্যচৌধুরী ❑ অসীম সেনগুপ্ত ৭৯-১২২

আলোচনা

বুদ্ধদেব বসুর মহাভারত-ভাবনা ❑ অমিয় দেব ১২৫

কবিতাগুচ্ছ

মহাদেব সাহা ❑ সুব্রত রুদ্র ❑ পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল ❑ নবারুণ ভট্টাচার্য ❑ বীতশোক ভট্টাচার্য (দুটি কবিতা) ❑ রণজিৎ দাশ (দুটি কবিতা) ❑ অমিতাভ গুপ্ত (দুটি কবিতা) ❑ সব্যসাচী দেব (দুটি কবিতা) ❑ শ্যামলকান্তি দাশ ❑ পার্থ রাহা ❑ অরুণকুমার চক্রবর্তী ❑ সাযযাদ কাদির (তিনটি কবিতা) ❑ গৌতম বসু ❑ অভিরূপ সরকার ❑ মঞ্জুভাষ মিত্র ❑ অজয় নাগ ❑ মৃত্যুঞ্জয় সেন ❑ কমল চক্রবর্তী (দুটি কবিতা) ❑ প্রমোদ বসু (দুটি কবিতা) ❑ নমিতা চৌধুরী (দুটি কবিতা) ❑ নির্মল বসাক (দুটি কবিতা) ❑ সোমক দাস ❑ বাণী বসু ❑ প্রদীপচন্দ্র বসু ❑ কৃষ্ণা বসু ❑ হাবীবুল্লাহ সিরাজী ❑ তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ সুজিত সরকার ❑ গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ কল্যাণ মজুমদার ❑ অজিত বাইরী (দুটি কবিতা) ❑ ভক্তিব্রত চক্রবর্তী ❑ অশোক রায়চৌধুরী (তিনটি কবিতা) ❑ অমিতাভ চৌধুরী ❑ বাঁধন সেনগুপ্ত (দুটি কবিতা) ❑ নাসির আহমেদ (দুটি কবিতা) ❑ পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় (দুটি কবিতা) ❑ শ্যামলেন্দু রায় ❑ মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (দুটি কবিতা) ❑ সৈয়দ কওসর জামাল ❑ সুবোধ সরকার (দুটি কবিতা) ❑ হাসান হাফিজ ❑ সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় ❑ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় (দুটি কবিতা) ❑ মলয় গোস্বামী ❑ আবদুস শুকুর খান (দুটি কবিতা) ❑ বিকাশ পাল ❑ প্রদীপ দাশগুপ্ত ❑ সুবীর ঘোষ ❑ দীপক কর ❑ শংকর চক্রবর্তী ❑ পঙ্কজ সাহা ❑ দীপক লাহিড়ী ❑ নীলাচার্য ❑ চন্দনা খান ১৪১-১৯৬

অনুবাদ কবিতা

ইরাকি কবিতা ❑ আল সায়্যাব (অনুবাদ: অভী সেনগুপ্ত) ১৯৯

ফরাসি কবিতা ❑ অঁদ্রে ভেলতের (অনুবাদ: সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়) ২০৬

পর্তুগিজ কবিতা ❑ ফার্নান্দো পেসোয়া (অনুবাদ: প্রীতি সান্যাল) ২০৯

কবিতাগুচ্ছ

রেজাউদ্দিন স্টালিন (তিনটি কবিতা) ❑ গৌতম ঘোষদস্তিদার ❑ দেবাঞ্জন চক্রবর্তী ❑ প্রীতি সান্যাল ❑ নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ❑ শেখর আহমেদ ❑ কানাইলাল জানা ❑ কাজল চক্রবর্তী (দুটি কবিতা) ❑ নাসের হোসেন (দুটি কবিতা) ❑ চৈতালি চট্টোপাধ্যায় ❑ চিত্রা লাহিড়ী (দুটি কবিতা) ❑ রাজকুমার রায়চৌধুরী (তিনটি কবিতা) ❑ অনিতা অগ্নিহোত্রী (তিনটি কবিতা) ❑ দীপ সাউ ❑ মল্লিকা সেনগুপ্ত ❑ মুহাম্মদ সামাদ ❑ দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় ❑ শ্যামলবরণ সাহা ❑ সঞ্জীব প্রামাণিক ❑ রামকিশোর ভট্টাচার্য ❑ অনীক রুদ্র ❑ সৌগত চট্টোপাধ্যায় (দুটি কবিতা) ❑ সুতপা সেনগুপ্ত ❑ আসলাম সানী ❑ ঈশিতা ভাদুড়ী (দুটি কবিতা) ❑ সুনীল করণ (দুটি কবিতা) ❑ সুশান্ত রায় ❑ টোকন ঠাকুর (দুটি কবিতা) ❑ দেবাশিস চাকী ❑ অঞ্জলি দাশ ❑ রাহুল পুরকায়স্থ ❑ মন্দার মুখোপাধ্যায় ❑ প্রবালকুমার বসু ❑ সঞ্চয়িতা কুণ্ডু (দুটি কবিতা) ❑ সৈয়দ হাসমত জালাল ❑ বীথি চট্টোপাধ্যায় ❑ বাদল ঘোষ ❑ বাসব দাশগুপ্ত ❑ প্রবীর রায় (তিনটি কবিতা) ❑ যশোধরা রায়চৌধুরী ❑ সিদ্ধার্থ সিংহ (দুটি কবিতা) ❑ বিশ্বজিৎ রায় ❑ হাফিজ রশিদ খান (দুটি কবিতা) ❑ তাপস রায় ❑ অলোককুমার বসু (দুটি কবিতা) ❑ মনিকা রায় (দুটি কবিতা) ❑ মানসকুমার চিনি ❑ জ্যোতির্ময় ওয়াদ্দাদার (দুটি কবিতা) ❑ উপাসক কর্মকার ❑ দীপা ঘোষ ❑ উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় ❑ ইন্দ্রাণী দত্ত পান্না ❑ কল্যাণ দাশগুপ্ত ❑ বিপ্লব ঘোষ ❑ গৌতম মুখোপাধ্যায় ❑ সুরজিৎ বসু ❑ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ❑ সুনন্দা মিত্র ২১৩-২৬৬

অনুবাদ কবিতা

ফরাসি কবিতা ❑ মাক্স জাকব (অনুবাদ: পলাশ ভদ্র) ২৬৯

ফরাসি কবিতা ❑ জাক ক্রিকিয়োঁ (অনুবাদ: তৃণাঞ্জন চক্রবর্তী) ২৭০

স্পেনের কবিতা ❑ পাবলো নেরুদা (অনুবাদ: সৌগত চট্টোপাধ্যায়) ২৭৪

স্পেনের কবিতা ❑ হোসে মার্তি (অনুবাদ: গৌতমকুমার দে) ২৭৬

কবিতাগুচ্ছ

পিনাকী ঠাকুর ❑ শিবাশিস মুখোপাধ্যায় ❑ মন্দাক্রান্তা সেন ❑ রূপক চক্রবর্তী (দুটি কবিতা) ❑ সেবন্তী ঘোষ ❑ অভীক মজুমদার ❑ সুনীল আচার্য (দুটি কবিতা) ❑ চিরঞ্জীব বসু (দুটি কবিতা) ❑ শ্রীজাত (দুটি কবিতা) ❑ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় (দুটি কবিতা) ❑ অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ কৌশিক চক্রবর্তী (তিনটি কবিতা) ❑ সৌমনা দাশগুপ্ত (দুটি কবিতা)

❑ শমিত মণ্ডল ❑ অংশুমান কর (তিনটি কবিতা) ❑ তুষার ভট্টাচার্য ❑ মিতুল দত্ত ❑ মলয় দে (দুটি কবিতা) ❑ অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় ❑ সন্দীপন চক্রবর্তী ❑ বল্লরী সেন ❑ মোনালিসা চট্টোপাধ্যায় ❑ বিক্রম পাকড়াশী (চারটি কবিতা) ❑ সৌরভ মুখোপাধ্যায় ❑ সুমন্ত্র রায় ❑ সুস্মেলী দত্ত (দুটি কবিতা) ❑ হিন্দোল ভট্টাচার্য (দুটি কবিতা) ❑ স্নেহাশিস পাল (দুটি কবিতা) ❑ সুমন গুণ ❑ তীর্থশঙ্খ মজুমদার ❑ সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য ❑ পাপড়ি গঙ্গোপাধ্যায় ❑ সংঘমিত্রা চক্রবর্তী ❑ অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ শবরী ঘোষ ❑ সত্যজিৎ গুপ্ত ❑ হিমালয় জানা (তিনটি কবিতা) ❑ অহনা পাণ্ডা ❑ রজতশুভ্র মজুমদার ❑ দেবজ্যোতি মণ্ডল (তিনটি কবিতা) ❑ ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী ❑ সুপ্রকাশ ঘোষ ❑ অরিন্দম নিয়োগী ❑ অদিতি ঘোষ

২৮১-৩২৪

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

RN 30017/76

Declaration U/S of the Press & Registration of Book Act.

১। **প্রকাশের স্থান** : ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮

২। **প্রকাশের কালানুক্রম** : ত্রৈমাসিক

৩। **প্রধান সম্পাদকের নাম** : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
সম্পাদকের নাম : রাহুল সেন
জাতীয়তা : ভারতীয়। **ঠিকানা** : ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮

৪। **মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম** : রাহুল সেন
জাতীয়তা : ভারতীয়। **ঠিকানা** : ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮

৫। **স্বত্বাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা** :
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ও রাহুল সেন। ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮

আমি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(স্বা) সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয়

সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে প্রকাশিত হল 'বিশেষ কবিতা সংখ্যা'। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণঅসাধ্য কারণে বিগত বছরে কোনো 'কবিতা সংখ্যা' প্রকাশিত হয়নি।

বর্তমান সংখ্যায় কবিতার সংখ্যা, পূর্বতন কবিতাসংখ্যাগুলির তুলনায় অনেক বেশি। সমকালীন বাংলা কবিতার একটা সামগ্রিক চেহারা তুলে ধরবার আন্তরিক চেষ্টা এই সংকলনে করা হয়েছে। ঠাঁই পেয়েছে বিভিন্ন ধরন, মনন ও মানের কবিতা। বলাই বাহুল্য প্রতিটি ক্ষেত্রে কবিতার মান পাঠকদের মনোনয়ন না পেতেই পারে। আমরা শুধু চেয়েছি কবিতা নামক অন্তঃশীলা নদীটির প্রতিটি বাঁক, অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা ক্ষুদ্রতম নুড়িটিরও পরিচয় পাঠকসমক্ষে উন্মোচিত হোক।

রয়েছেন পূর্বসূরিরা। এ-ছাড়া বিস্মৃতনাম ও অকালপ্রয়াত কবিদের কিছু আশ্চর্য উজ্জ্বল কবিতা। কিন্তু আমাদের বিস্মিত করেছে তরুণতরদের কাব্যসম্ভার। কি অসামান্য বিচ্ছুরণ এক-একটি কবিতায়। প্রচারের আলো এখনো এদের অনেককেই আলোকিত করেনি, তাই আশ্চর্য মাটির গন্ধ এদের অনেকেরই গায়ে এখনো লেগে।

তবু কোনো কোনো রচনাপ্রকাশ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠবে। আমরাও সেটাই চাই। এই 'প্রশ্ন'ই হয়তো কবিকে একদিন মহৎ কোনো কবিতার দিকে নিয়ে যাবে, একইসঙ্গে তাকে সতর্কও করবে।

বিগত তিনটি সংকলনের তুলনায় এবারে অনুবাদ কবিতার সংখ্যা কম। আবেগের প্রসার সুদূর হলেও মুদ্রণসংক্রান্ত-ব্যয় যেহেতু একটা পর্যায়ের পর আমাদের পথ আগলে দাঁড়ায়, নবীন কবিদের কাছে দরোজা খুলে রাখবার জন্যই এ-ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে আমরা কিছুটা সংযত হয়েছি। ভবিষ্যতের জন্য অবশ্যই আমাদের প্রতিশ্রুতি রইল।

যতিচিহ্ন-বর্জন বর্তমানে এক বহুল প্রচলিত অভ্যাস। কবিরা অনেকেই আজকাল কবিতাকে কোনো সীমান্তে বাঁধতে চান না। এই প্রবণতা এত ব্যাপক যে পাঠকদের অনেক সময়ই তা মুদ্রণ-সংক্রান্ত ত্রুটি বলে মনে হতে পারে। এই সংখ্যাটি তার সাক্ষ্য দেবে।

এই সংকলনকে হয়তো কিছুটা দুঃখিত করেছে 'আলো'। প্রচারের আলো কোনো কোনো কবিকে সুদূরপ্রবাসী রেখেছে। আমরা এদের জন্য আন্তরিক দুঃখিত।

শেষে কৃতজ্ঞতা জানাই সহৃদয় পাঠক, শুভানুধ্যায়ী এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের। এদের প্রশ্রয়েই অতিক্রান্ত হল দীর্ঘ তিরিশ বছর।

বিনীত নমস্কারান্তে
রাহুল সেন
সম্পাদক : বিভাব

সম্পাদকমণ্ডলী
কলকাতা
পবিত্র সরকার ❖ প্রদীপ দাশগুপ্ত
শান্তিনিকেতন
অরুণ মুখোপাধ্যায় ❖ অনাথনাথ দাশ ❖ স্বপনকুমার ঘোষ

সম্পাদক
রাহুল সেন

প্রধান সম্পাদক
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

যোগাযোগ কেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সম্পাদকীয় দপ্তর
'বিভাব'
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক (দ্বিতল)। কলকাতা - ৬৮।
দূরভাষ : ২৪৭৩ ৩৬০০
চলমান : ৯৮৩১৩ ০৯৪০৯

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ
রূপায়ণ : অভিজিৎ নাথ

প্রাপ্তিস্থান : *পাতিরাম*
দে বুক স্টোর্স

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা -৬৮ থেকে প্রকাশিত,
'বর্ণনা', ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা - ৩২ থেকে অক্ষরবিন্যস্ত ও
'বর্ণনা প্রকাশনী', ৪/১০এ বিজয়গড়, কলকাতা - ৩২ থেকে মুদ্রিত।

অপ্রকাশিত

কবিতা

জীবনানন্দ দাশ
প্রেমেন্দ্র মিত্র
বুদ্ধদেব বসু
সঞ্জয় ভট্টাচার্য
বিষ্ণু দে

আলেখ্য

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

দুটি অপ্রকাশিত কবিতা

জীবনানন্দ দাশ

১

এই মুখ — জ্যোৎস্নায় — যেন শুধু শব্দহীন প্রক্রিয়ার তার
গাছের ছায়ার হাত আছে ঢেকে —
বিবর্ণ এ-জ্যোৎস্না ছাড়া যেন কিছু ছিল না ক' এই পৃথিবীতে
অশরীরী স্বাদ সব ফিরে এল; কোনও কিছু গভীর জিনিসে
চেয়েছিল; আমার হৃদয়ে ঢের ধূসর পেঁচারা আনে নিস্তব্ধতা
বহু দিন শান্তি পাবে ব'লে তারা বলে না ক' কেউ কিছু কথা

কাহার শালিখ যেন ইচ্ছাধীন! একেশ্বরী খড়কুটা চিলের মতন;
নখ আঁচড়ায়, গ্রীবা ছিঁড়ে ফেলে, কাঁদে — তবু যেন সব মন
তাহার ব্যথার পরে তরুদের কালো অনুভব দিয়ে এক নিস্তব্ধ প্রাসাদকুল গড়ে
ক্যাঙারুর মত আর লাফাবে না কেউ রূঢ় রৌদ্রের ভিতরে
জানে তাহা সব গাঢ় প্রক্রিয়ার অন্তরালে যেন কোন অবিনাশ রূপ উদ্‌গীরণ
বৃত্তের মতন ঘুরে জ্যামিতিক বেদনার — তার পর আনে সাদা পাখির গুঞ্জন।

২

কোন এক দেশের কথা মনে পড়ে
সেখানে সমুদ্র নেই
তবু যেন মনে হয় দ্যোতনার মত সাদা রৌদ্রের ভিতর
উঁচু-উঁচু গাছ নড়ে — সবুজ শাখার সেই উর্মিল উচ্চতা
কালো-কালো দাঁড়কাকদের সাথে শোনে যেন পৃথিবীর স্বর
অনেক অস্পষ্ট সাদা ফেনা নিয়ে বহিতেছে যেন নীল কথা
সূর্য যেন যত দূর চোখ যায় স্ফটিকের মতন ভৃঙ্গারে
নিজের ভাঁড়ার থেকে উত্তেজিত সাদা মদ ঢালিতেছে ঢেউয়ের দু'ধারে
আমার হৃদয়ে স্বপ্ন জড়ো হয় : রৌদ্র পক্ক সোনালি শরীর যেন ডাকে
কোনও ডানা নিয়ে তুমি উড়ে এসো নিপীড়িত বিজন মমতা
উড়ে এসো, দাঁড়কাক, জীবনের অঙ্কুরিত এক ভিড় মক্ষিকার মত কও কথা

দাঁড়কাক

সংযোজন : কবি প্রথম কবিতার নামকরণ করেননি। দ্বিতীয় কবিতাটির নাম দিয়েছিলেন দাঁড়কাক, যা কবিতাটির নীচে (Italics নির্দেশিত) লেখা ছিল। কবিতাদুটি পাওয়া গেছে অমিতানন্দ দাশ, গৌতম মিত্র, প্রিয়ব্রত দেব ও কবি ভূমেন্দ্র গুহের সৌজন্যে। বানান ও যতিচিহ্ন অপরিবর্তিত।

অপ্রকাশিত কবিতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অন্তরে মোর যে দীপ জ্বলিছে দেবতা
বাহির আমার আড়াল করেছে তাহারে

বারে বারে তুমি তাই চলে গেছ ফিরিয়া
বুঝাতে পারিনি আরতি করিগো কাহারে।

হৃদয় আমার যে ফুল ফুটাল দেবতা
বাহির আমার দেখিতে দিলনা তাহারে।

প্রভাত যে আছে লুকোন রাতির আড়ালে
সন্ধান তার কেমনে বুঝাব কাহারে?

বন্ধ হৃদয়-ঝোরা যে আকুল আবেগে
অন্ধগুহার আঘাত করিছে দুয়ারে

পরাণে আমার যে কথাটি উঠে দেবতা
বাহির আমার ব্যর্থ করেছে তাহারে।

তোমার পরাণ যাহা খুঁজে ফিরে দেবতা
আছে আছে তাই আছে গো আমার পরাণে

সংযোজন : কবি একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন 'রক্ত রাঙ্গা' নামে ১৩২৭ সনে। প্রস্তাবিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি। পরে ১৩২৮ সন ও তৎপরবর্তীকালে যে-খাতায় পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন, তার ফাঁকা পৃষ্ঠায় আরো কয়েকটি কবিতা সংযোজন করেন। এটি সেই সংযোজিত পর্বের একটি কবিতা। পাণ্ডুলিপিবদ্ধ কোনো কবিতারই কবি নামকরণ করেননি। রচনাকালে কবির বয়স ছিল ১৬-১৭ বছর। প্রস্তাবিত গ্রন্থটি কবি ভবিষ্যতে আর কখনোই প্রকাশ করেননি। কবি ব্যবহৃত বানান ও যতিচিহ্ন অপরিবর্তিত রাখা হল। কবিতাটি পাওয়া গেছে কবিপুত্রদ্বয় মৃন্ময় মিত্র ও হিরণ্ময় মিত্রের সৌজন্যে।

চারটি অপ্রকাশিত কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

With Feet At The Fire (Francis Jammes)

পা দু'টি আগুনে রেখে ভাবি সেই পাখীদের কথা,
ভূমির সান্নিধ্য-বার্ত্তা দিয়েছিলো যা'রা কলম্বাসে।
আকাশ-অবধি জল — জল শুধু, শুধু জল ভাসে।
একটি নাবিক শেষে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিল বারতা

"তীর! তীর!" নাবিকেরা নতজানু। যত দড়িদড়া
কাঁপিলো হাওয়ার গানে। নিঃসংশয় দেখিল চাহিয়া
নব-পৃথিবীর বন নীলবর্ণ শাখামৃগে ভরা,
বিপুল কাছিম সব পড়ে আছে বালুকা ছাইয়া।

আনন্দ-উন্মত্ত নাবিকের মত — কবে আমি ওরে
ঝাঁপায়ে পড়িব তা'র রৌদ্রময় কেশ-উপকূলে,
ঘুমের সমুদ্র-ঘেরা তা'র নব-দেহদ্বীপ ভরে'
এলোমেলো-অগোছাল, ছড়ায়ে সে দিয়েছে যে-চুলে।

৩০.৯.২৮

Do not console Me (Francis Jammes)

দিয়ো না সান্ত্বনা মোরে। আমি তাহা শুনিতে পাব না।
যদি স্বপ্ন—ছিল যাহা একমাত্র সম্পদে আমার —
ছেড়ে চলে' যায় মোর আঁধার, কুয়াশাক্লিষ্ট দ্বার,
থাকিব প্রস্তুত হ'য়ে, আমি কোনো কথা কহিব না।

একান্ত সহজভাবে কোনোদিন (বলার কি আছে!)
নীল আকাশের তলে আপনারে ধরিব মেলিয়া,
দিবে না আসিতে ওরা শিশুদের মোর খুব কাছে,
মরে' যাবো — বিষণ্ণতা ছেড়ে গেল বলে' মোর হিয়া।

৩০.৯.২৮

সনেট্

হৃদয়-গগনে মোর নামিয়াছে সন্ধ্যার আঁধার,
স্তরে-স্তরে মেঘস্তম্ভ হিংস্র অপদেবতার মত

নিঃশেষে নিয়েছে শুষি' স্নিগ্ধ বিভা দীপ্ত নীলিমার
ব্যথার কালিমা তারে করিয়াছে আবিলতা-ক্ষত।*

সন্ধ্যার রক্তিম ধূলি ঢেকে গেছে মেঘের ছায়ায়,
গুণ্ঠিত নক্ষত্র-দল বিথার না এক রশ্মি বিভা,
অশান্ত, চঞ্চল বায়ু চির-স্থির হয়েচে সেথায়,
প্রদোষের অন্ধকারে এক হ'য়ে গেচে রাত্রি-দিবা।
এই শান্ত স্তব্ধতা কি প্রলয়ের অমঙ্গল দূত?
ক্ষণপরে বক্ষঃ ভেদি' নামিবে কি লক্ষ্যহীন ধারা?
শব্দহীন অট্টহাসি হাসিবে কি নিষ্ঠুর বিদ্যুৎ?

অথবা রহিবে কি গো উচ্ছ্বসিত বায়ু বন্ধহারা —
ছিন্ন করি' মেঘ তার, দীর্ণ করি হৃদয়-অর্গল,
দেখা কি দিবে না সেথা পূর্ণিমার চন্দ্র সমুজ্জ্বল?

৬ পৌষ' ৩২ (রাত্রি)

পাঠান্তর - * নিবিড় কালিমা তারে ব্যথায় করেছে মূর্ছাহত।

সনেট্

তুমি কি ভেবেছ মোর স্বর্ণস্মৃতি গড়িয়া অন্তরে
গোপনে করিবে পূজা আমি যবে রহিব না আর?
নীরব নয়ন-জলে বিরহ-বেদনা দিবে ভরে',
প্রীতির কুসুম সদা নিবেদিবে উদ্দেশে আমার?
আমি বলি, কাজ নাই; যে গিয়েচে, যেতে দিয়ো তারে,
কভু না আছিনু যেন — এই ভেবে মোরে যেয়ো ভুলে',
আমার কণ্ঠের গান স্নেহভরে দিয়ে যাবো যারে,
নবীন প্রণয় তব রেখো তারি চরণের মূলে।
যে-হাসিটি চিত্তে মম ফুটাইত আনন্দ-কুসুম
তোমার সে হাসিটুকু তাহারেই দিয়ো উপহার,
আঁখি তব বিশ্ব ভরি' আঁকি' দিত রক্তিম কুঙ্কুম
সে-বিশ্বে তাহারে এনো, এই শেষ মিনতি আমার।
আমারে ঘিরিয়া রবে মরণের মহান্ মৌনতা,
তাই বলে', ওগো প্রিয়া, জীবনেরে হানিয়ো না ব্যথা।

১০ কার্ত্তিক (রাত্রি) ১৩৩২

সংযোজন: কবিতাগুলি (অনুবাদ কবিতা-সহ) কবিকন্যা দময়ন্তী বসু সিং-এর সহৃদয় সহযোগে প্রাপ্ত। কবি-ব্যবহৃত বানান ও যতিচিহ্ন অপরিবর্তিত রাখা হল।

চারটি অপ্রকাশিত কবিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

১

প্রভাতের অপেক্ষায় ফুল।
আমি কার অপেক্ষায় থাকি?
আকাশ-জোড়া যে নীল পাখি
সে কি হয় রাত্রিতে ব্যাকুল

ঘুমিয়ে রয়েছি ব'লে আমি —
ঘুম আত্মবিসর্জন বলে?
সে আমায় ডেকে তোলে ফলে
স্পন্দ্রত্রয়-বিন্দুতে দিনের আগামী...

সে-বিন্দুতে জেগে পাওয়া যায়
আমার টবের নীল ফুল।
সে-ও তবে জাগছে নির্ভুল
আমারই নির্জন অপেক্ষায়।

সব জাগে, রাত্রিভর জাগে,
কখন জাগাব আমি, তাই
বাজে, শুনি, নীরব শানাই
সে-পাখির কাকলি-সোহাগে।

২

আমি তো সাঁতারে ভেসে যাই
সময়ের ঢেউয়ের উপর।
জানি নে, জানতে আমি চাই নি কখনও
কী চাই, কী পাই।
চাওয়া-পাওয়া যারা ব'সে গোনো
তারা ঢেউ দেখলে না সোনার, রুপোর —

তারা জানলে না সুখী সময়ের জল
সাঁতারে যে কতো সুখ, সাঁতারে-বা কতো!
পেছনে রেখেছি কী-না হৃদয়ের ক্ষত
অশ্রুমুখ কারও কিম্বা চোখের মিনতি

সব ভুলে সম্মুখের দিকে অবিরল
চ'লে গেলে মনের তো নেই কোনও ক্ষতি!

এ-সমুদ্রে আছে শুধু প্রীত আকাশের হাতছানি
ছিল কী ছিল না ঘর সব বিস্মরণে
জীবনের শত আয়োজনের খবর
জলের রেখার মতো কোথায় মিলিয়ে গেছে মনে
দিনরাত্রি শুনি শুধু জলেরই তো স্বর
একটি বুদ্বুদ, আমি মিলাব জলেই, তা-ও জানি!

৩
যেমন খুশির রোদে চিকোয় পাতারা
তেমন সুখী কি আমি দেখেছি কখনও
তোমায়, তোমার বুকে হাত রেখে বলেছি যখন, যাব—যাব!
তোমার রক্তের সেই উতালপাতাল কী যে সাড়া
তুমি তা শোনো
একটি মুহূর্তে আমি দেখেছি যে কী অজস্র হাসি
যার নাম হতে পারে শুধু 'ভালোবাসি'।

যাই নি, কাজেই দিন কেমন নিরাভ
বর্ষার মুখের মতো, কেটে গেছে, তা-ও তো জানি নে।
হঠাৎ হয়তো মনে হতো হাওয়া-বিনে
তোমার খুশির হাওয়া বিনে বুঝি সব কাজ অকাজই-বা হল!
কিন্তু পাছে দেখি সেই চোখ ছলোছলো
যেখানে রোদের কারুকাজ ছিল, তাই
যাই নি তোমার কাছে, যদিও ইচ্ছার শব্দ শুনি যাই-যাই!

৪
সকালের সকলের ঘুম-ভাঙা মন
আকাশের মতো যেন পৃথিবী ছোঁয় না!
সেই মনে তবু কেন সাজে যে কাজের আয়োজন!
কেন সাজে? অলিপ্ত সে কেন যে রয় না!

একটি পবিত্র আভা নষ্ট হয়ে যায়।
নষ্ট হয় আলো হতে-হতে।

অন্ধকার কী বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী স্রোতে
মোছে সে আলোর রেখা! জীবনের তাই অভিপ্রায়!

মৃত্যু-লাগা জীবনের মৃত্যু ছাড়া নেই কোনও মানে।
মন হতে মুহূর্তের আকাশ-প্রতিভা
মুছে নেয় অন্ধকারময় রাত্রি, আলোময় দিবা।
তবু যে মনের পাশে আকাশ দাঁড়ায়, কেন, আকাশই তা জানে।

সংযোজন : কবি, কবিতাগুলির নামকরণ করেননি। পাওয়া গেছে কবি ভূমেন্দ্র গুহের সৌজন্যে। বানান ও যতিচিহ্ন অপরিবর্তিত রাখা হল।

অপ্রকাশিত কবিতা

অনুবাদ : **বিষ্ণু দে**

আমার প্রিয়ার চোখ মোটে নয় সূর্যের সমান
প্রবাল অনেক লাল সে বিম্বাধরের তুলনায়
তুষার শুভ্রতা যদি খোঁজো তবে বক্ষ তার ম্লান
কেশ যদি তন্ত্রী হয় কালো তার বাঁধা সে মাথায়
দেখেছি গোলাপ নানা বসোরাই, লাল ও পাণ্ডুর
গোলাপ দেখিনি কিন্তু আমি তার গালে চুমা খেয়ে
এবং আতরে নানা গন্ধ সত্য অনেক মধুর
আমার প্রিয়ার শ্বাসপ্রশ্বাসের বাতাসের চেয়ে।
ভালোবাসি কথা তার, তবু আমি এই সত্য জানি
সঙ্গীতের স্বর নয় তার গলা যতই মধুর।
অবশ্য দেখিনি আমি দেবী কোনো মরালগামিনী
তবে জানি প্রিয়া যদি চলেন তা মাটিতেই চলা
অথচ আশ্চর্য জানি আমার প্রেয়সী সুনিশ্চয়
ব্যর্থ সব তুলনার মতোই সে তুল্য যারা নয়।

শেক্সপীয়র রচিত সনেট

My mistress' eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips' red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damask'd, red and white,
But no such roses see I in her cheeks; 6
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound;
I grant I never saw a goddess go — II
My mistress when she walks treads on the ground.
And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied with false compare.

সংযোজন : অনুবাদটি পাওয়া গেছে কবিকন্যা উত্তরা বসুর সৌজন্যে। মূল সনেটটি নেওয়া হয়েছে (*Shakespeare COMPLETE WORKS : QUATERCENTENARY EDITION*: THE ENGLISH LIBRARY: E.L.B.S. Ed. 1964; Sonnet No.130; P.1330) থেকে।

অপ্রকাশিত আলেখ্য

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শীত বসন্তের সংলাপ

গ্রন্থিক : কী চায় এই ঋতু? পাতা খসিয়ে
আমলকীর, ঝরিয়ে ঘাসের ওপর, ঘাসের পাহাড়ে লাগিয়ে
হলুদ রোদ্দুর, তাকে পায়ে-মাথায় কোমরে কাঁখে শুকিয়ে,
শুকনো করে, বানিয়ে পাহাড় — আগুন ধরানো,
কী চায় এই ঋতু?
ঋতু কী ঠিক এমনটা চায়?

শীতকুমারী : পাহাড়ে মালার মতো জ্বেলো না আগুন। প্রার্থনা ছিল কুমারী
শীতের, একদা। টিলার উপর থেকে দেখা, এইসব মালার
মতো আগুন আর অগ্নিবলয়। পরের পর, ক্রমাগত। ভয় একটাই, পাতার
মালার আগুন তোমাকে না পোড়ায়, ও বসন্ত, ও বসন্তের কচি-কাঁচা
পাতা, তোমাকে।
তাহলে আমি বিষণ্ণতা থেকে আরো বিষণ্ণতর দ্বীপে চলে যাব।
চলে যেতেই হবে।

বসন্ত : হাতে আমার অভয়মুদ্রা। তাকিয়ে দ্যাখো। করতল খুলে রেখেছি।
তোমার মালার আগুনে প্রতিটি কররেখাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাকিয়ে
দ্যাখো। ভয়হীন, ঊর্ধ্বমুখী, তেজোময় রেখাগুলি, মৃত্যু কাকে
বলে জানে না। তাকিয়ে দ্যাখো। তাই আমারও কোনো ভয় নেই। বরং
শুকনো কাঠ, পাতা পুড়ে, তার ছাই আমার শিকড়ের মাটিতে এনে দেবে
সুসার। পথিকের পথ করে দেবে সিঁথির মতো সাবলীল। শিয়রচাঁদা
ভাগ্যের মতন পরিচ্ছন্ন করে দেবে অরণ্যভূমি। আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ
করে সেদিন তুমি এসেছিলে। আজ দূরে চলে গেছ। ক্ষতি নেই,
দূর থেকে তোমার উদ্বেগ আমায় প্রকৃতই স্পর্শ করে।

শীতকুমারী : বসন্ত, ও বসন্ত, তোমার কচি-কাঁচা পাতায় আজ আমার আতঙ্ক।
কাছে আসতে ভয়। দূর থেকে ডালপালার দিকে তাকিয়ে থাকি। বুকের
এক কোণে হিম, অন্য কোণে হেরে যাওয়ার অপমান আমায় বেঁধে।
আমায় শক্তি দাও। শক্তি দাও তোমার অপরূপকে সহ্য করার।
ক্ষমা করো, তোমার রাজ-রাজেশ্বর রূপে আমি অন্ধ। দূরে থাকতে দাও।
একেবারে বিসর্জন দিও না প্রতিমা। প্রতিমার চালচিত্র ভরে আমার
ভালোবাসার ছবি আঁকা, সেই ছবিগুলি স্মরণে রেখো।

বসন্ত : স্মরণে থাকবে না কেন?
মরণেও স্মরণে থাকবে। আমার গরবে তুমিও গরবিনি।
আমার রূপে তুমিও রূপময়ী।

আজ দু-হাত ভরে গিয়েছে ফুলে।
চুলের আঘ্রাণে বুক ভরে গিয়েছিল সেদিন, ভুলে যাব?
ভোলা যায়?

শীতকুমারী : সত্যি নয় মিথ্যে কথা বলো
এত সুখে আছ বলে
এই বিলাসিতা
যারই হোক তোমার সাজে না।
বসনে ভূষণে পূর্ণ হয়ে আছ বলে
আজ শূন্য হাত ভিখারির দিকে
দয়াব্রত দৃষ্টি দিতে কিছুতেই পারো না
এ-নিষ্ঠুরতার ক্ষমা নেই।

বসন্ত : বারবার ভুল করছ মাত্র, প্রবাসিনী
প্রাচুর্য মানে তো কোনো নিষ্ঠুরতা নয়
যার আছে তার কাছে হাত পেতে দাঁড়াতে
কেন অপমান লাগবে
যদি দিতে জানে
নিতে কেন কষ্ট হবে?
দিতে যদি জানে?
তা ছাড়া, বুকের মধ্যে, রক্তের ভিতরে
উদাসীন ঝড় এক বৈরাগীর ঝুলি
ছিঁড়ে, তছনছ করে
বাতাসে ছড়ায়। ফুল ও পাতার মতো
তামা রূপো সোনা
তুমি কি জানো না
ঘড়ার মোহরে
আমার তৃপ্তির চেয়ে অতৃপ্তিই বেশি।

বৃষ্টিকে আহ্বান করি
অন্তরে বাহিরে
এসো নীলাঞ্জন মেঘ
পিঁড়ি পাতা আছে।

দু-দণ্ডের জন্যে বোসো
যদি হাতে থাকে সময়
স্বপ্নের মতো
জানো প্রবাসিনী
দু-দণ্ড সুখের চেয়ে
দুঃখ খুবই
বড়ো অবিনাশী।

শীতকুমারী : একই কথা বলো বারবার
আমি কি কিশোরী
তাই কথাচ্ছলে আমাকে ভোলাবে?
সুখের ভিতর দুঃখ
গোলাপে পোকার মতো
গন্ধ গ্রাস করে
যেন রাহু চাঁদ খায়
আঁচলের খুঁট ধরে খেয়ে ফেলে
চাঁদের প্রতিভা।
কেন তুমি একবার, অন্তত একবার
করবে না গ্রাস।
গ্রহণ করবে না কেন আমাকে সমূলে
শুধু ছায়া-স্পর্শ দিয়ে করো সংবর্ধিত
এসে হেসে চলে যাও
কেবলি দুলিয়ে
অন্তর্গত রক্ত, ওগো উদ্দীপ্ত পলাশ?

বসন্ত : অবগাহনের মতো রূপ রস সর্বত্র ছড়ানো
তুমি ধীরে বসে তবু কেন কষ্ট পাও?
আত্মলাঞ্ছনার মতো ঘটনার হাতে
নিজেকে অর্পণ করে কেন কষ্ট পাও?
বাহিরে দেখেছ, তুমি অন্তরে দ্যাখোনি
উচ্ছলতা কিছু নয়, ভিতরে সমাধি শান্ত
মনোহর। তুমি ভিতরে তাকাও —
অভিভূত প্রেম দ্যাখো বসে আছে
উৎসবের মতো
মণ্ডপের চতুর্দিকে জ্বলন্ত মশাল

ভিতরে ঝুলন্ত গোলা কাকাতুয়া
বারুদের মতো আবীর, গুগ্‌গুল বাতি।
আমি বসে আছি মঞ্চে
বামের আসন শূন্য
ব্যথাতুর বায়ু — শান্তভাবে বয়
মঞ্চের চারিদিকে
তুমি লক্ষ করে দ্যাখো
সকলে কীসের জন্য স্তব্ধ হয়ে আছে
অপেক্ষার দৃষ্টি খুঁড়ছে মণ্ডপের মাটি
প্রকৃত প্রহর হল
তুমি এসো, বোসো
বামের আসনখানি ভরে থাক ও অবগুণ্ঠন
তোমার ঐশ্বর্যময় উপস্থিতি পূর্ণ করে দিক
এই সাজসজ্জা, এই তৃতীয় ভুবন
এসো প্রিয় সখী, দাও করতলখানি।

সংযোজন: 'শীত বসন্তের সংলাপ', এই আলেখ্যটি শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচনা করেন ১৯৮৫ সালে। অপ্রকাশিত ও গ্রন্থাকারে এখনো মুদ্রিত হয়নি। আমাদের নিজস্ব প্রযোজনার জন্য, এই আলেখ্যটিতে কিছু কবিতা ও গান (রবীন্দ্রসংগীত) সংযোজিত ছিল। এখানে সেগুলি বাদ দেওয়া হল।

অনুষ্ঠানে পরিবেশনের ও প্রযোজনার সম্পূর্ণ স্বত্ব আমাদের। বিনীত নিবেদন এই যে, আলেখ্যটি প্রযোজনা ও পরিবেশনের জন্য পূর্ব-অনুমতি নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সৌমিত্র মিত্র

সূত্র ও কৃতজ্ঞতা : সৌমিত্র মিত্র

কবিতাগুচ্ছ

তিনটি কবিতা

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবদূক

মনে পড়ে গেল পিছু ফিরে দেখে,
বুকে জমা কথা কৈশোর থেকে
সময় হয়নি বলেই হয়তো
তখন পারিনি বলতে —
এত গাদা গাদা জমা কথা মনে
বড্ড সময় নিল তা কথনে
প্রৌঢ়ত্বেই এসে ধরা গেল
পোড়ে জীবনের সলতে!
যৌবন থেকে বলা হল শুরু
কোনো কথা লঘু, কোনো কথা গুরু...
ফুরোবে না তাকি? জীবনবৃক্ষে
পাতারা যে হয় হল্‌দে!
মরিয়া হয়েই দুই হাতে ছুঁড়ি
হাল্কা করতে কথা ঝুড়ি ঝুড়ি
চলতে, চলতে, চলতে।
বুঝি এ-কথারা প্রতি নিশ্বাসে
স্রোতের শ্যাওলা সম ভেসে আসে
চিতার দিকেও চলতে!
কথা অফুরান যদি হয় তবে
শেষ কথাগুলো দেখছি যে হবে
খাবি খেতে খেতে বলতে।

বাবদূক — অধিক কথা বলাই যার স্বভাব (বাক্যবাগীশ)।

পিছন ফিরে দেখি যাবার আগে

(সিস্কোয়েন সিকোয়েন্স-এ লেখা)

সাবেক কালের কথা স্মৃতি যত কিছু তার হয় অজরামর —
আরগুলো মনে দাগ-না-কেটেই অনায়াসে মুছে যায়।
কেন যে এমন হয় বুঝিনে কো... দিতে পারে কেউ তার খবর?

আয়ু যত শেষ হয়ে আসে, মন কৈশোর ফিরে চায়।
আমিও চাইছি যেহেতু, সামিল অস্তিমযাত্রায়।

চোখে ভাসে সেই শারদ আকাশ... প্রায় আশি সাল আগে —
মায়ের সঙ্গে গাড়ি-বেড়াতে সে অনেক দিনের যাওয়া।
নিসর্গ-দেখা-চোখ খুলে গিয়ে — ভাবতে অবাক লাগে —
দূরাকাশে দেখা চিল-শকুনের স্থির পাখে ভেসে-যাওয়া —
ময়দানে গাছ-পালা সব যেন ছবিলা ছবিতে ছাওয়া!

তারপর থেকে কীসের ঘোরে যে আকাশের দিকে চাই
একা থাকলেই মনোহীনতায় অধীর, বধির হয়ে
অনির্দেশ্য হেন কিছু খুঁজি যার কোনো নাম নাই।
আকাশ, প্রকাশ করত না কিছু রোদের পোঁড়ানি সয়ে
লোকে ভেবে নেয় ছেলেটা বেহেড, ওভাবেই যাবে বয়ে!

মনে হতো নভোনীল চাঁদোয়ায় ঢাকা যে-পুরীটা আছে
বড়োদের মুখে যে-রকম শুনি ইন্দ্রের সভাতলে
পুণ্যাত্মারা গিয়ে জড়ো হন, অপ্সরাদল নাচে —
জানেও না ওরা দুঃখ, মৃত্যু, এ-সব যে কাকে বলে!
উন্মুখ হই আকাশ খুঁজতে অদম্য কুতূহলে!

প্রথম প্রশ্ন তোলে মন এক শিশুর মৃত্যু দেখে;
সদ্যোজাত যে নিষ্পাপ, তারও এত ক্লেশে দেহপাত?
শুনি প্রারব্ধ খতিয়ান দেখে চিত্রগুপ্ত লেখে —
মৃত্যুর তাই নড়চড় নেই, ঠিক তা তনূনপাৎ
শিখা স্বভাবত উঁচুদিকে ওঠে, নিচু হওয়া নয় ধাত।

এইভাবে করে যাওয়া প্রতিদিন ভুয়ো ভাবনায় যাপনা!
ক-দিনের আমি! ভূমিকাই বা কী? সামান্য কালখণ্ডে
থেকে যদি করি অনন্তকাল-পটে সেটা সংস্থাপনা!
ভাবনারা আজ রূপ পেতে চায় রচনায় গীতিছন্দে
সিক্কোয়েনেরই সিকোয়েন্স নামে উক্ত পদ্যবন্ধে।

তনূনপাৎ — যে মন্ত্রপূত ঘৃতাহুতি ভক্ষণ করে (অগ্নি)।

মুমূর্ষার উৎসঙ্গে বসে

(ভিলানেল)

আমার প্রয়াণ অতি তুচ্ছই ঘটনা
মুমূর্ষু যে তারই যত মন উচাটন—
তাতে অন্য কারো বেশি আসে না, যায়ও না।

সে-শোকে সূর্যও কিছু দীপ্তি কমাবে না,
দুপুর নিত্যই রবে কর্মব্যস্ত ক্ষণ
আমার থাকা-না-থাকা কী তুচ্ছ ঘটনা!

দুনিয়াদারির স্রোত হোঁচট খাবে না;
জীবিকা-প্রবাহ-স্রোত আর বিনোদন
চলবে সবই, তাতে কারো আসবে না, যাবে না।

ঝেঁটিয়ে যা ফেলে ওরা, আমারই রচনা?
মুখ বুজে দেখে যাচ্ছে অনিকেত মন?
মূক মৃত্যু সয়ে নেবে সে তুচ্ছ ঘটনা।

এই ভিলানেল লিখে করি এ-রটনা
পাণ্ডুলিপিগুলোতে যা রয়েছে মনন
রক্ষা যাতে পায় তারই রাখি প্রস্তাবনা।

একটি মায়ান্ধ আত্মা করে এ-যাচনা
জেনো, সবই দেখছে দুটি অলক্ষ্য নয়ন।
আমার প্রয়াণ জানি তুচ্ছই ঘটনা —
দেশের দশের তাতে আসে না, যায়ও না।

৭ শ্রীনাটাইচণ্ডীর কাছে প্রার্থনা

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

(একের প্রতীক এই প্রাচীন চিহ্নটি, তার চিত্ররূপে সেই ব্যঞ্জনাই।)
রক্তিম আগুনবতী, ঈশ্বর নাটাইচণ্ডী, একশ্রী তুমিই।
তুমি পরব্রহ্ম, তুমি ক্রোড়, আমাদের একমাত্র —
ওগো শিবশক্তি, হে নিগূঢ়! যশ দাও। বিত্ত দাও। আয়ু দাও।
বিমোহিনি! মুগ্ধকরি! আমি সর্বঘটে, রূপে ও আকারে, দেখি তোমাকেই,
আর, পুষ্পে পুষ্পে সুপুষ্পে সুদৃশ্য স্তব তৈরি করি, কোটিকোটীশ্বরি! তোমার জন্যই।
বিনিময়ে, যুবা মেয়েদের স্তুতি বেশি করে চাই,
শ্রদ্ধার বরফ না। মাটির তেজ কমে যায়। হীন হই। বিমুখ বন্ধুর
বশীকরণ কঠিন। মন্ত্রে নাকি মদ্যে? কোনো সুখাদ্যে কি? কত রাত্রি জেগে-জেগে ভাবি...
স্ত্রীজাতীয় হাতে প্রায়ই সুগন্ধি ব্যঞ্জন, একটু নুন, দুষ্ট লবণের ছিটে,
যতক্ষণ মুখে স্বাদ, আমৃত্যু আসুক। তুমি আদ্যাশক্তি অন্ন! এলোচুলে নাচো
গোছা গোছা আগুল্‌ফলম্বিত,
শরতের বাতাস বইতেই, মৃদু রোদে ঝমঝম, কিংবা রুণু রুণু গানে।
তুমিই কি আমাদের গুপ্তরতি, সেঁজ-আলো, তলের মেঝেয় বসে থাকো, রাঙাচুলী?
ছন্দ থেকে একদিন সমস্তই দাও, যা পাইনি আমি স্বপ্নে ছাড়া, তাও।
অক্ষরের কৃষিকাজে পাবে যশ বিত্ত আর নারী মনোরমা —
লক্ষ্য : বীজ থেকে বিস্ফোরণ, শব্দ সাধি, দুঃখকষ্ট যাই হোক, যেন পারি।
এ-সব বিভূতি ভালো। না-হ'লে স্বীকার করি কপালে অনেক ভোগ
এই শ্রেষ্ঠ মানবজন্মেও,
প্রকৃতপক্ষেই পড়ে-যাওয়া মুকুরটি যেন, ভেঙে খণ্ড ও বিখণ্ডে, করুণ হই না।
যদি কৃপের মতোই আরো-এক মহাযুদ্ধশেষে,
আমি কবি এ-জীবনে বেঁচে থাকি চিরজীবীদের একজন।
যদি সিদ্ধি, শুধু সক্ষমতা নয়, দিবল ধনুর মতো দশসহস্র বৎসর
আয়ুরেখা পাই —
হে সুখদে, হে নূপুরপরিহিতে, শ্রীচরণে রাখলাম আমার প্রার্থনা।

দুটি কবিতা

নরেশ গুহ

ঝিনুকের আর্তনাদ

হে কাল, চতুর শ্রেষ্ঠী, অস্তিত্বের সাগরবেলায়
কেন তুচ্ছ ফেলে রাখো দিবারাত্রি দুঃসহ হেলায়
বন্ধ্যা ঝিনুকের ভিড়ে আরেক ঝিনুক?
মুক্তোর নিটোল স্বপ্নে গড়ে-ওঠা স্বচ্ছতার সুখ
তা হলে জানালে কেন? কেন জানলাম
স্বাতী নক্ষত্রের ধ্রুব নাম?
তবু যদি ব্যর্থ করো, করো হীন অনপত্য তুচ্ছ সাধারণ,
কেন তবে তিলে তিলে এতকাল করালে ক্ষরণ
যন্ত্রণার লালাস্রাব প্রত্যাশার বালুকণা ঘিরে?
মুক্তো যদি নাই ফলে, ফেলে দাও নোংরা নোনা জলে,
পলে পলে লুপ্ত হোক, ঝিনুকের দুঃখশোক
কালান্তের সমুদ্র সমীরে।

পৃথিবীর জানালায়

কার চোখ অসমাপ্ত কান্নার মতো,
নরম পাথরে গড়া বুক?
পৃথিবীর জানালায় চোখ মেলে দেখি
অবিরাম বিবিক্ত উৎসুক।

সে কার কপালে লেখা অমল আকাশ
বহু দিগ্‌দিগন্তে ঘেরা?
কোন সে কণ্ঠের স্বরে চুমো খেয়ে গেছে
অমর বসন্ত বিহগেরা?

সে কার বিষণ্ণ মন ক্ষণে ক্ষণে উদাসীন
দিন মাস বছরেরও পরে?
সে কোন দেহের ধূপ বিদ্রূপ করতে পারে
জীবনের অনির্বাণ জ্বরে?

বিশ্বাস হল না আজো কোনো প্রতিশ্রুতি,
শত শত চোখ ঠোঁট মেকি।
তবু আজো জীবনের জানালায় বসে
ক্লান্তিহীন ফিরে ফিরে দেখি।

ভালোবাসা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মলিন কাঁথাটি গায়ে একা ঘরে ঘুমিয়ে রয়েছে
ভালোবাসা।
নোনা-ধরা, দেওয়ালের পলেস্তরা-খসা এই ঘরই
বসুন্ধরা তার।
সে কোনো বৃহৎ স্বপ্ন কখনো দেখেনি;
দেখতে যে চেয়েছে, তাও নয়।
যখন সে জেগে থাকে, চারিদিকে কত কথা হয়,
তখন যা শোনে, তার বেশি
কিছু সে শেখেনি।
সে শুধু শুনেই যায়, বলেনি কিছুই কোনোদিন।
সে জানে না নীরব চাহনি ছাড়া তার
অন্য কোনো ভাষা।
এই রাত্রে সকলের চক্ষুর আড়ালে
মলিন কাঁথাটি তার গায়ে টেনে ঘুমিয়ে রয়েছে
ভালোবাসা।

বিশ্বাস করো মানুষ

রাম বসু

পৃথিবীর পথে পথে রাজকীয় ধূলিকণা মেখে জ্বলন্ত আলের ওপর দাঁড়িয়ে আছি আমি। আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ মানুষ? ঝলসানো মুখ, অন্ধ চোখ, গোড়ালি থ্যাঁতলানো, হাতের একতারা ঠিক ধরে আছি। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ মানুষ? বিনীত বিবেকের পরিমাপ আকাশ ছাড়া আর কী হতে পারে, বলো? চাবুকের দাগগুলো হয়ে ওঠে রক্তজবা।

আমার একটা ঘরও আছে। মিডিয়ার ফ্ল্যাশ-বালব সেখানে অন্ধ। দরজা জানলা খুলতে হয় না। অষ্টপ্রহর মেঘ রৌদ্র হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে হুলস্থুল বাঁধায়। কী মজাই না লাগে তখন। পরাজয়ের শোকযাত্রী মাথা নিচু করে নিঃশব্দে চলে যায় তখন। তখন মুহূর্তগুলো রজনীগন্ধা।

আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ, মানুষ?

আবার না বললে ভুল হবে। এদের সঙ্গে দু-বগলে 'পেপসির' বোতল নিয়ে ঢুকে পড়ে

ডন মাস্তান। চাট্-এর দরকার হয় না। কাঁধে থাবড়া মেরে বলে: 'দু-চার পাত্তর চালাও ইয়ার।' হাত বাড়িয়ে পাত্তরটা নিয়ে নিঃশব্দে হাসি। ডাক ছেড়ে কাঁদতে পারলে ভালো হত।

মাঝে মাঝে হেরে-যাওয়াটাকে মানিয়ে নিতে হয়, বুঝলে মানুষ? আমাদের মতো মানুষের কাছে গ্লানিও বাঁচার অঙ্গ।

অবশ্য, আমার কিছু হয় না। এরা বাইরের। আত্মার কেউ নয়। থাকে থাকুক।

সময়ের জটিল বারান্দায় এসে দাঁড়াই। আমি তোমাদেরই কথা বলছি তোমাদেরই সঙ্গে। শুনতে পাচ্ছ না — আলোর ছেলেপিলেদের আনন্দ, বাতাসের গলা। নক্ষত্রের চোখ কবিতার লাইনের ওপর পিলপিল করে হেঁটে যায়। অপরিমিতের ছাঁচে বাক্যগুলো দেহ পায়। এক আঁজলা জলে ঝুঁকে পড়ে মুখ দেখে আকাশ।

আমার কথা শুনতে পাচ্ছ মানুষ?

এরই মাঝখানে সূর্য অন্তরীন হয়। বরফের পাথর হিংসায় ঝিকিয়ে ওঠে। ঘরদোর আকাশ পৃথিবী তখন অসহায় আর্তনাদ।

আমি স্বীকার করছি মানুষ, আমি তখন হেরে যাই। বড়ো একা। চারপাশ দেখি। একদা অন্তরঙ্গ আজ অপরিচিত। যে যার ঘরে বন্দী। কেউ বা দেখেই অন্য পথ নেয়।

মানুষ, আমি স্বীকার করছি, আমি তখন হেরে যাই। নিজেকে খুঁড়ি। ছিঁড়ি। রক্ত পড়ে। নোনতা, গরম। চোখে মরুভূমি। অন্ধ গ্রাসে ডুবে যেতে যেতে আমি প্রাণপণে শুনতে চাই অমিত ফসলের প্রান্তরে অকলঙ্ক স্বরে মানুষের আরম্ভের গান।

বিশ্বাস করো, সে-ও তোমাদের জন্য। শুধুমাত্র তোমাদের জন্য যারা পৃথিবীকে তীর্থ করেছে।

অন্নদাশঙ্কর, ক্রান্তদর্শী, শতাব্দীপুরুষ

সিদ্ধেশ্বর সেন

শতাব্দীপুরুষ,
মনে রেখেছি আপনার পত্র-প্রবন্ধ
আমাকে সস্নেহে লেখা,
পরিচয়-এ সশ্রদ্ধ ছাপা

ক্রান্তদর্শী, বলেছিলেন শিল্পীর স্বধর্মের কথা —
সংসারের শতকাজে এক মনে যেমন
গর্ভিনীর তদ্‌গত গর্ভরক্ষা

প্রণম্য, পরেও বলেন আমাকে, মনে রেখো
রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া এটি মহামন্ত্র

বীজাক্ষরে অহরহ
মনে জপি তাই —

আপনি চিনতেনও আমার ছোড়দাদুকে
তিনিও আপনারই পদবিতে, 'রায়'

মৌচাক-এর মধুচক্রে ছিল তাঁর রহস্য, নিত্য ওঠা-বসা,
সেই *ভারতী*-র তিনি, তারুণ্যযুগের,
কবি সত্যেন দত্তের, মণিলালের বয়স্য, — হেমেন্দ্রকুমার

অত্যল্প বয়সেই আমি আপনার *সত্যাসত্য*-এ
মজে, — পেয়েছি মরমী রস —
তাই নিয়ে দাদুর সঙ্গে নাতির কথোপকথনে

আপনারই প্রসঙ্গ যখন করেন
এই কথা বলে —

পথে-প্রবাসে পড়ে তাঁর আপনাকে সেই যে
ধরেছিল মনে,

বলেন: 'কেতাদুরস্ত সিভিলিয়ন তবে চৌকি ছেড়ে,
এইবার মাটি গাড়েন, কথা-শিল্পের
সাহিত্যেরই, আপন ঘরে।'

সংযোজন : মনীষী অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'পাণ্ডববর্জিত দেশ' পত্র- প্রবন্ধটি দেন ১৯৬৪-র ফেব্রুয়ারিতে *পরিচয়*-এ। আমারই নামে দেওয়া লেখা শারদীয়ায় বেরোয়। পরে তাঁর *খোলা মন ও খোলা দরজা* বইটির অন্তর্ভুক্ত করেন। এবছর তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য-প্রণাম এই কবিতা। তিনি নেই। তাঁর প্রকাশিত পত্র-প্রবন্ধটির কথা দিয়েই কথা শুরু।

সিদ্ধেশ্বর সেন

তিনটি কবিতা

অরবিন্দ গুহ

ধরাছোঁয়া

চোখ তুলে না তাকিয়েও
আমি তোমার সর্বস্ব দেখতে পাই —
দেখি।

কান পেতে না থেকেও
আমি তোমার গোপন কথা শুনতে পাই —
শুনি।

হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারি তোমাকে —
ছুঁই না।
হাত বাড়ালেই ধরতে পারি তোমাকে —
ধরি না।

হাত বাড়িয়ে ছুঁলে
আমি তোমার কণামাত্র দেখতে পাব না;
হাত বাড়িয়ে ধরলে
আমি তোমার গোপন কথা শুনতে পাব না।
কেন হাত বাড়াব?

গাছের সবুজ ডাল থেকে
একটি রক্তগোলাপ
ছিঁড়ে নিয়ে
তুমি কালো খোঁপায় পরেছ।

আলতো খোঁপা থেকে
রক্তগোলাপ
খসে পড়েছে শাদা ধুলোয় —
তোমার চোখে পড়েনি।

শাদা ধুলো থেকে কুড়িয়ে এনে
রক্তগোলাপ
আমি সাজিয়ে রেখেছি

আমার নীল ফুলদানিতে —
তুমি কিছুই জানো না।

সবুজ ডাল থেকে কালো খোঁপা,
কালো খোঁপা থেকে শাদা ধুলো,
শাদা ধুলো থেকে নীল ফুলদানি —
একটি রক্তগোলাপের আয়ু
আর কতদূর যাবে?

রক্তগোলাপের চেয়ে
আমার হাতের আয়ু অনেক বেশি।
আমি কিছুতেই
হাত বাড়াব না —
সারাক্ষণ আমি তোমাকে
আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে রেখে দেবো।

আন্তরিক

শরীরে সুগন্ধ আশা করে
আমার নিজস্ব সব সুর;
প্রত্যেকে নিজের কাছে রাখে
গোলাপজল আতর কর্পূর।

নিজের হাজার ঝুরি বট
নিজের ছায়ায় ঢেকে রাখে;
বারোমাস রাখে? তা জানি না,
ঢেকে রাখে অন্তত বৈশাখে।

দেখা হওয়া ভালো তবে হোক
দেখা হোক এই মুহূর্তেই;
আমি বাড়ি আছি? নাকি আমি
আপাতত কোনোখানে নেই?

দু-চোখে জলের দাগ আছে,
দু-চোখে জলের দাগ ঠিকই;
মুখের হাসির আভা পেয়ে
জলের দাগেও ঝিকিমিকি।

আন্তরিক জিজ্ঞাসা — কী মানো —
তানপুরা, বেহালা কিংবা বীণা?
আমার উত্তরও আন্তরিক —
সব মানি, কিছুই মানি না।

কাটাঘুড়ি

দাঁড় নেই হাল নেই লগি নেই বইঠা নেই,
শুধু নৌকো আছে আর আমি আছি
আর আছে আমার দুখানা হাত;
হাতে জল কেটে-কেটে পার হয়ে এসেছি নদী।
নিজের দুখানা শীর্ণ শিরাবহুল হাতের দিকে তাকিয়ে
কথাটা আমারই এখন বিশ্বাস হতে চায় না।
অথচ কথাটা তো সত্য;
কিন্তু যারা জানতেন তারা কেউ আর
এখন এখানে নেই।

মাঝে-মাঝে নতুন কদমফুলের গন্ধ
আমাকে সুখবর দিয়ে যায়।
অথচ আমি জানি
ধারেকাছে কোথাও কদমগাছের নামগন্ধ নেই।
কতদূর থেকে বাতাস
আমার কাছে নতুন কদমফুলের গন্ধের
সুখবর নিয়ে এসেছে কে জানে।

ধান উঠে যাওয়ার পর
টানা মাঠের উপর দিয়ে গরুর গাড়িতে
কত বউ চোখের জল ফেলতে-ফেলতে
নতুন সংসারে গিয়েছে।
ক-দিন আগেও এখানে
পাকাধানের ভারে ধানগাছ লুটিয়ে পড়েছে।

কিন্তু আমার ঘুড়ি কাটা গেছে, উধাও হয়েছে।
হাজার নাটাই গুটিয়েও
আমি আর কাটাঘুড়ি ফেরত পাব না।

ঘরের আড়ায়
জোড়ায়-জোড়ায় ছিবড়েয় বাঁধা নারকেল

ঝুলে আছে। মাচায় আছে তালের আঁটি।
কোথায় রেখেছিলাম নাটাই —
আড়ায় না মাচায়?
আমার এখন ঘুড়িও নেই, নাটাইও নেই।

কীর্তনখোলা নদীতে জোয়ার এসেছে;
জোয়ারের জল কলকল করে ছুটতে-ছুটতে
পাড়ে এসে ভেঙে পড়ে।
বিকেলের পড়ন্ত আলোয় একটা স্টিমার ছেড়ে গেল,
কাল সকালে খুলনায় গিয়ে থামবে,
খুলনা থেকে রেলগাড়িতে কয়েক ঘণ্টা গেলেই
কলকাতা।
আমি কোনোদিন কলকাতা যেতে পারব?

রাত্রির শেষদিক।
শুকনো বিশাল মাঠে
দ্রুত ধাবমান ঘোড়ার খুরের খটখট আওয়াজ
দূর থেকে আরো দূরে, আরো দূরে,
আমার ঘুম ভেঙে যায়,
আরো দূরে,
পাশ ফিরে শুই,
আবার ঘুমিয়ে পড়ি, আরো দূরে, আরো আরো দূরে।

দুটি কবিতা

কৃষ্ণ ধর

জীবনের পাঠক্রম

জীবনযাপনের কোনো নির্ধারিত পাঠক্রম নেই
যেমন সৃজনের পাণ্ডুলিপির প্রথম খসড়া
কাটাকুটির পর যার জায়গা হতে পারে
বাজে কাগজের ঝুড়িতে
সবই মরজিনির্ভর, জীবন ও সৃজন
গ্রহণে-বর্জনে তৈরি হয় মান্য পাঠ

তার কোনো ফোলিও সংস্করণ কলমের ডগা থেকে
টুপ করে আস্ত খসে পড়ে না প্রকাশকের দপ্তরখানায়
বর্জন, শোধন, সংযোজন মিলে পুথির চূড়ান্ত পাঠ
অব্যয় হরফে বাক্যের বিন্যাস, সংকেত ও ব্যঞ্জনা
জন্ম নেয় কবিকথা, মননের শিল্পকলা আত্মজৈবনিক
অথবা সামাজিক যার যেমন অভিরুচি, হতে পারে দার্শনিক
জানেন নিবিষ্ট পাঠক
জীবনযাপনও তেমনি এক সৃজনকর্ম
নির্ধারিত পাঠক্রম নেই,
তারও সর্বাঙ্গে অজস্র ক্ষত, কাটাকুটি গ্রহণ-বর্জন
অশ্রু ও রক্তের রেখায় ব্যক্তিগত, সামাজিক অথবা বিশ্বজনীন।

নাস্তিক

এমন দৃশ্যও দেখা গেছে
বিপন্ন জনবসতির মানুষকে আগলে রেখেছে
এক ঘোর নাস্তিক
আগুন ও অন্ধকারে সে-ই একা পাহারা।
ত্রাস থেকে মুক্তি পেতে তার কাছে খুঁজেছে আশ্রয়।

একচক্ষু পুরোহিত দেখেও দেখেনি
দেবতা ভাসানে যায় স্বেচ্ছা-নির্বাসনে।

বিদ্বেষ-বিদীর্ণ দগ্ধ মাঠে মুঠোভরতি আশালতার বীজ
ছড়াতে ছড়াতে নাস্তিক চলেছে একা জনপদের দিকে।
তাকে দেখে কালঘুম থেকে জেগে ওঠে
সারি সারি নিহতের শব
বিপন্ন সময়ে নাস্তিকই তাদের প্রাণ-পুরোহিত

প্রতিদিন পৃথিবীতে তারই হাতে নবজন্ম মানুষের আশার
এই তার নাস্তিকতা!

অবিনাশ

শঙ্খ ঘোষ

অমা এ রাতের মাঝখানে এক সরুপথ
আঁকাবাঁকা হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে বহুদূর
ক্ষতের চিহ্ন ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঠিক সেখানেই
খুঁজতে গিয়েছি তোমাকে, তোমার অশরীর

গাছপালাঘেরা নির্জনে কোনো সাড়া নেই
নিজেরই কেবল প্রশ্বাসটুকু শোনা যায়
ঘুমের ভিতরে সম্মোহিতের পদপাত
খুঁজতে গিয়েছে তোমাকে, তোমার অবকাশ

মনে পড়ে শুধু ফেলে আসা যত অপঘাত
কীভাবে এখনও গোপন দুর্গ ভেঙে দেয়
কীভাবে এখনও রক্তপাতের ইশারায়
মনে পড়ে শুধু তোমাকেই, তুমি অবিরাম

আমারও দুহাতে দিতে চেয়েছিলে শত দায়
সে-আমি এখানে এতদূরে এসে দেখি আজ
শব হয়ে পাশে শুয়ে আছে যত বনচর
কাঠের শরীরে, তুমি অশরীর, অমলিন

ফিরে আসবার পথে পা বাড়াই, ওঠে ঝড়
নিমেষে নিরালা শব্দে শব্দে ভরে যায়
তড়িৎচমকে দেখি সব গাছই শমীগাছ
আড়মোড়া ভাঙে শুয়ে ছিল যারা এতকাল

তখনই তোমাকে দেখি আজও তুমি অবিনাশ

বাঘ

সুনীলকুমার নন্দী

এদেশের বোধবুদ্ধি যারা ধরে আছে
মাটিতে পা-রাখা তারা ভুলে গেছে কবে —
চারিদিকে ঝুঁকে-আসা ঘোর অন্ধকার নিয়ে
লোফালুফি খেলা চলে শূন্যের ভিতরে।

হয়তো এসব অনেকেই
জানে না তেমন করে, না-জানাই ভালো। ওই
দু-বেলা দু-মুঠো অন্নে বেঁচেবর্তে-থাকা জনতার, জানি
সৃষ্টির উৎসাহে-জাগা বিশুদ্ধ আবেগ আজও
মাটিতে ছড়ায় বীজ, তাঁতের মাকুতে জোড়ে সুতো —
তাদের নক্ষত্রনীলে
চিরায়ত দেশকাল কিছু যা-বা আছে, মিশে আছে
অনন্ত ভোরের স্বপ্নে সূর্যপ্রতীক্ষায়।

তবে তা, বিশাল ডানা মেলে অন্ধকার
দিন দিন গ্রাস করে পলকে পলকে। যেন
বিড়াল নাচাতে গিয়ে নাচালো এ-বাঘ
দেশের চালিকাশক্তি বোধবুদ্ধি যারা ধরে আছে।

বড়ো বেশি অন্ধকার

শামসুর রাহমান

বড়ো বেশি অন্ধকার চাঁদের মুখকে কলঙ্কিত
করে নিজ প্রাধান্য ছড়িয়ে
শয়তান সেজে বসে। উপরন্তু দুরন্ত বাতাস
পাগলামি করেছে কায়েম।

চেয়ারে ছিলাম বসে একা খানিক টেবিলে ঝুঁকে
অসমাপ্ত কবিতার দিকে। কিছুতেই
পরবর্তী পঙ্‌ক্তির জরুরি শব্দ মনে
হা কপাল! উঁকি দিচ্ছিল না কিছুতেই।

অকস্মাৎ ঘরের বাইরে তাকাতেই চোখে পড়ে —
রেলিং-এ রয়েছে বসে এক

নীরব সোনালি পাখি দেখছে আমাকে
কৌতূহলে, যেন আমি অন্য কোনো গ্রহের বাসিন্দা।

কী আশ্চর্য! আমাদের দু-জনের মধ্যে মুহূর্তেই
গড়ে ওঠে সখ্য, মনে হল। কণ্ঠ তার
সহসা ছড়িয়ে দিল অপরূপ সুর। তবে সে কি এ-কবির
বর্তমান ঈষৎ নিষ্প্রভ সুরটির, হায়, পেয়েছে খবর!

ইচ্ছে হল এক্ষুনি টেবিলে জোরে মাথা কুটে মরি,
অথচ বাঁচার সাধ ফুলঝুরি হয়ে
জেগে থাকে। শঙ্খমালা পরীদের অপরূপ
চোখের মহিমা নিয়ে কখনো সখনো ঝুলে রয়।

এ কেমন যুগে পা রেখেছি, প্রিয়তম বন্ধুকেও
কখনো সখনো শত্রু বলে মনে হয়
অন্ধকার রাতে পথ চলার সময়। কণ্ঠস্বর
ভীষণ অচেনা আর চক্ষুদ্বয় খুনির মতোই অবাস্তব!

দুটি কবিতা

বেণু দত্তরায়

হেঃ হেঃ

ভালোই আছি, দাদা।
ভালো
  এবং মন্দেও আছি।
এ-বছর বড়ো তীব্র জলকষ্ট

মাঝে-মধ্যে
দাদারা আসেন-যান
ভিরমিও খান — মাঝেমধ্যে
হোঁচটও
তবু খোঁজখবর নেন

এ-রকম দামি গাড়ি
বাড়ির সামনে

ভালোই তো আছি, হেঃ হেঃ
দাদারা আসেন-যান
উপস্থিত জলকষ্টে
মাঠ-ঘাট-বাট
পিপাসায়
  ছাতি শুকিয়ে কাঠ

অবশ্য দাদারা আসেন-যান
ভালো থাকি
মন্দ থাকি — হেঃ হেঃ

এ-বছর নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন
ভালোই তো

আপনাদের দামি গাড়ি
হেঃ হেঃ
বাড়ির সামনে
নির্বাচনে জিতলে
ল্যাংরা আম খাওয়াবেন?
হেঃ হেঃ

উপস্থিত জলকষ্টে
জলকষ্ট বড়ো তীব্র
ভালোই তো আছি, দাদা
হেঃ হেঃ

সঙ্গত-অসঙ্গত ইত্যাদি

চোর ও প্রেমিকের মধ্যে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে
নগরপালক এবং বেশ্যার ক্ষেত্রেও তাই
রাত্রি-অন্ধকারে চোর ও প্রেমিক
দুজনেই দুরু দুরু পায়ে হেঁটে যায়। তাদের
  পায়ের ছায়াতেও তারা চমকায়

দেয়াল টপকে আসে অনায়াসে, অক্লেশে পাইপ
ধরে ঝোলে চোর —
ব্যালকনিতেও যায়। কিংবা অদৃশ্য কারসাজিতে

দরজা খোলে। বলে, ধনরত্ন লুটে নিতে দাও
অবশ্য প্রেমিক এ-সব বলে না। কিন্তু সে-ও
সদর দরজায় যায় না, দেয়াল টপকিয়ে মধ্যযামে
আসে। প্রেমিকার হাত ধরে লুণ্ঠন করে

তা বলে উভয়ের মধ্যে মিল খুঁজতে যাওয়া অসঙ্গত

একজন নগরপালক অবশ্যই কখনো নিজেকে
নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন না। এবং তাঁর ব্যস্ততারও
শেষ নেই।
একজন বেশ্যাও তাই। সে সর্বদাই অসন্তুষ্ট এবং
ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চতুর্দিক দ্যাখে...
যদিও তাদের মধ্যে মিল খুঁজতে যাওয়া অসঙ্গত

যদি মিল খুঁজতেই হয়, বরং একজন
ধর্মযাজক ও মেষপালকের মধ্যে মিল
খোঁজাই সঙ্গত
কেননা উভয়েই অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পান। অর্থাৎ
একজন মেষপালকের কাজ ভেড়ার খবরদারি। অবশ্য
একজন ধর্মযাজকও প্রকৃতপক্ষে তাই করেন। পৃথিবীর
যাবতীয় মেষ কিংবা ভেড়াদের ইহকাল-পরকাল...

অপার জল

মণীন্দ্র গুপ্ত

বড়ো ভাইটা স্বার্থপর, ছোটো ভাইটাও স্বার্থপর।
পাশের বাড়ির মেয়েটা ভাবছে, কাকে বিয়ে করি!
বড়ো ভাইটার ট্যারা-চোখ বিষয়-সম্পত্তির দিকে,
ছোটোটার মন চায় শুধু শিশোদরের তৃপ্তি।
মেয়েটা ভাবছে, কাকে বেছে নিই — ভাসুরকে না দেওরকে?

ওদিকে পাহাড়চূড়ায় মেঘ জমেছে।
সন্ধের পর বাজ গর্জন করে, বিদ্যুৎ চমকায়।
শুকনো নদীকে বর্ষা ফুলিয়ে তোলার আগেই
সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

কিন্তু সিদ্ধান্তের আগেই
দশ দিনের একটানা বর্ষায় নদী ভেসে গেল।

গম্ভীর ঘোলা জল তোড়ে ছুটছে।
মেঘের শেষ নেই —
সন্ধেবেলা আকাশের গাঢ় নীল স্তম্ভ খিলান আর্চের মধ্যে
হঠাৎ হঠাৎ শেষ সূর্যের আলো লাল রোমশ জন্তুর মতো
ছুটে পালায়।
মেয়েটা পৃথিবীর এই জলধারার পাশে
শূন্য মুঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে —
শুধু পাশের বাড়ির লোক দুটো নয়,
পৃথিবীর সব পুরুষই মাটির ঢেলার মতো এই জলে হারিয়ে গেছে।

চারটি কবিতা

দীপংকর দাশগুপ্ত

অ্যারিস্টটলের প্রতি

প্লেটো প্রিয় তবু সত্য প্রিয়তর
অথচ চূড়ান্ত সত্য ধ্রুব কিছু নেই
সত্য কিংবা মিথ্যা সে তো বাক্যের আলেয়া
বাক্যের অতীতে গেলে অন্ধকার শুধু অন্ধকার
সত্য সে যে অলৌকিক সমুদ্রের দূরাগত ধ্বনি
একটু আভাস আর একটু ইশারা
যত কাছে যাও দূর থেকে দূরতর
ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর জলকলরোল
অনন্ত অ-কায় সেই সমুদ্র কি ছিল কোনোদিন
আছে কোনোখানে
বাক্যহীন অন্ধকারে একাকী নৌকোয় আমি কোথায় চলেছি
জলকলকোলাহল স্পষ্ট শুনতে পাই
সমুদ্র কি সত্যি সত্যি আছে এইখানে
অনির্দেশ ভেসে যাই আলো আর অন্ধকারে
একাকী আমার নৌকো চলেছে চলেছে।

ভোর হয়

মিথুন লগ্ন বৃশ্চিক রাশি
নবজাতকের আয়ু চতুঃসপ্ততি

চতুঃসপ্ততি চতুঃসপ্ততি
পাখপাখালির কলরবে তবু ভোর হয়
রাঙা আলো গাছের পাতায়
কাঁঠালিচাঁপার গন্ধে কৈশোর ছুটে এসে
আলিঙ্গন করে
হলুদপাতার গন্ধে হাত ধরে টানে
অবাধ্য শৈশব
অর্জুনগাছের নীচে হতাশ যাত্রীরা
এইমাত্র চলে গেল নেত্রকোনার বাস
রাঙা ধুলো ওড়ে
চতুঃসপ্ততি চতুঃসপ্ততি
একতারা বাজে একটানা
পাখপাখালির গানে তবু ভোর হয়।

অদ্য শেষ রজনী

হিংস্র শ্বাপদের খেলা শেষ হল
মঞ্চ থেকে একের পর এক বাঘ বেরিয়ে যাচ্ছে
খাঁচার দিকে
শেষ বাঘটা বেরিয়ে যাবার আগে
দাঁত খিঁচিয়ে গর গর শব্দে প্রতিবাদ জানাল
তারপর মাথা হেঁট করে খাঁচায় ঢুকল আবার
মুহুর্মুহু মুগ্ধ করতালির মধ্যে রিং মাস্টার
মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন
বুকে ঝুলছে অনেকগুলো মেডেল
হাতে একটা বাঁশের চেরা বাখারি
যা সশব্দে আঘাত করে একটু আগেই
অবাধ্য অনিচ্ছুক শ্বাপদদের শাসন করছিলেন
তাঁর দু-পাশে দাঁড়িয়ে দুটি দৃপ্ত সুন্দরী
কে বলবে যে এরাই বাঘের ব্যাদিত মুখে

হাত ঢুকিয়েছিল শুয়েছিল দু-হাতে জড়িয়ে
পিঠের উপর চড়ে দেখিয়েছিল
দাঁড়িয়ে শুয়ে অবিশ্বাস্য সব শারীরিক কলাকৌশল

একসময় করতালি থামল
দর্শকশূন্য তাঁবুর নীচে তখনো মঞ্চে দাঁড়িয়ে
রিং মাস্টার আর তাঁর দুই কিশোরী সহকারী
একটি একটি করে আলো নিবছে অন্ধকারে
জেগে আছে করতালির ক্ষীণ প্রতিধ্বনির রেশ
তা-ও ক্রমে মিলিয়ে গেল
এখন শূন্য শুধু শূন্য।

বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রীযুক্ত আ-মহাশয়, সাকিন কলিকাতা, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে একটি মোকর্দমা দায়ের করিয়াছেন এবং এই মর্মে একটি হলফনামা পেশ করিয়া দাবি করিয়াছেন যে তিনি প্রয়াত কবি অ-মহাশয়ের পরবর্তীকালে, বঙ্গসাহিত্যের একমাত্র কবি, সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং সর্বশেষ কবি; তৎসহ প্রত্যয়িত তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপন-পূর্বক আবেদন করিয়াছেন যে মহামান্য আদালত যেন তাঁহার অনুকূলে রায়প্রদান করতঃ বিতর্কিত বিষয়টির চিরতরে নিষ্পত্তি করেন।

প্রকাশ থাকে যে ইতিমধ্যে মান্য সাহিত্যবেত্তা যিনি পাণ্ডিত্যের হদ্দমুদ্দ তিনি শ্রীযুক্ত ই-মহাশয়কে প্রয়াত কবি অ-মহাশয়ের পরবর্তীকালে বঙ্গসাহিত্যের একমাত্র কবি তথা শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মহতী কবিসভায় ঘোষণা করিয়া, বঙ্গসাহিত্যের অপরাপর কবিগণকে যথা: ক, খ, গ, ঘ... মহাশয় / মহাশয়াগণকে উপেক্ষা করিয়া, বিলক্ষণ তাঁহাদিগের অশেষ মর্মপীড়ার কারণ হইয়াছেন।

আমার মক্কেল কবিবর আ-মহাশয়ের আবেদনের বিরুদ্ধে কাহারও যদি আপত্তি থাকে তাহা হইলে অদ্য হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে যথাবিহিত অবহিত করাইবেন, অন্যথায় উপর্যুক্ত মোকর্দমার একতরফা নিষ্পত্তি হইবেক।

আদালতের অনুমত্যনুসারে
শ্রীযুক্ত ..... এম.এ., এল.এল.বি.
মোকাম ... কলিকাতা
(অ্যাডভোকেট সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়)

তিনটি কবিতা

তরুণ সান্যাল

জালবন্দী জলে

রাজপুত্রেরা গেছে এই সড়কে
ধুলো উড়িয়ে শাদা বাদামি ঘোড়ায়
ঘাটে-পথে বউ ঝিয়ারি উধাও
বর্গি লুটের দিন মনে পড়ায়

ভাইরে স্মৃতি আজও পরান পোড়ায়

খোকাদের ঘুম আনে বর্গিরা
বেঁটে বেঁটে ঘোড়ার সওয়ার
খুকিদেরও ওয়ারেন হেস্টিন্
রসুনখেতে বুনেছেন জোয়ার

বুলবুলিরা পোষ-মানা গোঁয়ার

কাঁধে লাঠি কোমরে চাপরাশ
গোঁপ চুমড়িয়ে ওই বরকন্দাজ
বর্গিরা তো ছ-মাসে ন-মাসে
দশ মাথটে এরা জমায় কাজ

বিশ্বজোড়া শাদা-কালো সমাজ

রাজপুত্রেরা গেছে এই রাস্তায়
পিছে চলেছে তোটক কামান
ভাটি দেশে পালাবে কোথায়
রাজরাজরাই যখন ধাবমান

মাছ উঠুক খ্যাপলা জাল টান।

মাথট — মাথাপিছু হিসাবে সংগৃহীত।

বন্দীরা

নোনাপানি গলুই ছুঁয়ে পাটাতনে ফেনা ছড়াচ্ছিল,
আমরা তো গরিবগুরবো, নড়েচড়ে যে বসব তাও কঠিন,
উবু হয়ে ঝড়বন্দী, এ-ওর গায়ে এমন শীতে ঠেসান হয়ে নীল,
সকাল যায় দুপুর যায়, শেষমেষ নুয়ে পড়ল দিন।

সন্ধ্যা না হতেই আলো ঝলমল ঝলমল ইস্টিমার
পাশ কাটিয়ে উড়ে গেল, ছই থেকে চোখ অবাক বিদেশি বন্দী দেখছিল বউ-ঝিও,
কী সুন্দর গোছ পায়ের পাতা ওদের একটুও কাটা চিহ্ন নেই,
মনে হয় মাথা ঠেকাই, চুমো খাই, মুখ ওখানে ঘষি,
ঝুম ঝুম পায়েল নাকি গয়না-টয়না ওই রকম দেহেরই আত্মীয়

আমরা বসেই আছি, আকাশে ঢাউস চাঁদ সোঁদর বনে শশি
ঘরে গা-ভর মেছো গন্ধ বউ না বিটি একটুও তো ঠাটঠমক নেই

নোনা জল উড়াল ফেনা মুখ ভেজালো, বিদেশি বন্দী তো,
শালপাতায় ঘ্যাঁট-পুরী — হাত পা ধুতে টিনভরতি লবণ,
গলা জ্বলে যায়, মেয়েটি ঠিক যেন চাঁদ-ভাসানো দিঘি
জ্যোৎস্না উপছে পড়ছে রূপে
যা রে নাও যা রে মনপবন
একটু ছুঁয়ে আয় ভুরু ঠোঁট গলা নিতম্ব বা স্তন
আহ্ কেবল নোনা পানি ঘোলা জল শুধু ছলাৎছল

পদ্ম তো ফোটে না বাদাবনে গোনে বা বেগোনে কাদা রেখে যায়,
শরীর তো বন্দী দশা কেঠো গলুই আঁধারে হাতরায়।

সেই দিন

এসব পদ্য দণ্ডকলস-জুঁই
ফুটে ওঠাও তো ঝরে পড়ার দায়
তুই আমাকে গান ঢেলে ভরছিলি
ফাঁকা সোরাই সেইদিন সন্ধ্যায়

এক আকাশ ও কামিনী ফুটেছিল
তা গুলঞ্চ ফুটবে না ভাবছিস
হলুদ বনে কলুদ ফুলগুলি
চাঁপা ডালেও চাঁদ ছোঁয়ানো বিষ

এমনি-এমনি কবে বালকবেলায়
বুনেছিলাম ম্যাজেন্টা কাঞ্চন
বিশ্বাস করবি না ভাই তোরা
এক-গা শাদায় ধুতরো ভরল বন

দেবাদিদেব সেই ধুতরোয় স্বয়ং
ছোটো কলকেয় ভরে নিলেন ভাঙ

আমরা বলি শিবরাতে সলতেটি
গোচর কিছু বাক্যে বা অবাঙ্

কথন বলিস শব্দজব্দ বলিস
ও-ও-তো পদ্যে ঝটকায় জুঁই ফুল
ভিজে সন্ধ্যা গানে ভরলি যদি
কুন্দ ফোঁটায় ফোঁটায় এলোচুল।

দুটি কবিতা

আনন্দ বাগচী

দুই বেলা

ছোটোবেলায় কবিতা লিখতাম।
অবশ্যই তাকে যদি কবিতা বলায়
কারো কোনো আপত্তি না থাকে!
আসলে সেগুলো
পদে পদে মিল দেওয়া
পদ্য বলা যায়।
তারপর বড়োবেলায়
পদ্য কিংবা কবিতা কিছুই
লিখিনি, তখন
নানাবিধ গদ্যটদ্য আর
ত্রিলোচন কলমচির মতো
লিখেছি শান দেওয়া ব্যঙ্গ
এবং বিদ্রূপ।

এপার ওপার

আজকাল কেউ ভালো নেই
সমর না আমি না, আমাদের
দুজনেরই কোমরে হাঁটুতে পিঠে
অ্যায়সা ব্যথা যে
নড়াচড়াই দুষ্কর।

চোখে ছানি পড়েছিল
কাটিয়ে নিয়েছি তাই
দুজনেই দেখতে পাই
দূরের কাছের সবকিছু!
মোদ্দা কথা আমাদের
অমিল একটাই —
ওর স্ত্রী পরপারে, আমার এপারে।

নেপথ্য কাহিনী

বটকৃষ্ণ দে

কী যে দিনকাল পড়েছে আজকাল!
শব্দেরা সব বড্ড বেয়াদব হয়ে গেছে
ডাকলেও কাছে আসে না, দুষ্টু ছেলের মতো পালিয়ে বেড়ায়
ধরা দিতে চায় না কিছুতে।
পঞ্চাশ বছর ধরে ঘর করছি সুখে দুঃখে আনন্দ বিষাদে
তবু, প্রায়ই মনে হয় ওরা বুঝি সম্পূর্ণ অচেনা
যতই তোয়াজ করো কথা শুনবে না,
আদরের ভাষাও বুঝবে না
শত উপরোধে কোনো কাজ হবে না —
হাত বাড়ালে মুখ ফেরায় — গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন যেন!
তার উপর অসম্ভব বেপরোয়া (জেদি 'জেন-এক্স' বুঝি!)
যা ইচ্ছে তা-ই করবে, অন্যের অনিচ্ছাটা কোনো
ব্যাপারই নয়।

কাল রাত্রে ঝড় হয়ে গেছে, ঘরে ভিজে-ভিজে হাওয়া
দু-পয়েন্টে ফ্যান ঘুরছে, ব্যস — এ-পরিমণ্ডলে
বেশ ভালো হল, পড়ে পড়ে অঘোরে ঘুমোয়
শব্দেরা, তাদের নড়াচড়ার নামটিও নেই।
এদিকে আরেকজন, ধরো আমি, কাতর নয়নে নির্ঘুম
শব্দের পিছন-পিছন ছুটছি, এ-ঘর ও-ঘর করছি

কত শত বার
তবু তারা, স্বাধীনতা সংগ্রামীর মতো, চতুর ফেরার।

অথচ, বহুদিন বাদে খ্যাতনামা সম্পাদক মশায়
(কী সৌভাগ্য!) কবিতা চেয়েছেন —
কথাও দিয়েছি। কথার খেলাপ করা মোটেই কাজের কথা নয়
কিন্তু, কবিতার কর্ম-ও-মর্মকথা যে শব্দ, তারা কাছেই ঘেঁষে না, ধ্যুৎ!
দুষ্টু শালিকের মতো কাছে গেলে অমনি ফুড়ুৎ।
পঞ্চাশ বছরে জেনেছি
ছোটো ছোটো এক-একটি শব্দের তুরুপ
ভালোবেসে পাশাপাশি এসে বসলে
কৃষ্ণচূড়া শিমুলে পলাশে
ফাল্গুন আগুন জ্বালায়
ঈশানে আকাশ-কোণে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ভেসে আসে
শ্রাবণে শান্তিনিকেতনে ছাতিম পাতায়
ঝমঝম বৃষ্টির নূপুরের তালে
মন-দেওয়া-নেওয়া করে প্রেমিকেরা রবীন্দ্রসংগীতে
গীতগোবিন্দের ছন্দে চলতে থাকে ওড়িশির
অষ্টাপদী অভিনয়
সত্যজিৎ রায়-সৃষ্ট বর্ষার দৃশ্যতে
অদৃশ্যপূর্ব এক সৌন্দর্যের স্বরলিপি লেখা হয়
এবং সংগম-পূর্ব-ক্রীড়া অনুযায়ী
মেলে ধরা বনময়ূরের পেখমের চারুসাজ
এ-তো সব শব্দেরই কারুকাজ!
এ-ও জানি, তোমরাই আনো তিস্তার পাড়-ভাঙা বন্যার বন্যতা
তেমনি তোমরা আনো প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের
হু-হু করা ব্যথার শূন্যতা!

হে শব্দ, প্রতারণা ভুলে একবার কাছে এসো,
চুপ থেকো না, এসো দুটো কথা বলি
ভুলে যাও লুকোচুরি খেলা অথবা সংঘর্ষ
অন্তত একবার তোমরা সহযোগিতার হাত বাড়াও
কত রাত ধরে ক্লান্ত যে-কবিতাটা লিখতেই পারিনি
সে-কাহিনী, সেই অসম্পূর্ণ কবিতাটা শেষ করতে দাও!

দুটি কবিতা

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমের রোদ

ঝড় ও প্রস্রবণ দ্রুততায় সমান সমান
সপ্তাহখানেক পরে আজ সেই নীল শাড়ি
ক্ষান্তবর্ষণের মধ্যে আকাশ যেমন নীল
আমার চেয়ার কিংবা বইয়ের র‍্যাকের রং
অদূরে চঞ্চল যানবাহন
তিনি কোন হাওয়ার পাখি ধরাছোঁয়ার বাইরে
পরে সেই সিঁড়ি-ভাঙা উঠে যাওয়া দূরের উঁচুতে
নগরের গঠন নিয়ে যে বই বিছানায়
সে কিন্তু কিছুই জানে না
জানে না র‍্যাকের ওপর সারি সারি অন্য সহচর

আমার পশ্চিম জানলার রোদ
প্রিয় বন্ধু সাড়ে তিনটেয়
আর কারো টেলিফোন নেই
কোথায় খুঁজব এখন রিলকেকে
বিকেল চারটের দিকে এগিয়ে চলেছে —

দিনের পর দিন

মাঝে মাঝে মন্থর এসে দাঁড়ায়
সম্মুখে উদাস সময়
সুযোগসন্ধানী মশার কামড়
ক্রোটন দোলনচাঁপা হয়ে যায়
যে-ছেলেটি এসেছিল সে কেন নিজের কথা বলতে পারেনি
সব গাছ না চিনলেও সব গাছ কাছে কাছে আছে
কাঠ-মাফিয়ার দল নবাবি আমের বাগান সাফ করছে
কাগজের সংবাদ কিন্তু কাউকে কাউকে বিচলিত করে
বাগানের এক কোণে মোটা-গুঁড়ি শজনের গাছ
আজও কি তেমনি আছে
ফোনে যার হাসিমুখ ভাসে সে কোথায় কতদূরে

মুহূর্তেই কাছে চলে আসে
নিজেকে অসংলগ্ন ভাবি — কোথাও পেরেক নেই
কীভাবে কী আটকে রাখি
দিনের কয়েকটা সময় সিগ্রেটের গন্ধ ভেসে এলে
চারিদিক পুরুষালি হয়
এখন মেয়েলি মেঘের ছায়া মোটে নেই
শীত পার হতে হবে
গ্রীষ্ম বহুদূর
তারও পরে বর্ষার পারাপারহীন ধারাপাত
উঠোন চত্বরে —

এখন কবিতা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

লেখক অ্যাল ইয়ং এসেছিলেন বাঙালি কবিদের সঙ্গে
আলাপ করতে। আমরা তাঁর কথা শুনলাম।
তারপর হাই-টিতে যোগ দিলাম।
তিনি বললেন, আমেরিকায় এখন প্রবলভাবে
কবিতা লেখা হচ্ছে, বস্তুত
কবিতা ছাড়া আর কিছুই লেখা হচ্ছে না।
তবে সে-সব রচনা নিভৃতে বসে একলা পড়ার নয়
সকলে মিলে উপভোগ করার।
কবিতার সঙ্গে বাজনা বাজে, আলো খেলা করে মঞ্চে,
সুর করে গাওয়া হয় কবিতা।
বড়ো বড়ো সভাকক্ষ ভাড়া করে কবিদের সংবর্ধনা জানানো হয়,
কবিতার ডিস্ক বেরোয়, জাঁকজমক করে
রিলিজ করা হয় কবিতার বই।
যার যত প্রচার, তার তত নাম,
খবরের কাগজ আর ভিডিও পাল্লা দিয়ে লড়ছে
কবিতাকে জনপ্রিয় করতে। কবিতার লাইন দিয়ে
কাগজের শিরোনাম তৈরি হয়
কবিতার লাইন মুখে করে মিছিল যায় রাস্তা দিয়ে।

সে-সব কবিতা চুপচাপ বসে পড়ার নয়
নির্জন কবির সঙ্গে নির্জন পাঠকের কথাবার্তা নয়,
সমবেত উচ্চারণ, হই হই, ড্রাম, গিটার,
এনটারটেইনমেন্ট।

আমি শুনে ভাবি, এখানেও তো তাই —
এখন তো এখানেও কবিতাই এনটারটেইনমেন্ট,
পাশাপাশি দাঁড়ায় সুন্দরীরা
কবির চেয়ে আবৃত্তিকার বেশি জনপ্রিয়,
খোলা ভাষায় কবিতা লেখা এখন কত সহজ হয়ে গেছে।

কথা ছিল দুঃখী মানুষ কবিতা লিখবে
একলা মানুষ পড়বে, বারবার,
আসলে সুখী মানুষ আর দলবদ্ধ মানুষ মিলে
অল্প সময়ে একটা কিছু সেরে ফেলবার জন্যে
কবিতাকে বেছে নিয়েছে।
কেবল আবেগ নয়, এখন শব্দই সম্বল কবিতার —
শব্দ — যার ইংরেজি প্রতিশব্দ সাউন্ড।

ভেবে দ্যাখো তুমি, ভেবে দ্যাখো

যুগান্তর চক্রবর্তী

ভেবে দ্যাখো
জীবন একটাই
একবারের জন্যই বেঁচে থাকা
আর, ঠিকমতো বাঁচার সুযোগ
জীবনে একবারই আসে
ভেবে দ্যাখো তুমি, ভেবে দ্যাখো
একজীবনের বেঁচে থাকার মধ্যে
তেমন সুযোগ তুমি
আদৌ পেয়েছ কি পাওনি

ভেবে দ্যাখো
যে-জীবন তুমি বাধ্য হয়ে যাপন করছ

আর, বাধ্য হয়েই যে-জীবন তুমি
যাপন করছ না
আর, সম্ভাব্য যে-জীবন
তুমি যাপন করতে পারতে
এর কোনো-একটার জন্য
অন্য কোনোটা ছাড়তে
তুমি রাজি আছ কি না

ভেবে দ্যাখো
ছেলেবেলার ছড়াছবির মতো একদিন
কী সহজ ছিল তোমার নিশ্বাসপ্রশ্বাস
তোমার প্রতিদিনের বেঁচে থাকা
কত অল্প ছিল তোমার চাহিদা তোমার প্রয়োজন
তোমার দাবি
একদিন কী সরল আর নিষ্পাপ ছিল
তোমার সব বিশ্বাস
একদিন কী সহজে তুমি বিশ্বাস করতে
একদিন সময় বদলাবে সমাজ বদলাবে
সব কিছুই বদলাবে আর অন্য রকম হবে
বাতাসের মতো অবাধ আর সময়হারা হবে
মানুষের জীবন
একদিন মানুষ ফিরে পাবে
তার হারানো মুখ
আর সমগ্র অবয়ব

অথচ কী কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে
আজ আমাদের যেতে হচ্ছে
কী কঠিন একটা সময় যখন
সব কিছুই কেমন অতিকায় হয়ে উঠছে
সব কিছুই কেমন প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠছে
সব কিছুই কেমন কঠিন আর রক্ষণশীল
আর একরোখা
আজ আমাদের বিশ্বাস আর আদর্শের
সমস্ত আশ্রয়গুলি
কেন এমন প্রতিষ্ঠানের মতো অতিকায় আর

একরোখা আর কঠিনভাবে রক্ষণশীল হয়ে উঠল
কেন সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়
কেন চলতে ফিরতে কথা বলতে সর্বদাই এমন ভয়

ভেবে দ্যাখো তুমি, ভেবে দ্যাখো
জীবন একটাই আর একবারের জন্য তুমি বেঁচে আছ
এমন একটা সময়ে তুমি কী করবে আর করবে না
কী বলবে আর বলবে না
কতটা বলবে কতটা বলবে না
কাকে কতটা ভয় পাবে বা পাবে না
কতটা ভয় পেতে তুমি বাধ্য
কখন চুপ করে থাকতে বাধ্য
ভেবে দ্যাখো, ভেবে দ্যাখো
কেন সর্বদাই তোমাকে বিরোধীপক্ষে
থাকতে হচ্ছে
এমনকী যা প্রথামাফিক বিরোধীপক্ষ
তুমি চিরকাল তারও বিরুদ্ধে

ভেবে দ্যাখো
জীবনে স্বাভাবিক আর উচিত বলে
দুটো কথা আছে
কিন্তু যা-কিছু স্বাভাবিক তা কি সর্বদাই উচিত
নাকি যা-কিছু উচিত তা সর্বদাই স্বাভাবিক
আবার জীবনে এমন অনেক কিছুই আছে
যা একইসঙ্গে স্বাভাবিক ও উচিত
আবার এমনও অনেক কিছু
যা না উচিত, না স্বাভাবিক

ভেবে দ্যাখো তুমি, ভেবে দ্যাখো
আজ তোমাকে তো এমন একটা কিছুই চাইতে হবে
যা একইসঙ্গে উচিত ও স্বাভাবিক
আজ স্বাভাবিকভাবেই তো এমন একটা আশা
তুমি করতে পারো
একদিন মানুষ কবিতায় কথা বলবে
কারণ কবিতায় কথা বলাই তো
মানুষের পক্ষে উচিত

আর কবিতায় কথা বলাই কি মানুষের পক্ষে
একইসঙ্গে স্বাভাবিক নয়

ভেবে দ্যাখো
আজ এমন একটা আশা পোষণ করা
এমন একটা আশা নিয়ে বেঁচে থাকা
আজ তোমার অবশিষ্ট জীবনের
প্রতি মুহূর্তের শ্বাসকষ্টের মধ্যে
উদ্বৃত্ত আয়ু নিয়ে কষ্টে শ্বাস টেনে
একেকটি মুহূর্ত বেঁচে থাকার মধ্যে
শ্বাসরোধকারী তোমার অবশিষ্ট জীবনের
কষ্টকর বেঁচে থাকার মধ্যে
ভেবে দ্যাখো, ভেবে দ্যাখো
আজ শেষবারের মতো
এমন একটা আশা করাই তো তোমার পক্ষে
স্বাভাবিকভাবেই উচিত
এমন একটা আশা —
একদিন পৃথিবীর সব মানুষ কবিতায় কথা বলবে
একদিন পৃথিবীর সব কবিতা মানুষের কথা বলবে
একদিন পৃথিবীর সব কবিই হবে অজ্ঞাতনামা
একদিন পৃথিবীতে কবি থাকবে না
শুধু কবিতা থাকবে।

বিজলি-লাগা দশটি আঙুল

আল মাহমুদ

এ কেমন অঘটন-ঘটনের দেশ বলো যেখানে বছরের শুরু হয়
ঝড়ের তাণ্ডব লন্ডভন্ড গাছপালা পাখির বাসার খড়কুটোর মতো
উড়ে যাওয়া প্রাণের আবাস ছিন্নভিন্ন।
প্রকৃতির বিপ্লব ছায়া ফেলে না মানুষের মুখের ওপর। পাখির ভাঙা ডিম
গলে পড়ে কিষানের দাড়ি বেয়ে। হাঁড়ি কলসি উবুড় হয়ে পড়ে থাকে
কেবল গোছায় নারীর হাত। আবার সিদ্ধ করে ক্ষুধার্ত মানুষের ভাত
নুন-পানি। প্রকৃতির মারে এমন প্রতিবাদহীন মুখ আর কোথাও

কি আছে! কিন্তু শুরুটা এমন অন্ধকার হয়ে-আসা মেঘ, ঘূর্ণি-তোলা
বায়ু আর কেবল বিদ্যুৎচমক। তবু তো বলি, 'জয় হবে মানুষেরই।'

কতই না ইচ্ছে ছিল ঝড়ের রাতে আশ্রয়-নেওয়া সেই তাঁতি বাড়িটিতে
আবার ফিরে যাব। তাঁতের ওপর ঝুঁকে আছে একটি ঘর্মাক্ত মুখ
মাকু টানছে আর জামদানির নকশা গুমগুম করে আছড়ে পড়ছে
সুতোর ওপর যেন বাংলাদেশকে সোনার সুতোয় রুপোর গিঁট মেরে
দৃশ্যমান করে তুলছে এক তাঁতিনির বিষণ্ন মুখ। তার বুক উদোম
হয়ে ঝুঁকে পড়ছে তাঁতযন্ত্রের ওপর। আহা! সে যদি জানত
তার অঙ্কিত ছবির মতো একটি দেশ সত্যি লক্ষ লক্ষ শোষিত
মানুষের মগজে মাখনের মতো মন্থিত হচ্ছে তা হলে তার বাহুর
নগ্নতা পেশির ঘাম উপচে পড়ত আকাশে।
আমি তো ছিলাম সেখানে। আমি তো এখনো আছি সেখানে।
বিদ্যুতের আলোয় ওই তাঁত-বোনা চোখ এক পলক আমাকে
দেখুক। আমিও তো শব্দের তাঁতি। ধ্বনির রক্ত-মাংস
একাকার করে মন্থনে তুলেছি কাব্যমিল। দ্যাখো দ্যাখো কীভাবে
বেরিয়ে পড়ে ভাষার মাখন। উথলানো আমার মগজ।
খাও প্রিয়তমা।

ভাগ্যের মৌসুম জুড়ে এই খেলা এই হিমালয় ওই বঙ্গোপসাগরের
একটু ওপর দিয়ে বয়ে-যাওয়া মৌসুমী বাতাসের সঙ্গে লগ্নি-
কারীদের দিশেহারা দিগ্‌ভ্রান্ত হাওয়ার দাপট। দাঁড়াও পথিকবর,
জন্ম যদি বঙ্গে তবে মুষ্টিবদ্ধ করো দুই হাত। বুক পাতো,
সমুদ্র-পাশবদের সব জারিজুরি ডুবাও বঙ্গোপসাগরে।
মুক্ত করো কানসোনা গাঁয়ের ওই নগ্ন-বাহু জামদানি তাঁতিনির
বিজলি-লাগা দশটি আঙুল।

তিনটি কবিতা

শিবশম্ভু পাল

স্বর্ণলতা

এখন পাশবালিশ বড়ো একটা দ্যাখা যায় না, কিন্তু না হলে
ঘুমোতে পারে না সে, আমিও তথৈবচ, তবে কিনা আমার
নিছক বনেদিয়ানা, যাকে বলে বাধ্যতামূলক

ঐচ্ছিক বিষয় — পাশে থাকতে হয়, এই অব্দি; ওর অন্য ব্যাপার —
যখন আমার বুকে চেপে বসে পেশিবল 'বেশ করব' বলে
দুঃখের স্বর্গীয় ভাতে বসিয়েছে থাবা
ডেসডিমোনার রুমালেও পেয়ে যায় তুরুপের তাস —
'কী হয়েছে, এই তো আমি,' বলতে-বলতে আমার দু-হাত
নামিয়ে দেয় জ্বর গায়ে, তারপর পাশবালিশ আঁকড়ে ধরে ঘুমোয়
তখনই বুঝতে পারি বালিশের চেয়ে ওটা তার কাছে বেশি —

অভিমুখ

'বাস এসে গেল, চলি,' সিগারেটের খালি
প্যাকেটের মতো এই কথাটা টপকে দিয়ে উঠে পড়লে

যাও, সকলেই যায়, যেমন ফিরেও আসে সোজা-উলটো কাঁটা
চোখ বুজে বুনে যাওয়া ট্রামলাইন ধরে

বিয়েবাড়ি, পোস্ট অফিস, বাংলা অ্যাকাডেমি হয়ে ধড়াচুড়ো ছাড়া—
গন্তব্য বলে কি একে? বস্তুত যাওয়া তো নয় যাওয়া

স্বয়ংসম্পূর্ণ সে, নেই তার চাবিরিং প্রত্যাবর্তনের
এখানেই লেখা যায় মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনার নীল

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, পাদ্যার্ঘ্য, দিগন্তমৈত্রী, রজনীযাপন
ছাতিমপাতার মতো নম্র আভিজাত্য — তাকে বাঁধিয়ে রাখতে হয় —

মৃদুকম্পন

পুজোয় ক-দিন থাকব শিবপুর, বোনের বাড়িতে —'

বামন কুয়োর ব্যাং কেন যে পারেনি এই ইচ্ছে চাপা দিতে
অট্টহাসে গোটাবাড়ি বসে পড়ল পেটে হাত দিয়ে
দিত না তোড়ায় বাঁধা মন্ত্রীর ঘোড়ার ডিম এতটা হাসিয়ে

শ্যাওলার কম্বলে ঢাকা ব্যাঙের গায়ের নীচে ঘুমের ভেতরে
আঘাটার শুঁড়িপথ পাতালঝাসুকী হয়ে একটু ওঠে নড়ে
শ্রাবণের পরবাস খোঁচা দিয়েছিল তার তমসাশরীর

আবার ঘুমিয়ে পড়ল, বালতির জল ফের স্থির
শুধু তার পাশফেরা সিজমোগ্রাফে ধরে রাখে হাওয়ার মন্দির —

দুটি কবিতা

তারাপদ রায়

রবার

জীবন এত লম্বা হবে তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি।

পঁয়ষট্টি, ছেষট্টি, সাতষট্টি, আটষট্টি, আটষট্টি...আটষট্টি.....
জীবনের রবার ধরে ভদ্রলোক টানছেন, টানছেন
টেনে যাচ্ছেন।

কম কথা নয়,
ভেবে দেখলে পঁচিশ হাজার দিন পার হয়ে গেছে
পঁচিশ হাজার সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়,
আটশো মাস, কয়েকশো কালবোশেখি
সাড়ে তিন হাজার রবিবার
একটা মন্বন্তর, একটা মহাযুদ্ধ, একটা পার্টিশন
কয়েকটা দাঙ্গা, কয়েকটা বিজয় মিছিল।

বন্দেমাতরম্, আল্লা-হো-আকবর, হ্যাপি খ্রিস্টমাস
ঈদ্-মুবারক, শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন;
যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর ওঁ সময়োচিত নিবেদন
ঠাকুরদা-বাবা, মা-মাসি-পিসি, মামা-কাকা
দুল্‌হাভাই, বড়োভাই, সহপাঠী, সহযাত্রী।

কয়েকটা পরীক্ষা, একটা চাকরি, কয়েকটা বাসাবাড়ি
কয়েকটা জায়গা। উঠোনে গন্ধরাজ ফুল, জানালার পাশে কাঁঠালগাছে এঁচড়।
অনেকগুলো কুকুর, বহু বেড়াল, ছোটোবেলায় একটা গরু
জনৈক পুত্র, জনৈকা স্ত্রী, একজোড়া ঝলমলে নাতনি
দু-একজন বান্ধবী, কয়েকজন বন্ধু, পাড়া-প্রতিবেশী, সহকর্মী,
এখনো দেখা যাচ্ছে না, শ্মশানবন্ধুরাও কোথাও
এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে আছেন।

পড়ে রইল চারাবাড়ি, পোড়াবাড়ি ঘাট, সিরাজগঞ্জ বাজার স্টেশন
শিয়ালদহ নর্থ, দমদম-হিথরো, কেনেডি এয়ারপোর্ট
এলাফিনের পথের শেষে এলংজানির খেয়া।
সব মিলেমিশে একাকার। বৃষ্টি ও কুয়াশাভরা শেষরাতে

অশোকনগর, দিল্লি, ঢাকা, ম্যানহাটান, বার্কলে, সিঙ্গাপুর
এলাফিন, টাঙ্গাইল, এসপ্ল্যানেড, কালীঘাট, পণ্ডিতিয়া, থিয়েটার রোড
এক অলৌকিক নোয়ার নৌকা, কিছুটা স্টিমার, ট্রেন, বিমান
মেট্রোরেল হয়ে অটোর মতো এঁকেবেঁকে ভিড় কাটিয়ে
লবণহ্রদের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ায়
খুব চাপা কণ্ঠে কে যেন ভাঙা ভাঙা গলায় বলে,
বড়োবাবু জানতে চেয়েছেন,
রবার কি আরো টানতে হবে।
ফিসফিস করে প্রশ্ন করে,
ওহে, এইচ-এ পঞ্চান্ন
ভেবে দেখেছ
কতদূর এসে গেছ? কতদূর?

হেরিডিটি মানে বংশানুক্রম

'পিতামহ নিঃসন্তান, পিতাও যদি নিঃসন্তান এবং তুমিও যখন নিঃসন্তান, তোমার পুত্রও নিঃসন্তান হবে।' *কাণ্ডজ্ঞান*

অর্ধেক শতক আগে
উদাসীন সঙ্গমের কথা বলেছিলেন এক কবি
তাঁর লেখাপত্র পড়ে বোঝা যায়
সে খুব উদাসীন ব্যাপার ছিল না।

ইতিমধ্যে এই পঞ্চাশ বছরে
সঙ্গমের সর্বনাশ হয়ে গেছে,
সঙ্গমের সংজ্ঞা বদল হয়ে গেছে।
হে পাঠক, তোমাকে আর কী বলব,
তোমার পরলোকগত পিতামহ
রায়বাহাদুর ধনগোপাল
পুকুরের ওপারে, কলাঝোপের ভিতরে
গোয়ালাদের ছোটোবউকে পাশবিক অত্যাচার করেন।

পরে তোমার পূজনীয় বাপ তাঁর বিয়ের রাতেই
তোমার মাসিমাকে বাসরঘরের বারান্দায়
ব্রাহ্মমুহূর্তে বলাৎকার করেন।

তুমিও তো এক ঝিমঝিম দুপুরবেলায়
পাশের বাড়ির বউদিকে ধর্ষণ করেছিলে।

এদিকে তোমার সোনার চাঁদ ছেলে
এই বয়েসেই অন্তত তিনজন সহপাঠিনীর
শ্লীলতাহানি করেছে।

উদাসীন বা অনুদাসীন
আজকাল কেউ আর সঙ্গমের কথা বলে না।

পাখির চোখে দেখা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

১
একবুক জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের চোখের জলও
মেশাচ্ছে সেই স্রোতে
কয়েক পলক মাত্র দেখা
আমি ওই মানুষটিকে চিনি না
তা হলেও কি ওই মানুষটিকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়?
লেখার চেষ্টা করেছি কখনো কখনো
ঠিক নয়, না?
কিছুই না করার চেয়ে এই চেষ্টাটাও কি একেবারে মিথ্যে?

২
বাড়ির দরজার বাইরে হাঁটু মুড়ে বসে আছে ধর্ষিতা মেয়েটি
ওকে ঘিরে আছে একদল মানুষের অহি-নকুল চোখ
ওর ছিন্নভিন্ন শাড়ি ও শরীরে লেখা আছে কিছু ইতিহাস
এমন কিছু দুর্বোধ্য নয়
তবু তা পাঠ করার জন্য একদণ্ডও দাঁড়ানো যায় না
দাঁড়ালেই কান মুলে দেবে বিশ্ব বিবেক
মাটির রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলে যায় হুস করে
একটা কদমগাছ থেকে খসে খসে পড়ছে পাতা
সামান্য মেঘের আড়াল, সূর্যেরও এখন উঁকি মেরে দেখার
অধিকার নেই.....

৩

কলাপাতাগুলো ছিঁড়বেই, ছেঁড়া পতাকার মতো উড়বে
নিমগাছটায় পাখিরা বসে না, তালগাছে ঝুমঝুমি
একটি বালিকা আমলকী তুলে রাখছে হাতের মুঠোয়
সে জানে না তার করতলে ধরা পড়েছে বসুন্ধরা।

ছাতারে পাখিরা সাত ভাই বোন, সারাদিন ঝগড়ুটে
ঘুঘুকে দেখেও কিছুই শেখে না, ইষ্টিকুটুম একা
ভোরের ডাহুক ডাক দিয়ে যায়, রাই জাগো, রাই জাগো
ধড়মড় করে রাই উঠে বসে পরপুরুষের ঘামে ভেজা বিছানায়।

কালোমানিকটি দাঁতন করছে কাজলাদিঘির ঘাটে
মাথার ওপর মেঘ গুরু গুরু, সুদিন আসছে বুঝি
শীর্ণ নদীতে কাপড় কাচছে চণ্ডীদাসের রামী
কানা বৈরাগী দোতারার তার ছিঁড়েও মুচকি হাসছে।

আবহমানের থেকে তুলে নেওয়া কয়েক টুকরো ছবি
বড়োই পলকা, কাঁচা শিল্পীর তুলট কাগজে আঁকা
শুধু ভোরবেলা
রৌদ্র প্রখর হলেই সাম্প্রতিকের
বিষ আর রোষ, বুকে গুরুভার, এও তো সত্যস্বরূপ!

তিনটি কবিতা

সুধেন্দু মল্লিক

চাদর

শীতের কুয়াশা কিছুই দেবে না। কেবল আড়াল করে।
সমুখে দাঁড়ায়। ব্যঙ্গ করে ইশারায়।
হিংসুক বন্ধুর মতো। অপেক্ষানিরত
আমার দমবন্ধ হয়ে আসে। নীরব নিঃশ্বাসে
আমি বলি : ওরে একটু সর্ — ওকে দেখি। একটু দেখি

যে এসেছে। একবার। মরণ-নির্ভর এ-জীবনে।
আর কি পাব রে দেখা প্রাণসখা। সমীরণে অলীক প্রত্যাশা।

শীতের কুয়াশা সম্যক ভুবনে বড়োই নিষ্ঠুর হাসে।
এত জাগরণ প্রেমের বচন এত গান কিছু কি উত্তাপ দেবে
দিতে পারে এ-শরীরে নষ্টনীড়ে!
জন্মে জন্মান্তরে যা কিছু অর্জিত ঘুম যা কিছু অর্জিত আশা
সুখ শান্তি ছুটি অবসর যা কিছু অর্জিত ক্লান্তি দুখবাসরের
গানের নির্ঝর সব নিয়ে কুয়াশা আমার দেহ ঢেকে দেয় —
যেন পৃথিবীর দুঃখীতম দীনতম সন্তের কবরে
প্রার্থনার নির্মুক্ত চাদর।

আমার স্বাধীনতার পতাকা

আজ আমার স্বাধীনতার পতাকা উড়তে পারে না।
ঝোড়ো হাওয়াতেও। দুমড়ে মুচড়ে ঝুলছে
যেন ফাঁসিকাঠে আসামী। ভারী হয়ে গেছে
জলে। যেমন আমার চোখ, কাঁদে না কিন্তু
সারাক্ষণই জল পড়ছে। গড়িয়ে গড়িয়ে।

পতাকায় বুড়ো বয়সের ঝিমুনি। রঙটা
হয়ে গেছে অদ্ভুত গোলমেলে। না সোনালি
না সবুজ না লাল। ক্ষ্যাপার মাথার চুলে
জটপাকানো ময়লা নোংরার শাদা।

তবু যদি একটু উড়ত। তাহলে কি চিরবসন্তের
ডাক বেজে উঠত না?
ভাবি আমার স্বাধীনতার পতাকা করেটা কি?
সারাদিন? কী করে সময় যায় ওর! আমি জানি।
কিন্তু বলি না। সময় কাটছে ওকে ছারখার
বেপরোয়া দাঁতে আর নখে কুটিকুটি
যেমন আমাকে।

জগন্নাথ

স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। বড়ো দুরাশায়
দুঃসাহসী এই ধারার ক্রন্দনে
বহুতল বনে — কলকাতায়।

কেন বৃষ্টি দিয়েছ সম্বল! কেন বারিপাত
অবিরল? তোমার করুণাসম্পাত স্ফুট হবে বলে?
অনায়াসে জলোচ্ছ্বাসে মৃত্যু হাহাকারে কলরোলে
ভূকম্পনে প্রলয়পয়োধি শ্বাসরুদ্ধ চুম্বনে চুম্বনে!

কোথা পথ! কোথা তুমি মনোরথে যাবে জগন্নাথ?
এ-জলপ্রপাত নিশ্চিন্ত লঙ্ঘন করে যাবে অপলকে
দামিনী চমকে। জগন্নাথ, এ-শরীরে তোমার আঘাত
রক্তপুষ্প হয়ে ফোটে। বলো কোথা বসতি তোমার।
দ্বারকায়? মথুরায় — বৃন্দাবনে! নাকি এই হত দরিদ্রের
ধ্বংসের গভীরে দ্বার-ভাঙা ঝড়ের নিস্বনে?

অন্ত্যেষ্টি

দিব্যেন্দু পালিত

এই জলস্রোত এত ক্ষীণ কিছু
ভাসে না এখানে।

যারা তাকে রেখে গেল তারা কেউ
অর্বাচীন নয় —
জল না ভাসায় যদি অবশ্যই শেয়াল শকুন
দাঁত ও ঠোঁটের ধর্মে ডেকে আনবে
অনিবার্য ক্ষয়।

সকলে জানে না, কিন্তু কেউও কি জানে
নারীহত্যা শিশুহত্যা এই শতাব্দীর মানুষের
প্রতিভা চিহ্নিত হয়ে জড়ো করে
পবিত্র আগুন —
যাতে কেউ দগ্ধ হয়, কেউ বা জলস্রোতে
লগ্ন হয় ফের!

আসুন না, ভালোবাসি

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

যদি বলা যেত আমরা বেঁচে আছি, তাহলে ঠিক হত
আমরা তো মরে আছি প্রত্যেক মুহূর্তে, একটু একটু করে,
এইভাবে বেঁচে থাকা অর্থহীন, বলুন তো একে বাঁচা বলে,
কবলে পড়েছি যার, সে তো প্রত্যেক মুহূর্তে আমাদের তুচ্ছ করে দেয়
এর চেয়ে ভালো, বলুন না সব কিছু ভাগ করে নিই,
বানিয়ে বানিয়ে আর কত বলব, তার চেয়ে সত্যি কথা বলি,
এইভাবে একা থাকতে ভালো লাগে? বলুন না একা থাকা যায়,
বাঁচায় মানুষকে মানুষেরা, তারা যদি ঘুমন্ত থাকে নিশিদিন,
তাহলে কীভাবে বাঁচব, বাঁচবার উপায় তো এক,
ভাগ করে নিতে হবে সব কিছু সবার সঙ্গে, দেখুন না চেষ্টা করলাম,
কাজ অকাজের মধ্যে অর্ধেক থাকুক, থাক এইবার সত্যি কথা বলি,
চলি চলি করে তো থেকে যাই, বলাই হয়নি সব কিছু,
পিছু পিছু কারা? মানুষের আকৃতিতে পশুর মতো ব্যবহার,
হার মানতে নেই এত সহজে, মগজে তো ঘাস জমে গেল,
এলোমেলো জীবনকে, আসুন না সোজা করে নিই, দেখুন না চেষ্টা করে
পিছু পিছু কারা আসবে? আসুন না একবার স্পষ্ট করে ভালোবেসে যাই।

দুটি কবিতা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

দুধের বাটি

ভয়-ধরানো ভীষণ কাছে এসে দাঁড়াও, হারায় ছন্দ,
ভালো-মন্দ, সহজ-জটিল বুঝছি না কি মিথ্যে-খাঁটি,
অন্ধকারে মানিক হয়ে জ্বলছে দুটি মণিবন্ধ,
উপোসি এই ঠোঁটের কাছে তুলে ধরছ দুধের বাটি

না-লেখা কবিতা

একটা সময় ছিল,
যখন কলমের তর্জনী নাড়ালেই
অজস্র ভৃত্যের মতো শব্দ আসত,
হেঁটমুণ্ড করজোড় দাঁড়িয়ে বলত —
হুকুম করুন,
তারপর কবিতার কার্পাস
ঘর-বারান্দা-উঠোনময় ছড়াতে ছড়াতে
উড়তে থাকত সারাদিন সারারাত,
কতকাল
কোনো হেমবর্ণ জাগরণ ছিল না আমার,
ছিল না নিশ্চিন্ত নিরপরাধ ঘুম
আর শুধু এভাবেই কোনো অলৌকিক ঝুলবারান্দায়
একটি নারীকে একবার দেখতে চেয়ে
কেটে গেছে আমার বছরের পর বছর যুগের পর যুগ
যার নাম — না-লেখা কবিতা।

ডায়েরি থেকে

উৎপলকুমার বসু

সাহাপুরে চেষ্টা করে দ্যাখো
না হয় তো মল্লিকবাজারে
পুরোনো গাড়ির পার্টস এখানেও পাবে
দক্ষিণের উঁচু খালপাড়ে

প্রত্যেকের খবর প্রত্যেকে রাখে —
এই দেশে মেয়েদের এক নাম: হাসি
বুড়িদেরও সকলের এক নাম
সকলেই : সিন্ধুবালা দাসী।

ওই আছে বিপিনের বিদ্যুৎবিপণি
সুরলহরীর মতো দখলি দোকান,

শোনা যায় দিকে দিকে নিশি-জাগরূক
পুলিশ ও নেতাদের আঞ্চলিক গান।

পাবে পুকুর ভরাট-করা আবাসন
উচ্ছেদের ধাতব গণিত —
গাড়ির চোরাই মাল, ডিজেল, মবিল,
রাত্রির কবিতার হিত ও অহিত।

স্মৃতিশব্দগুলি ১, ২ ...

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

কেউ কি শুনতে পাচ্ছে? এ কী বাতাস? না বাতাসিদের উঁচুনিচু
বুকভাঙা নিঃশ্বাস?
এখানে বহুদিনের কথামুখ... মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে একটু জমানো রয়েছে।
এইখানে জমানো কথার কষ, যদি কোনোভাবে
সূর্যের সংস্পর্শে আসে — সাবধান, হাওয়াগাড়ি, কলকবজাসমেত অশরীর;
কখনো কথাছবির চোখ-মুখ-চুলের অন্তঃস্রোতে একা
আগুন বোধহয়; শুধু আগুনেরই একটি তরঙ্গভঙ্গ রেখা
দাঁড়িয়ে রয়েছে এই নিঃশব্দের বাতাস-প্রতিপালিত কথামুখে।
বাতাসই তো সকলের ব্যক্তিগত ফুসফুসের দাম দিয়ে কেনা
গ্রামবালিকা।

যাকে চিঠি লেখে নিশ্চয় বৃষ্টির দেশ-থেকে
মেঘলা কেউ; লেখে, রুখাশুখা আসমান-জমিন থেকে 'ফটিকজল'
যে-শ্রুতিলিখন...
লিখতে-লিখতে, ধমনীর কালি শেষ। আর তখনই, এককলম লেখা —
আমাদের পরস্পর চোখ-তুলে তাকানো থেকে,
রৌদ্র-না-অক্ষর থেকে,
আলো থেকে — এ-শব্দজগৎ থেকে,
পাতা-ঝরা গাছ ফুল ফল ও অনেকদূর অমনি উজ্জ্বল
দূর থেকে,
এক ঝাঁক উড়োচিঠির পাখি ও প্রতিবেশিনী আসে...
এসেছে মরচে-ধরা এ-মরজগতে।

২

ও এলোচুলের ঝাঁকড়া গেছো মেয়ে, ওগো তিনরঙের ফুটফুটে পাখিটি,
এই তো দু-দিক থেকে উড়তে-উড়তে তোমরা এলে।
আমি তো গাছপাথর, ঠোঁট ঘষে-ঘষে দ্যাখো,
হাত দুটো গাছের ডাল, এই নাও, মেলে ধরলাম —
বসতে পারো, বসতে না-ও পারো — তবে, দু-দণ্ড থাকবে তো!
তা হলেই হবে। দেখো, একটু পর, গাছের ডাল ছাঁটতে আসবে কাঠুরিয়া।
গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা চিরদিনের আমি-থেকে —
এক দণ্ড হলুদ হয়ে রৌদ্র ঝরে-পড়া
পাতা, ঝরছে তো ঝরছেই সারাদিন...

একটু হলুদ, ক্রমে কীভাবে খয়েরি রঙ ধরে হয় আমার হাফ হাতা
শার্ট, আমি! — 'আমি' তা কী করে জানবে!
তা জানত, বাল্যবন্ধু আমাদের কাঠঠোকরা পাখি।
গাছের সমস্ত রসকষ শুষে, ছিবড়ে-করা অন্তরের সে-কাঠঠোকরাকে
কেন ভালোবাসি।
আজো তার আদর, অভ্যর্থনা, কামড়াকামড়ি কেন ভালোবাসলাম।
এবং কুড়ুল-কাঁধে কী নির্জন কাঠুরিয়া, যে-আমাকে নিরন্তর কাটে ...
তাকেও-বা কেন, কেন ভালোবাসি।

ভালোবাসা কি একই সঙ্গে কাঠ কাটার মধ্যলয় আর
পয়ারজাতীয় ছন্দে তানপ্রধান, ঘনিষ্ঠ, কথোপকথন নয়?
যদি তা না হয়, তবে কী?
নিশ্চয় ভালোবাসারও আছে ধারালো কুঠার —
ভা লো বা সা আছে।

কাঠুরে, বনজঙ্গল ঢুঁড়ে, তুমি কাটতে কাঠ...
কিন্তু কোনোদিন তোমাকে দেখিনি।
শুধু কাঠ কাটার শব্দ শুনে গেছি আজীবন —
শুধু দুপুর রাতের গ্রাম... গ্রামের গাছ কাটার অর্থও জানতে চাইনি কী?
হয়তো কাঠঠোকরা পাখি বনান্তরাল থেকে —
মানুষের জীবনের সমস্ত আড়াল থেকে —
কী জানি, কী কথা বলে সে!

বলেছে কি... একদিন কাঠুরে তার একমাত্র
কুড়ুলটি কীভাবে যেন
হারাল বনের সরোবরে...

বনদেবী জল থেকে উঠে, তাকে
একটি অ-বর্তমান সোনার কুঠার দিতে এলে —
কাঠুরে চাইল তার নিজের কুঠার!
অবশ্য তাকে তো আমরা কখনো দেখিনি, শুধু শব্দ শুনেছি;
শুনেছি, তাই তো ভাবি, গাছ কাটার আত্মক্ষয়ের
স্মৃতিশব্দগুলি...
ওগো কাঠঠোকরা, জেনো, এই বুকে সবই রইল অনন্তকাল।

স্কুলছুট

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

অ ছিল অনেককাল। অ ছিল অভাব, অনটন।
অ ছিল অপরাহত, অনপেক্ষ অনন্ত অর্জন।
অ ছিল অঘোর তৃষ্ণা। অনুভব। অ — অনুরণন।

আ ছিল আরম্ভ ফের। আরব্ধ কাজের সমাপন।
আ ছিল আশ্বাস, আস্থা; আসমুদ্রহিমাচল আশা।
আত্মপ্রকাশের আর্তি, আত্মামুখী একান্ত পিপাসা।

আ ছিল আক্রোশ। ছিল আক্রমণ, আগ্রাসনে ঠাসা।

স্বরবর্ণ শেষ হয় না। শেখা হয় না জীবনের ভাষা।
অ শেষ অকালে। আ — আধখানা হয়ে থেমে যায়,
পাঁচতলা আচমকা নিচু উড়ালপুলের মহিমায়।

আজ এই অপরাহ্নে হাওয়া এসে কেবলই শোনায়,
একবগ্‌গা হয়ে কেন এভাবে দাঁড়িয়ে একঠায়?
বেলা যায়। চেয়ে দ্যাখো। জেনে নাও, আ কোন্ আপস!
কীর্তনের মহিমায় খুঁজে নাও সব রসবশ।

ই শেখেনি। ইচ্ছে নেই। ফলে, নেই কোনো আপশোস।

অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। সেই তেতো ভয়ঙ্করতার
জীবন্ত প্রমাণ আজ মূর্তি তার, আর
ধুলোয় লুটিয়ে-থাকা স্কুলছুট কীর্তি-নাম-যশ।

কুকুরকে গেলাতে বসব এবার

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

চটপট ব্যাঙ্ক-নোট দলা করে গুঁজে ব্লাউজের ভাঁজে
দোর দি। গেলাতে বসব কুকুরকে এবারে।
তারপর? আবার সেই ঘুমহারা অপার সফ্‌টওয়্যার।
লোভ-টোভ নয়, লভ্য চালাচালি শুধু।
পাদপপ্রকৃতিহারা ঘাটে ঘাটে টুঁড়ে
মুম্বই তোকিয়ো প্রাহা ব্যুয়েনোস্ আইরেসে
জিহ্বা-উপড়োনো সাতবর্ণ পাথরের
টুকরো — চক্ষু খুলে আছে কারোয়াঁ-সরাইয়ের মোজেয়িকে।
ঠাণ্ডা ঘরে ঘুম আসে না, জাগরণও আসে না। দশ বাঁও
কবজির নিশানি দপ্‌দপ্ করছে শুধু মুহুর্মুহু।

তবু দ্যাখো, যন্ত্র কেন, আঁতটিও বিগড়োয় — মেরামতি
হওয়াও কঠিন — তার লোক নেই আজ।
ঘেসো মেটে দিনটা মনে পড়ে?
ভুশুণ্ডির মাঠে গিয়ে ভূতেদের সঙ্গ করতে ইচ্ছে হয়? আহা!
আহা কাঁচাখেগো দেবতারা!
হাড়-খটাখটি নৃত্য স্বতঃস্ফূর্ত নিশিরাত জুড়ে!
ঠাইটাই কেবল কোথা তল হয়ে গেল।
অগুনতি ব্যাঙ্ক-নোট! কত সামোদ ব্লাউজ! শুনতে পাই
মহাফেজখানাতে সবই তোলা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু
কুকুরটা কার কাছে রেখে যাব?

স্নেহের গৌরীকে

বিনয় মজুমদার

এ গৌরী বিশ্বাস নিজে
আমাকে বলেছিল যে
সে আমার, তার মানে
বিনয়ের মেয়ের মতন।
আমি চুপচাপ এই
কথাগুলি শুনেছি তো।

তার সঙ্গে যে ছিল
গুরুদাস মণ্ডল নামক সেই
যুবকটিও তা শুনেছিল।
আমার ঘরের মধ্যে
আমরা তিনটি শুধু প্রাণী।

গুরুদাস আর গৌরী বারাসতে থাকে।
বহুবিধ ফল ও বিস্কুট
সঙ্গে করে এনেছিল এরা দুইজন।
মোটরগাড়িতে চড়ে এসেছিল তারা
আমার শিমুলপুর গ্রামে।
গৌরীর নিজের ভাষা
লিখি —'মাঝে মাঝে'
আমাকে বিরক্ত করবার
জন্য গৌরী মাঝে মাঝে,
আসবে আমার গ্রামে।
যুবা তা বলেনি।
এর পরে এরা দুইজন
চলে গেল। আমি হাতে প্রাণ
নিয়ে বসে একা ঘরে। বসে লিখি
এইসব। জানি যে আছেন ভগবান।

দুটি কবিতা

সমীর রায়চৌধুরী

সানসুই অন্ত্যাক্ষরি ফ্রাই-ডে ফিভার

রবিবাবুর শব্দেরা দল বেঁধে গলা জুড়ে গান গাইতে ভালোবাসত
রামপ্রসাদী শব্দেরা গলা খুলে মাঠেঘাটে এনেছিল গান
সুকুমারের শব্দেরা জানত কপালে ঘুঙুর পরে নাচ দেখাতে
জীবনানন্দ খুলতে চেয়েছিলেন শব্দের ছোঁয়াচে জ্বরের গাতাঘর
সমরেন্দ্রবাবুর শব্দেরা সকাল-সন্ধে কাছেপিঠে টিউশনিতে বেরোয়

উৎপলের শব্দেরা তুলে ধরে তারতম্যের অবস্থাগতিক
মলয়বাবুর শিবানুচর শব্দেরা খোলা রামপুরি হাতে পিয়ালিকে খোঁজে
অমিতাভ মৈত্রের ভূতে-পাওয়া শব্দেরা নিয়ে যায় গা-ছমছম বিষকুঠুরিতে
ধীমানের শব্দেরা মেপে রাখে কংক্রিটের জলটান
নমিতাদির শব্দেরা বড়দি-মেজদি ঢঙে কথা তোলে
সেই সময় যশোধরার শব্দ চোটপাট মাইরি মাইরি খেলে
কাঠফাটা রোদে প্রণব পালের ডানপিটে শব্দেরা চিৎ-উপুড় চুকিতকিত সারে
বারীনবাবুর আদ্যোপান্ত শব্দ অসীম দশমিকের মেঘলা দেখায় —
কবিতাবাজারে শোনা যায় সিলভার ন্যানো সিক্স স্টেপ ফ্রেশএয়ার সিসটেম
প্রভাতবাবুর শব্দমিক যুক্তি-কৌতুকের মহড়ায় মাতে
আর নাসের হোসেনের শব্দ ঘুম থেকে উঠে আড়ম্বর ভাঙে —
পেগিলির ফিভার ইন্ডিয়ান আইডল ফিভার কিছুতেই ফুরোয় না
ঘুসঘুসে মিনমিনে ভুতুড়ে ঠকঠক-কাঁপুনি দিয়ে
সানসুই অন্ত্যাক্ষরি ফ্লাই-ডে ফিভার
শুরু থেকে শেষ... শেষ থেকে শুরু... পালাজ্বর।

গাতাঘর — গুদামঘর (মানভূম, প্রাদেশিক)।

শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম্

এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার...
ব্যবধানের জ্বর বাড়ছে, এক থেকে দুই-এর মাঝখানে জমছে
অসীম দশমিকের মেঘলা
দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার, চার থেকে পাঁচ...
সেই মেঘলায় উঠছে নিশিঝড়, দেখা দিচ্ছে বিদ্যুৎতিমির
ভিড় করছে হাঁসজারুদের ব্যাকরণ মানি না, বাড়ছে আলোশিহর
এক আর দুই-এর ফুটোস্কোপ থেকে দেখা যাচ্ছে ফোকলা ছায়া
দুই থেকে চার... উল্লম্ফনের দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম... উড়ছে জিরাফড়িং
বকচঞ্চপের দ্রিঘাংচু জলাশয়
এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন, বাড়ছে না বিয়োগফল
শূন্য থেকে অসীমের যাত্রায় ঘন ঘন ছাই দাঁড়ি
বাড়ছে কবিতার ওয়াসিলিসা, বাড়ছে যুক্তিফাটলের পাতলা ছায়া
বাসের দরজায় বাড়ছে দোমড়ানো মোচড়ানো ঝুলন্ত দোল্মা
গাজনের মেলায় চড়কপার্বণে এম টিভি-র পরদায় ভেসে উঠছে
শৈবস্বরলিপিতে দড়াবাজিকরদের গিরগিটিয়া

অজ শব্দের মহাকাশে ছাগল থেকে বিছাগল-এর অবিনির্মাণ
অজপাড়াগাঁয়ে অজগরের বাসায় আতশী-চিত্রকর
সূর্যের কাছে সংজ্ঞা রেখে যায় সূর্য-গ্রহণের ছায়াকল্পদ্রুম
বিশ্বকর্মাদুহিতা সূর্যপত্নী সংজ্ঞা ভর করে শব্দকর্মার উৎকেন্দ্রে
পীযূষপেয়ালা ছাপিয়ে মারীমুকুর পেরিয়ে
আন্তঃনাক্ষত্রিক দূর ফেলে রেখে বীজকম্প্রে জাগে
শীতোষ্ণ হিমকরকার যৌথ সরোবর।

দুটি কবিতা

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

পুষ্প প্রদর্শনী

১

আমার ধারণা ছিল বারান্দার গ্রিলে জুঁই গাছটা মরে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে অনেকগুলো ডাল শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেল। শেষে গুঁড়ির দিকে সবুজটুকুও সরিয়ে যখন খয়েরি হতে শুরু করল, আশা বলতে আর কিছুই রইল না।

কিন্তু অবাক কাণ্ড। আজ সকালে অনেক নতুন মুখ দেখি ডালে ডালে। যদিও ফুল না, আপাতত পাতা। ওহো, অধিকারবোধ কী ভয়ঙ্কর জিনিস। এত যে উৎফুল্ল লাগল, গাছটি আমার বলেই তো। অন্যের টবেও তো এ-জিনিস ঘটে। লক্ষ্য তো করি না।

২

কালীঘাটে সঞ্জয়ের বাড়ি যেতে দেড়হাত চওড়া গলি।

রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল। এখন সকাল ৮টা। গলির হ্যালোজেন আলোদুটি এখনো নেবানো হয়নি। আকাশ আবার ঝুলে পড়ছে মেঘে।

এবড়ো-খেবড়ো গলির অন্ধকারে গোষ্পদ জলের ওপর পড়ে আছে ক-টি আলোর ভুঁইচাঁপা। এরা ফুল নয় এ-কথা সত্যি না। যে-কারণে এদের একটিকেও আমি মাড়াতে পারি না।

ঈশ্বর ও জ্যোৎস্না

কালো কুচকুচে জ্যোৎস্না কি হয় না?
আমাদের নার্সিংহোমের মাসির নাম
জ্যোৎস্না। সে আবলুসগাত্রী।

সুইপার — ঈশ্বর
বয়েস কুড়ি/বাইশ।
চেহারাটি হেড়ো,
বেড-প্যান থেকে আমার বাহ্য
তার হাত কমোডে ঢালতে ঢালতে
সে মাসিকে বলে —
কতবার বলি
আমাকে একটা ভালো কাজ দেখে দাও ভাগোয়ান...
মাসি — সবই ভাগ্য বাবা।

এই লেখালেখির কাজটা
আমারও পছন্দের নয় কোনোদিনই
ভগবান আমাকেও একটা
ভালো কাজ দিলে পারতে।

লাইফ লাইন নার্সিংহোম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪

গাছগুলো কী চায়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

(সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রচিত)

শেষবেলাতে গাছগুলো কী চায়
আরো খানিক রোদ্দুর
নাকি আর্দ্র মেঘছায়

হাওয়ার সঙ্গে সারাদিনের দেখাশোনার শেষে
গাছের কথা হাওয়াতে যায় ভেসে?

গাছগুলো কী চায়
একটি দুটি তারা যখন ফুটেছে সন্ধ্যায়

মেঘ নেই তো, পাতার ওপর বৃষ্টি পড়ার সুর
জলের ফোঁটায় মানিক এখন জ্বালে না রোদ্দুর

এবার অন্ধকারেরই কোল ঘেঁষে
গাছগুলো কী চায়
গাছগুলো কি অন্ধকারেই মেশে
চুপ করে রাত পাড়ি দেয় না ভ্রমণের ইচ্ছায়?

দুটি কবিতা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূতের জন্ম

মহাশ্মশানের মাঠে সূর্য অস্ত গেছে কোনকালে —
এখন শুধুই অন্ধকার।
শেষ চিতা জ্বলে গেল। কেবল গঙ্গার জল ছলোছলো করে।
সে কাকে চিতায় তুলে দিয়ে
এখন নাহন সেরে ফিরে যাবে শ্মশানবন্ধুরা?
তুমি কি এখন গিয়ে সবগুলি বন্ধ দরোজায়
শুধু কড়া নেড়ে যাবে? বলে যাবে, শুধু ক্ষমা চাও?
যদি-বা মৃত্যুর পরে ক্ষমা তুমি শেষকালে পাও
তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে? নাকি শুধু শ্যাওড়া গাছেই
পা ঝুলিয়ে বসে থাকবে আজ থেকে আগামী ত্রিকাল?

দুই লম্বা ঠ্যাঙ ঝোলে অপ্রস্তুত বেকায়দায়। আর
ওইপাশে গঙ্গার ওপারে
ঝলমল করে আলো জ্বলে ওঠে বাবুদের বাগানবাড়িতে।
এই তো শুভ সময়। তোমার ভূতের জন্ম এইবারে সার্থকতা পাক।
— তথাস্তু! আমিন!

অন্য-এক ভূত

এখনো ব্রিজের ঠিক মুখটায়
অন্ধকারে কুয়াশায়
ওত পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই — দ্যাখো দ্যাখো
আকাকি আকাকিয়েভিচ্ খোদ!

শব্দ

ভূমেন্দ্র গুহ

শব্দগুলি মরে যাচ্ছে, হয়তো গিয়েছে, হয়ে আছে তারা সব ধুলোর শরীর
হলুদ খাতাটি আছে ভুলে-যাওয়া দেউলের মতো জীর্ণশীর্ণ দমকা বালিঝড়ে
ধ্বনি নেই, প্রতিধ্বনি দাবি করে : ওঠেও-বা : একটি নাম অক্ষরে-অক্ষরে ভেঙে যায়
বুক-ভরা শ্বাস, বুক ভরে শ্বাস নিলে, শ্বাস গেছে শ্বাসের ভিতরে
চিহ্ন হয়ে ওঠে : দিনের ভিতরে সূর্য-তারা, রাতের ভিতরে চন্দ্র-তারা
চিহ্ন সব : কাল ছিল, তার আগে; আজ আছে, তার পরে; এই মুহূর্তেও
প্রত্যূষে — সামান্য ভিজে, প্রদোষে — সামান্য শুকনো : প্রথম কবিতা, অর্থে ধুলো
বোবা মানুষের জিভে প্রথমত প্রতিধ্বনি অজ্ঞাত ভাষায় সব চিহ্নিত স্মৃতির
বালিঝড়ে চাঁদ-তারা সূর্য-তারা বিশুষ্ক মেঘের স্রোত অন্ধকার হয়ে এলে নিঃশব্দে ভেসেছে

যে কবি, সে তাড়া করে নিয়ে যায় হাওয়া ও সুনীল ধুলো পঙ্গপাল রোদ
যে কবি, সে জালে ছেঁকে তুলে নেয় জোয়ারে ভাটায় লিপ্ত পৌরাণিক জল
অর্থাৎ ঈশ্বর
কথা বলে বৃক্ষকেও, বিস্মৃত স্থবির মূক বৃক্ষকেও, যখন সে বলে
বৃক্ষটির ছায়া ঘেঁষে খুব ঘন হয়ে আসে, যে-রকম বৃক্ষে থাকি আমি
প্রস্তরের হিম পৈঠায় এসে বসে পড়ে, যে-প্রস্তরে আমার দোসর
কথা বলে, যেন মেঘ বসন্তের, প্রতিস্পর্ধী আহ্বান আমার
বৈদেশিক বিভাষাকে, যার কোনো দেহ নেই, শব্দ নেই, উচ্চারণ নেই
আকাশ যেমন নীল, তার চেয়ে কম নীল, অন্যতর জলবৎ নীল
মধ্যরাত যত কালো, তার চেয়ে বেশি কালো, নিসর্গের অনুরূপ কালো

বছর যে ছুটে যায়, তার সাথে দূরযায়ী শেয়ালের সম্মোহক ডাক
অথবা সোনার পাতে মুড়ে-রাখা শবদেহ জ্ঞানী মনীষীর

এ-সব বিকৃতি বলে মনে হয়, মনে হয় অবশেষে কবিকৃতি বলে

আমার যে জিভ নেই, জন্মাবধি জিভ নেই, আমি এই নবজাত রাত্রিতে আহত
হয়ে আছি; পাখিদের কণ্ঠস্বর শব্দের বাহুল্য থেকে শোধিত হয়েছে
সারা-রাত্রি ডাক শুনি বেশি-কালো রাত্রির : তার সব নিহত পাখিকে ডাকছে সে

তা হলেও ভোর হয়, তা হলেও ভোররাত্রে স্খলিত ভ্রূণের নারী স্বপ্নে চলে আসে
তাড়াতাড়ি করে আলো এসে পড়ে, অপার্থিব আলো; তাড়াতাড়ি করে চলে যায়

স্বেচ্ছাচারী ঘুম ছিল; অতঃপর তীব্র আলো; ছোটো-ছোটো ফুলগুলি বিমর্ষ মলিন
আমাদের কোঁচকানো বিছানার চাদরে কিংবা কাছে-দূরে প্রকাশ্য প্রান্তরে
আমাদের শ্মশানের অশ্রুহীন শূন্যতার চিতার উপরে

চোখের তারায় চাষ হয়ে গেছে, বৃষ্টি হলে খুব ভালো হত
হাত যে-শস্যের খেত এখন নিড়োচ্ছে, তা-ও হাওয়া, তা-ও অগর্ভিনী হাওয়া হয়ে আছে

মেয়ে বড়ো হয়ে গেছে

নবনীতা দেব সেন

মেয়ে বড়ো হয়ে গেছে
রাস্তায় ডুগডুগি বাজলে
দুধের গেলাস ঠেলে
আলুথালু দৌড়ে যায় না
বারান্দায় আর।

মেয়ে বড়ো হয়ে গেছে
আরো বড়ো
কার ফোন? প্রশ্ন করলে
'পিংকির' না-বলে, বলে
'সুবীরের ফোন।'

বড়ো হয়ে গেছে মেয়ে —
'ওদিকে যেয়ো না,' বললে

একটু থামে,
তারপর ওদিকেই যায়।

মেয়ে বড়ো হয়ে গেছে,
আইসক্রিমওয়ালা হেঁকে চলে যায়
তবু সে অনুদ্বিগ্ন
টেবিলে আপনমনে লিখে চলে
চিঠি? না কবিতা?

বড়ো হয়ে যাওয়া মেয়ে
হঠাৎ এমন করে
বিছনায় উপুড় হয়ে
শব্দহীন কেঁপে ওঠে যদি,

মা তবে কী করবে? মা তো
আরো বড়ো হয়ে গেছে —
মা ঠিক আগেরই মতো
দু-হাতে জড়িয়ে ধরবে? মা ঠিক
আগেরই মতো বলবে কি —
— 'কোথায় লেগেছে, মা গো?
এই তো আমি —
এই তো আমি আছি!'

অপ্রকাশিত চিঠি

১৯৪০ সালে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় *আধুনিক বাংলা কবিতা* নামে একটি কাব্যসংকলন প্রকাশিত হয়, প্রকাশনা সংস্থা এম.সি.সরকার থেকে। এই সংকলন যখন প্রকাশের প্রস্তুতি চলছিল এই চিঠি চারটি ঠিক সেই সময়েই বুদ্ধদেব বসুকে লেখা হয়েছিল।

এই সংকলনের প্রস্তুতিপর্বে প্রুফ দেখা থেকে শুরু করে অধিকাংশ নির্বাহী কর্ম যে বিষ্ণু দে-ই করেছিলেন, এখানে প্রকাশিত পত্র-চতুষ্টয় পাঠে তা জানা যায়। জানা যায়, বিষ্ণু দে-র কবিতার জন্য প্রায় সতেরো-আঠারো পৃষ্ঠা বরাদ্দ হয়েছিল, যা, সতীর্থ সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের প্রকাশিতব্য কবিতাসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি। পরে বিষ্ণু দে-র অনুরোধে প্রকাশক সুধীরচন্দ্র সরকার তাঁর কিছু কবিতা কমিয়ে, বুদ্ধদেব বসু ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র কবিতাসংখ্যা বাড়িয়ে, প্রকাশিতব্য কাব্য সংকলনে সতীর্থ সমসাময়িক কবিদের কবিতাসংখ্যায় এক ধরনের সমতা আনেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় এটি মহানুভবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাস্তব ঘটনা হয়তো এই, কাব্যসংকলনটির প্রকাশকালে পাঠকমহলে বিষ্ণু দে-র পরিচিতিই ছিল সর্বাধিক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সংকলনটি বুদ্ধদেব বসুর মনঃপুত না হওয়ায়, একই নামে, একই প্রকাশনা সংস্থা থেকে, প্রায় চোদ্দো বছর বাদে, ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে তিনি স্ব-নির্বাচনে একটি কাব্য সংকলন প্রকাশ করেন।

চারটি চিঠিই পাওয়া গেছে কবিকন্যা উত্তরা বসুর সৌজন্যে।

১ম চিঠি

কা: প: - রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত *বাংলা কাব্যপরিচয়* নামে কবিতা সংকলন যা পাঠকদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় তড়িঘড়ি বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়।
কামাক্ষী - কবি কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় / আইয়ুব - বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক আবু সয়ীদ আইয়ুব / মীনাক্ষী - বুদ্ধদেব বসুর বড়ো মেয়ে।

২য় চিঠি

সুধীন - কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত / নীরেনবাবু - *পরিচয়*-এর সঙ্গে যুক্ত সমালোচক ও প্রাবন্ধিক নীরেন্দ্রনাথ রায় / অমৃতবাবু - সম্ভবত *পরিচয়* পত্রিকার নির্বাহী কর্মী / চঞ্চল - কবি চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় / বিষ্ণু দে সম্পাদিত *সাহিত্যপত্র*-এর সম্পাদনা সহযোগী / জ্যোতিরিন্দ্র - কবি ও সঙ্গীতশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র / হীরেনবাবু - বিশিষ্ট রচনাকার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় / প্রশান্তবাবু - সম্ভবত রবীন্দ্রানুরাগী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ।

৩য় চিঠি

'পূর্বরাগ', 'দময়ন্তী' ও 'ম্যালে' - বুদ্ধদেব বসু রচিত তিনটি বিখ্যাত কবিতা / সুধীরবাবু - এম.সি.সরকার প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার সুধীরচন্দ্র সরকার / সমর - কবি সমর সেন।

৪র্থ চিঠি

যামিনীবাবু - শিল্পী যামিনী রায় / যতীন সেন - প্রখ্যাত বিজ্ঞাপন-চিত্রী ও অলঙ্করণ শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন / পুরাণা পল্টন (পুরোনো পল্টন) - বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকায় (তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায়) যে অঞ্চলে বুদ্ধদেব বসুর বাল্য ও কৈশোর কেটেছে / *প্রগতি* - ঢাকা থেকে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত সাহিত্যপত্র। প্রথম কয়েকটি সংখ্যা হাতে-লেখা পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত।

সংযোজন : প্রথম ও দ্বিতীয় চিঠির ওপরে ডানদিকে লেখা পি২৪১ডি রা:বি: এভিনিউ হল পি২৪১ডি রাসবিহারী এভিনিউ যেখানে বিষ্ণু দে ভাড়া থাকতেন। তৃতীয় ও চতুর্থ চিঠির উপরে ডানদিকে লিখিত ১/১০ প্রি.গো.ম. রোড হল ১/১০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড। রাস্তাটি বর্তমান কালীঘাট পার্কের পূর্বদিকে অবস্থিত। আগের বাড়ি ছেড়ে বিষ্ণু দে এই বাড়িতে এসে ওঠেন। এটিও ভাড়াবাড়ি।

চিঠি দুটির প্রতিলিপি যে-অবস্থায় ছাপা হল, পাঠক তা সহজেই পড়তে পারবেন বলে আমরা আলাদা করে আর অক্ষরে সাজিয়ে দিইনি।

সম্পাদক

প্রথম চিঠি

পি২৪১ডি রা: বি: এভিনিউ
কলকাতা
৩/১০

শ্রীমতী মীনাক্ষীর খবর কি?
বিষ্ণু দে

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠি পেয়ে বেজায় খুসি হলুম। উদ্বেগে অর্থাভাব ও নিদ্রাহীনতায় স্নায়ুবিকারে ভুগছি। বলিষ্ঠ নিঃসঙ্গতাই চিকিৎসা কিন্তু বর্তমানে তা দুর্লভ, তাই সমালোচকোচিত পলাতক মনোবৃত্তি আমায় পেয়েছে, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বনসঙ্গ ও দার্জিলিং বা ঘাটশিলা বা বিদেশপক্ষে দেওঘর দুমকা বিষয়ক মনোলৌল্য ও দিবাস্বপ্নে কালযাপন করছি। এ ক্ষেত্রে আপনার চিঠি এল বিশেষ সুস্বাদু।

আপনার লেখার আমি ভক্ত হলেও বাংলা কা: প: সমালোচনাটি আমার মনে হয় আপনার একটি উৎকৃষ্ট লেখা। এবং যেহেতু লেখাটি শালীনতার বিনীত অর্থাৎ বিস্তৃত আর স্পষ্ট, তাই সম্ভোষের কারণ দেখি না এবং আশা করি রবীন্দ্রনাথও ভুল বুঝবেন না। পরিচয়-তে অনাদি ও বিষয়ে কিছু বেরোবে না। তাই বনপথে কষ্টের বলেও আপনার সমালোচনা প্রয়োজন ছিল। আপনার কাছে অনেক নতুন খবরও পেলুম। আপনার কবিতাটি ভালো লাগল। চতুরঙ্গ কবে বেরোবে? বেরোবে তো? বন্ধু হলে পড়তাই। কামাক্ষীর খবর কি, এখনও ওখানে আইবুড় যাচ্ছেন?

আপনারা আমার যাকে বলে শুভেচ্ছা জানবেন।

দ্বিতীয় চিঠি

৫৫/৪১ বিডন স্ট্রিট
১৪/১০

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠি পেয়ে আশ্চর্য লাগছে : ঈর্ষা যে এরকম নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে সে কি অবীরেরই মন্ত্র? এখানে পারা গরম, অর্থনৈতিক অনাচার, শারীরিক খুঁতখুঁতুনি, মানসিক ক্লান্তি) সান্ত্বনা শুধু জীবনে-মৃত্যু, মৃত্যুতে-জীবন। কাল অবশ্য একটু বৈচিত্র্য গেল, সুধীনবাবু এসেছিলেন ১৩০০ মাইল মোটরভ্রমণ সাঙ্গ করে। তারপরে হীরেনবাবু – মুক্তকণ্ঠে স্বেচ্ছায় আপনার সমালোচনার প্রশংসা করলেন।

"চতুরঙ্গ" বেরিয়েছে, গত সোমবার বাস থেকে স্টলে দেখেছি দেখলুম মাষ্টারির কল্যাণে যথাসময় নেমে দেখা হল না। পরিচয়-এর অমৃতবাবু ও আমার ভাই তিনজনেও দেখেছেন, তাঁদের পছন্দসই। সুধীনবাবু বা আমি কাগজ পাই নি এখনও। আপনারা নাকি আবার প্রচার করছেন অর্থমূল্য দেবেন? ঐ অমৃতবাবু আপনার ফেরার জন্যে ব্যস্ত – আপনাকে নাকি একটা উপন্যাস দিতে হবে। দেবেন তো?

ছুটি কলকাতাতেই। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু নিরুদ্দেশ – বোধহয় পাবনায়। আইয়ুব কি দার্জিলিং। সমরের চিঠি পেয়েছি জামতাড়া থেকে – যৌবনের বিলাসী আলস্যে সুখী ও সুস্থ। হীরেনবাবুও দুর্ভাবনায় বাঁচিতে ‡ সেখানে সুধীনবাবুর খবর বোধ ৩০০ গ্যালন বেশি পেট্রোল কিনতে হচ্ছে। আর সু:বাবুর সঙ্গে গিরিডিতে আমাদের প্রশান্তবাবুর গোলযোগ হয়েছিল। কোনো এক কবিতার বইয়ের ভূমিকায় সুধীনবাবুর মতামত বিষয়ে প্রশান্তবাবু একমত নন বলে প্রশান্তবাবু সুধীনবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে চান। সুধীনবাবু একমত না হওয়ার স্বাভাবিকতা, এমন কি দার্শনিকভাবে প্রয়োজনীয়তার কথা বল্লেন। কিন্তু হায়! তাই ভাতামোটে সেবা দরকার বলে, খাবার তৈরি বলেও শেষটা নাকি ওঁকে দুঘন্টা ঐ বিষয় আলোচনা করতে হয়। শেষে ঠিক হয় কলকাতায় ফিরে এসে প্র:বাবু আবার সু:বাবুকে আক্রমণ করবেন।

কবে ফিরছেন? কবির প্রতিক্রিয়া কি জানতে উৎসুক আছি। এমনি পরচর্চার মন।

বিষ্ণু

তৃতীয় চিঠি

৭/১০ প্রি: গো: ম: রোড
কালিঘাট
১৫/৬/৪০

প্রিয়বরেষু

যথাসময়ে আপনার চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নি জানি, কিন্তু স্বেচ্ছায় নয় জানবেন। কাল এম.সি.র দোকানে গেলুম — ১১টায় দোকান খোলে নি। ঘোরাঘুরি করলুম অনেকক্ষণ, হীরেন ও আইয়ুব আপনার চিঠি পেয়েছেন, পূর্বকথা তাঁদের পাঠুন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমার দময়ন্তী ও মৃণাল-ও পছন্দ, কিন্তু আমি তো সম্পাদক নই। শুনলুম আইয়ুব সুধীনবাবুর কাছে গিয়েছিলেন, সুধীনবাবু না করে দিয়েছেন। আজ আবার আমি গিয়েছিলুম আইয়ুব, হীরেনবাবু ও সুধীনবাবুর কাছে যথাক্রমে। আমার কবিতার সংখ্যা ১৭/১৮ হচ্ছে গতসপ্তাহেই বলেছিলুম, সুধীনবাবুর কম, আপনার কম, সে অনুপাতে সমরের বেশিই — ২২৫/২৩ লাইন বোধহয়। তখন কেউ কর্ণপাত করেন নি। আপনাকেও আমার আধিক্যের সম্ভাবনার কথা বলেছিলুম। আজ শুনলুম প্রেসের অসুবিধার কারণে ও সুধীনবাবুর আপত্তিতে আর সব যা আছে থাকবে শুধু আমার দুটো কবিতা বাদ যাবে। অবশ্য প্রেসের অসুবিধা কিন্তু সে দুটো কবিতা বিষয়ে আমি সঙ্কুচিত, তাই আমি রাজি বাদ দিতে। আমার প্রস্তাব হীরেনকে জানালুম; সুধীন ও বুদ্ধদেববাবুর পৃষ্ঠাবৃদ্ধি ও আমার হ্রাস করা যাক। গেলুম সুধীনবাবুর কাছে, বোঝাতেই ভদ্রলোক রাজি — বল্লুম ভালোকরে directions দিয়ে দেবেন। আজ আবার সব প্রুফ পেয়েছি, দেখে কাল হীরেনবাবুকে দিয়ে আসব ও বলে দেব মীমাংসাটা। কি বলুন? কথা ছিল আপনাকে লিখতে বলা হবে সুধীনবাবুর কাছে আপনার পৃষ্ঠা বিষয়ে — that's between you and him. তার দরকার নেই আর। আর সেটা দেখায় না ভালো যাই হোক, এই ব্যাপার। সহজে নেবেন ও দয়া করে ভুল বুঝবেন না। কাউকেই না।

বেয়ারিং বিষয়ে লজ্জিত। খেয়াল থাকা উচিত ছিল। কেমন আছেন সব?

এখানে গরম ও humidity বেড়েছে। চিঠি লিখবেন শীগ্‌গীরই।

কালকের পরে আমি anthology business-এতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিচ্ছি।

— বিষ্ণু

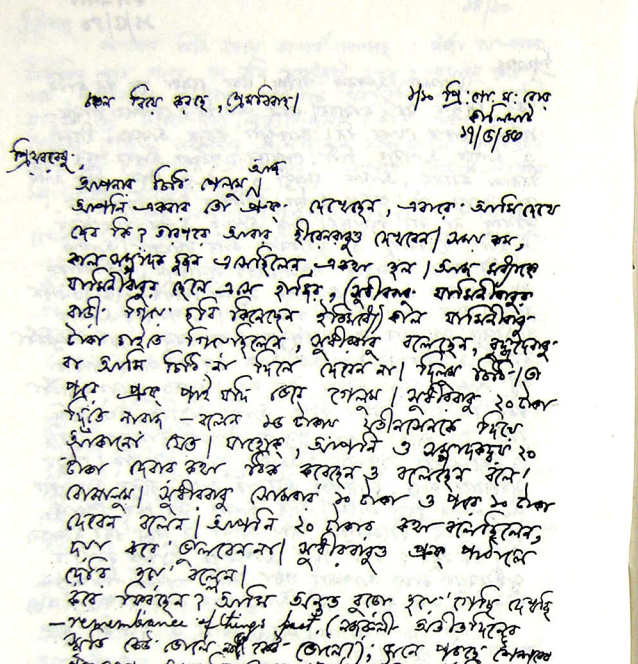

চতুর্থ চিঠি

ছেলে বিয়ে করছে, প্রেমবিবাহ।

১/১০ প্রি: গো: ম: রোড
কলিকাতা
১৭/৬/৫০

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি আজ পেলুম।

আপনি একবার তো প্রুফ দেখেছেন, এবারে আমি দেখে দেব কি? তারপরে আবার হীরেনবাবুও দেখবেন। অমন কম, কাল অনুবাদক দুবার এসেছিলেন একথা হল। আর সত্যি যামিনীবাবুর ছেলে এসে হাজির, (সুধীবাবু যামিনীবাবুর বাড়ী গিয়ে ছবি কিনেছেন ইতিমধ্যে) কাল যামিনীবাবু টাকা নিতে পাঠিয়েছিলেন, সুধীবাবু বলেছেন, বুদ্ধদেববাবু বা আমি চিঠি না দিলে দেবেন না। দিলুম চিঠি। তা পরে প্রুফ পাই যদি জেনে গেলুম। সুধীবাবু ২০ টাকা দিতে নারাজ — বলেন ১৫ টাকায় যতীনবাবুকে দিয়ে আঁকানো যেত। যাহোক, আপনি ও বুদ্ধদেববাবু ২০ টাকা দেবার কথা ঠিক করেছেন ও বলেছেন বলে বোঝালুম। সুধীবাবু এখনকার ১০ টাকা ও পরে ১০ টাকা দেবেন বললেন। আপনি ২০ টাকার কথা বলেছিলেন, দয়া করে ভুলবেন না। সুধীবাবুও প্রুফ পাঠালে দেরি হবে বল্লেন।

কবে ফিরছেন? আমি অদ্ভুত বুড়ো হয়ে গেছি দেখছি — remembrance of things past. ([illegible] অতীতদিনের স্মৃতি কেউ ভোলে না [illegible] ভোলে); মনে পড়ছে [illegible] [illegible], আপনি এখন পুনর্মিলনের প্রস্তাবি [illegible], সে চিঠি ফিরানো আছে, সেই

অমরবাবু একদিন এসেছিলেন, কলকাতায় থাকা নিয়ে আলোচনা করলুম।

আপনারা আমাদের অনুরাগ জানবেন। বিষ্ণু —

কবিতাগুচ্ছ

দুটি কবিতা

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

সঙ্গ

সামনে বিভিন্ন খাদ — রাতারাতি পালটানো পোশাক,
বেশি বন্ধু ভালো নয় দু-একজন বন্ধু হয়ে থাক,
কাঁচাকুল খেতে খেতে ধারাপাতে উজান জাগাবে,
নানার্থক শব্দ জুড়ে মহাগ্রন্থে স্পষ্ট হয়ে যাবে,

খাপে তলোয়ার শুয়ে — ভিতরে বাতাস নেই — চাপ,
টুকরো প্রতিপদ থেকে উঠে আসে দ্বিতীয়ার খণ্ডিত আলাপ,
দু-একটি কণ্ঠস্বর নৈঃশব্দ্যের নীলাভ খোরাকে
প্রবালদ্বীপের সঙ্গে লবণের যেমন বন্ধুত্ব হয়ে থাকে,

অভ্যাস কঠিন করে সাজিয়ে আবার উলটে দেখা
ধুতুরাফলের রসে ঝাপসা হয় সমস্ত অগ্রিম রণরেখা,
জিভের ডগার কাছে আপ্তজন ধ্বনি পাবে ঠোঁটে
বেশি বন্ধু ভালো নয়, রীতিমতো শান দিয়ে দু-চারজন বন্ধু হয়ে ওঠে...

২১.০২.২০০৫

ছুটির শেষ বিকেল

এখানে সূর্য এখানে রাত্রি নেই
এখানে জলের উতরোল আলাপন
এখানে কাছিম দল বেঁধে বেয়ে ওঠে
রেণু খুঁড়ে খুঁড়ে ডিম রাখে সমাদরে
এখানে সূর্য এখানে ঝিনুক জ্বলে
দূর-দূরান্ত কুড়িয়ে এনেছে হাওয়া
এখানে সন্ধ্যা নামছে অনেক পরে
হলিডে হোমের রাত্রি ভীষণ একা...

১৫.০৩.২০০৫

তিনটি কবিতা

কবিরুল ইসলাম

এক টুকরো আলাপন

ইউ.বি.আই. চেকের পিছনে:
অক্ষরে-অক্ষরে লেখা তৈরি হয়
যেন-বা পিঁপড়েরা সারবন্দি হাঁটে
দিন আর রাত্রির টৌকাঠে
ডান কিংবা বাম কিছু নয়
অক্ষরে-অক্ষরে অগ্রসর
সুদূরের দিগন্ত-অঙ্গনে
প্রকৃতি-পুরুষে আনাগোনা
মনে পড়ে, কাকে মনে পড়ে
দেখা হবে বনে-বনান্তরে
না, না, তুমি একাকী যাবে না
একসঙ্গে যেতে হবে জলে
স্বাভাবিক ছন্দের বন্ধনে
শিশু যায় স্তনে-স্তনান্তরে
স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে লেখা
মৃতের বা জীবিতের রেখা
পার হয়ে অনন্ত জীবন
পদচিহ্ন কেউ দেখবে না...
এইভাবে ক্রমশ রচনা
শুভযাত্রা শুরু করে দেখা
কে কদ্দূর যেতে পারে, এসো
হাত ধরো যাত্রা সপ্তপদী

এই আমাদের ছোটো নদী।

ভোর কিংবা ভরদুপুরে

অদ্ভুত মেজাজ এক মাঝ-মধ্যে ঘাড়ে চড়ে বসে
তোমার কী সাধ্য তুমি তার সঙ্গে সমান্তরে চলো
এই আমি ক্লাসে, এই যাচ্ছি কালীতলার দিকে
প্রাতরাশ ভাগ করে খাওয়া হল পরম সন্তোষে

পরের ক্লাসের যৎসামান্য প্রস্তুতি আধঘণ্টা নির্ণয়
তা-ও তুমি সহ্য করো মুখটি বুজে প্রাপ্তির শূন্যতা
হেলাফেলা করতে চাও দিব্যি নয়ে-ছয়ে মেশামেশি:

'আবার একদিন এসো, জানি না ছিঁড়বে কি না শিকে'

'ঠিক আছে, আবার আসছি...আপনি থাকছেন তো?'

আছি, এসো: হাতে নিয়ে এসো একটু বাড়তি সময়:
টেপ-রেকর্ডার তো নয়ই, ক্যামেরাও নয়, শুধু কথা —
কিংবা স্বর্ণ-নীরবতা যে-ব্যঞ্জনা কবিতায় বলো
ডানাওয়ালা শব্দমালা ঠাণ্ডা কালো অক্ষরেরও বেশি

যেমন ভোর বা ভরদুপুরে একদিন স্বর্গ হাতে ছিল।

একটি দুটি লেখা...

এখানে আমার একা একা একলা রাত্রি-দিবা
খবরের কাগজ, বই, চিঠির উত্তর
একটি দুটি লেখা...
এ-সবই তোমার কাছে বহুমূল্যে শেখা

এক জীবনের এই একটি প্রচ্ছন্ন সরলরেখা।

বিনা বিজ্ঞাপনে

বাসুদেব দেব

বিশ্বাসে অ্যালার্জি হয় ভালোবাসায় কষ্ট
শজারু জগতের কাছে ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে ঋণ
অরুন্ধতী, এ-শরীর খড়ের, কতকাল ধরে
মানুষ এ-সব জেনেছে ছেনেছে
চুলের মধ্যে গ্রাম্য জোনাকি ত্বকের ভাঁজে পিচ্ছিল নুন
উঁচু বাড়ির জানালা থেকে মানুষ লুকিয়ে চুরিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে
ফুরিয়ে যাওয়া টুথপেস্ট খালি মোড়ক তুলো ব্যান্ডেজ
নষ্ট ভোগের উচ্ছিষ্টে ভরে যাচ্ছে প্রত্যাশা আর শিল্প

প্রতিবন্ধী পুতুল বাতিল মোজা পলিথিন আর ধাতুর টুকরো
এইসব ফসলে কেমন সমৃদ্ধ হচ্ছে আগাছার জঙ্গল
আর আমার সংসার, অরুন্ধতী, কতবার বদলালো
কত রকমের তোমার টেলিফোন নম্বর

ভাঙা বাল্‌বের দুঃখী চোখ গতিহারা ঘুঙুরের নীরব অভিযোগ
চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে আজ বনতুলসীর ঝোপে
কী নধর অই দুঃখ বিষাদ স্মৃতি-লতা
এইসব অর্থহীন অসম্পূর্ণতা মরিচে সয়া সসে মাখিয়ে
চামচে করে একটু একটু করে চেখে দেখো
এ-শরীর খড়ের আগুনের হাড়গোড় মলমূত্র বীজাণুর
খিদে তেষ্টা কামের কামড় এ-সব দু-ঘণ্টার ছায়াছবি
প্রতিদিন এই উনুন আর মশারির পূজা, বাজে সিরিয়াল

এসো অরুন্ধতী, বিশ্বাস-ভালোবাসা-ভদ্রতা-কাপড়চোপড় সরিয়ে
শুরু হোক আমাদের জানাশোনা শ্রেষ্ঠ ব্যভিচার
সন্তানহীন বর্তমানের বাজার

মরে—তাও এলেবেলে মরে

রত্নেশ্বর হাজরা

কী করে বাঁচতে হয় ওরা তা জানে না
কী করে মরতে হয় জানে না সেটাও
ওদের বুকে তো বহু ক্ষত আছে — তবু
যন্ত্রণা বোঝে না ওরা — বোঝে না কোথায় উৎস তাও।

একদিকে অনেক কিছু — অন্যদিকে
নোংরা পচা এঁদোগলি কানা
মরতে জানে না ঠিকঠাক। বাঁচাটাও কোনোমতে বাঁচা —
আসলে বাঁচার রাস্তা এবং মরার রাস্তাটাও
ওদের অজানা।

বাইরে অনেক ক্ষতমুখ। ভিতরেও বহু চুল্লি আছে
অথচ জানে না কেন রক্তপাত — কেনই বা দেহ

জ্বলে পুড়ে যায়
জানে না কোথায় উৎস — কোথায় মোহনা —
বাঁচে — ওই বাঁচতে হয় — তাই
মরে — তাও এলেবেলে মরে
না বোঝে আরোগ্য আর না বোঝে যন্ত্রণা।

মারাঠি বলছে সে দূর দেশে

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

এত গম্ভীর বইপত্তর, থই পাচ্ছি না চোখ ধরে যায় —
এমনই সময়ে কচিকণ্ঠের সুরেলা আওয়াজ অচেনা ভাষায়
— 'তুলা কা পাইজে' — তোমার কী চাই, কী চাই তোমার?

ভুল হয়ে যায় মাথার লজিক। সত্যিই তো, আমার কী চাই
কোন শব্দের কী কী রঙছটা, কোন সমাধান
ছেঁকে তুলতেও বাকি থেকে যায়
ভেসে আসে এক চেনা ও অচেনা গলায় — তুলা কা, তুলা কা ছন্দ
ভাষার ভেতরে শাঁসভরা জল, বুকের গভীরে টলটল করে
কচি গলা নাচে ইথার স্পন্দে —
তোমার কী চাই, কী চাই মাম্মা?

ছোট্ট মানুষ একশো লোকের ভাবনার স্তরে ঢুকে গেল তবে?
এখন কী করে উত্তর দিই, কোন কম্পাসে —
তার তিনদিকে সমুদ্রজল পাহারায় ভাসে
ধরতে পারি না ছোটো মুঠো হাত; সারা দিনরাত গুনগুন করি —
তোমাকেই চাই, উড়ে এসো তুমি পড়ার ভেতরে, রাত ঘন হলে
অক্ষরঘেরা দু-হাত বাড়াই — তোমাকেই চাই,
চাই তোমাকেই এ-মুহূর্তেই, এই পাতা হাত — শুনলে ছন্দে?

তিনটি কবিতা

শান্তি সিংহ

পাতাদের কথা

চালতাপাতা মুখ ভারী করে শিশুপাতাকে বলল :
'বড্ড হালকা মেয়ে, সারাক্ষণই হিহি হিহি
ঝিরিঝিরি বাতাসে এত মাতামাতির কী আছে।'

গা-দুলিয়ে শিশুপাতা ফিক করে হেসে ফেলল
খুদে-খুদে চোখ আকাশে তুলে বলল :
'জানো ভাই, রবারপাতা কিন্তু দারুণ রাশভারী
মোজাইক-করা তার মেজাজ
একটুও নড়াচড়া নেই'

মোলায়েম সুরে তীক্ষ্ণতা এনে চালতাপাতা বলল : 'তাতে কী?
রবারপাতায় কি শিশিরের মঞ্জির বাজে?
শোনা যায় শরৎ রোদ্দুরের বাঁশি?
ঝরো ঝরো শ্রাবণে ওই ভুতুম-ভুতুম পাতার চেয়ে
যাই বলো না কেন বন-চাঁড়ালের মাধুরী মন টানে
আর গরমে আইঢাই দুপুর পেরিয়ে যখন সন্ধে নামে
গাঙ্গেয় বাতাসে উড়তে চায় ভিক্টোরিয়ার পরী
নন্দন-রবীন্দ্রসদনের ফোয়ারার ধারে রঙিন মুখের মেলা
তখন চামর-দোলানো-ঝাউ বিবিজানের গরিমায় দাঁড়িয়ে থাকে
তার চোখের পাতার বর্ণালি মায়ায় ঝিরিঝিরি স্বপ্ন নাচে
এসবের ধারে-কাছে আসে না তোমার ওই পোড়ারমুখী পাতা
ওকে পাতা না-বলে সত্যি সত্যি ব্যাঙের ছাতা বলাই ভালো।'

কোনো কথারই জবাব দিল না রবারপাতা
রবীন্দ্রসদনে কবি যেমন তাঁর ইংরেজি-অনুবাদ বিতর্কে নিশ্চুপ একাকী।

ভালোবাসার বৃত্ত

জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবী যতই বড়ো হয়, ভালোবাসার বৃত্ত ততই ছোটো হয়ে আসে
ফোনে বা ই-মেলে লন্ডন-পারী-নিউইয়র্ক-মেলবোর্ন হাতের মুঠোয়
অথচ হাজার কাজের ছুতোয় ভুলে যাই বাপ পিতাম-র ভিটে

আকাশছোঁয়া দেশলাই বাক্সে মানুষ-পোকা পাশাপাশি কারো খোঁজ রাখে না
অথচ উইক-এন্ডে ক্লাবে বা কাছে-দূরের আড্ডায় ছুটে যায় — দারুণ সামাজিক
ডিশ-অ্যান্টেনায় প্রিয় পানীয়-য় জাগে যৌবন, তাকে চাগায় চাকুমচুকুম অনুপান
কিন্তু মোচার ঘন্ট, হিঞ্চের বড়া, মৌরলার ঝাল আর পায়েসের টানে
বাংলা নববর্ষে ছোটো পরিবার, সুখী পরিবার ছোটে মনপসন্দ্ হোটেলে

অবিকল্প

একটানা কাজের শেষে
গুনগুনিয়ে ওঠে
ভাষা, না ধর্ম?

প্রেমের জোয়ারে
কে বেশি সহায়
ভাষা, না ধর্ম?

খিদের জ্বালায়
কোনটি জোরালো
ভাষা, না ধর্ম?

অসহ্য বেদনায়
কে বেশি সরব
ভাষা, না ধর্ম?

নবজাতকের মুখে
প্রথম ফোটে
ভাষা, না ধর্ম?

জীবন ফুরানোর আগে
মুখে ফোটে
ভাষা, না ধর্ম?

লাথি

তুষার রায়

ভালোমানুষ নই আমি
সারাদিন জলের ওপর ভাসি
বুকের দুঃখ জামার বোতামে ঢাকি
বাইরে সবাই তারিফ করে আমায় —
দুঃখগুলো রঙিন করে সাজাই
কবিতার গড়া গর্তগুলো হাসে

কেউ বোঝে না আমাকে সঠিক
কান্নার নুনে সামাজিক লেবু মেশাই
সকলে এখন ভালোমানুষ খুব
আমি কেবল ভালোমানুষ নই
আমাকে আমি ঠকাই সারাটা দিন
নিজের পোঁদেই রাত্রে মারি লাথি

সংযোজন : রচনাকাল ২৬ জুন, ১৯৭৩। কবিতাটি পাওয়া গেছে কবি অজয় নাগের সৌজন্যে।

দুটি কবিতা

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

যদি বলি

যদি বলি — আমাদের হারাবার কিছু নেই, তবে
ভুল হবে, বড়ো ভুল হবে।

যা কিছু অর্জন তা তো ব্যক্তিগত নয়; মানুষের
শ্রমের নির্মাণ; অসংখ্যের
স্বপ্নের সফল উপহার।

জন্মকাল থেকে আমি বহন করছি তার-ই
উত্তরাধিকার,
কোনো প্রশ্ন না রেখেই, প্রত্যাশায় না বেঁধেই বুক
সন্তানেরে দিয়ে যায় অফুরান ভাঁড়ারের চাবি

এই ভেবে —
মরণের আগ্রাসন থেকে
কিছুটা ছিনিয়ে নিয়ে রেখে যেতে পারি
যদি, তা-ই সন্তানের মুখে
তুলে দেবে ভাত।

ওটুকুও কেড়ে নিতে দেশে কালে বেঁধেছে সঙ্ঘাত,
মৃত্যুকে এনেছে ডেকে অসময়ে, তার
প্রয়োজন ছিল না, তবুও।

পাথর খনন করে তারাই বানিয়ে পাতকুয়ো
দায় নিয়েছিল প্রতিবেশীদের তৃষ্ণা মেটাবার।

আমরা পেয়েছি সেই মেধা, শ্রম, স্বপ্ন, সাফল্যের
উত্তরাধিকার।
মরুভূমিতেও ঢেলে দিয়েছে সংকল্প, শ্রম; পূর্বপুরুষেরা
শ্রমজীবী।

আমরা পেয়েছি সেই শ্রমের নির্মাণ, এক
অভাবিত সুন্দর পৃথিবী।

এই সবই আমাদের, আমাদেরই। যদি তা হারিয়ে বাঁচি, তবে —
ভুল হবে, বড়ো ভুল হবে।

ভেবে এসেছি

ভেবে এসেছি তোমার কথা আমি বলব, আমি লেখক
আমি সর্বজ্ঞ। আমি
উন্মোচন করব তোমার আত্মার হাহাকার, আর
ব্যাখ্যা করব তোমার স্বপ্নের, তোমার ব্যর্থতার
অলিখিত দিনলিপি;
ভেবে এসেছি নেব তোমার ক্লান্তির স্বেদরক্তের স্বাদ,
তোমার অপূর্ণতার বিষাদ, আর
পূর্ণতার দিকে যাত্রার উদ্‌বিগ্ন দিনগুলোর দিনপঞ্জি;
কাঁধে হাত রেখে হাঁটব বিরামহীন।

এসব ভাবনা শেকড় ছড়িয়ে বহুদূর... বহুকাল!
ডালপালা ছড়িয়ে আত্মবিশ্বাসে মাথা নাড়ছে,

অসংকোচে মাথা নাড়ছে, নাড়ছিল।

ঝড়-ঝাপটায় ডানা ভাঙল ইতিমধ্যে,
মুখ থুবড়ে পড়লাম মাটিতে;
খাদ টপকাতে লাফ দিলাম —
ভাঙল পা,
আর মগডালের ফল পাড়তে গিয়ে ডাল ভেঙে বুনো ঝোপে।
আমার জন্মান্তর হল।

এইভাবেই আমার স্পর্ধা হারাল বিশ্বাস,
স্বপ্ন ছিঁড়ল শেকড়ের টান,
এক অন্তহীন হাঁ মেলল গিরিখাদ। আমি
শূন্যে ঝুলছি।
হাতের মুঠোয় বুনো লতার হাড়গোড়।

যে চিনতেই পারল না নিজের দৌড়ঝাঁপের সামর্থ্য
সে হতে পারে না তোমার আত্মার খনক, হতে পারে না সর্বজ্ঞ।

আমি শুধু নিজের কথাই বলতে পারি, শুধু নিজের।

তিনটি কবিতা

বিনোদ বেরা

মহাজন

মহাজন, বুদ্ধিযুক্ত শ্রম ব্যবস্থায়
ধূসর সবুজ হয়, সোনা হয়,
কালক্রমে সেই সোনা পাংশু হয়ে যায়
কিছু নয় অব্যয় অক্ষয়।

মহাজন
তোমার সাধের বেড়া ভেঙে ঢোকে ছাগল সজ্জন —
বাগানের ফুল ফল খায়,
তখন তোমার ঘাড়ে সকলে চাপায়

সব দোষ —
রাজ্য জুড়ে ঘোর অসন্তোষ।

অথচ জানে না ওরা পাতা
ঝরে গেলে কোনো কোনো বৃক্ষের বেদনা
পাথরেও দাগ কাটে, পাথরেও হয়ে যায় গাঁথা —
ফুলের অক্ষরে ফের প্রতিটি পল্লবে অশ্রুকণা।

ওড়ে ঘোরে মন হতে মনের শাখায় কিছু কথা,
ভেঙে গর্ভবতী নীরবতা
ধীরে সুস্থে কোনো কোনো বাগানে একদিন
ফুটে ওঠে ফুল ফল সোনা।
মহাজন, তখন নবীন
তোমাকে ছাপিয়ে গায় তোমারি বন্দনা।

ভালোবাসা

ভালোবাসা ভেঙে গেলে আর জোড়া লাগে কি কখনো!
সঠিক জানি না, কিন্তু চাঁদ নিভে গেলে
ভারী পুরু অন্ধকারে স্মৃতি একা জাগে —
মনের নিকষে ফোটে ক্ষীণ রক্তকরবীর আলো,
পাখি পাখালির সঙ্গে যৌবন নির্মল জেগে ওঠে।
হয়তো লাগে না জোড়া — আগেকার মতো,
তবু ভালোবাসা
বার বার জন্মের নবীন
আনন্দ অত্যন্ত ভালোবাসে।

ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যতের ভালোর জন্যে যারা সচেতন
তাদের প্রাণের দ্যুতি
পৃথিবীর শরীরে বয়স জমতে দেয় না,
তাদের দিনগুলি গ্লানিহীন সহিষ্ণু।
কোনো পরিধি না-মানা তাদের ছোটো বড়ো
নানা বিষয়ের প্রতি মনোযোগ
বড়ো সজীব ও আনন্দদায়ক।

আজানময় প্রহর

বেলাল চৌধুরী

একটার পর একটা মহল্লা পার হয়ে নতুন পুরোনো ঢাকার যত্রতত্র
দিনরাতের ভিতর অন্তত পাঁচ ওয়াক্ত
যদি হয় একটি উত্তরে আর অন্যটি দক্ষিণে
এভাবে উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ.....

অতি প্রত্যুষে আলো ফোটার আগেই
মহল্লায় মহল্লায় জেগে ওঠে আকুল আজান-ধ্বনি
গাঙ্গেয় ভূমির এই সবুজ বদ্বীপব্যাপী বাজে প্রতিধ্বনি
দক্ষিণের আজানকে অনুসরণ করে উত্তরের আজান

সুতরাং যখন উত্তরের আজান জেগে ওঠে
তার প্রতিধ্বনি শোনে না কেউ — কেননা ওই ধ্বনি
হারিয়ে যেতে থাকে অন্য বহু আজানের ধ্বনি-তরঙ্গে
আজান বাজে দক্ষিণে। পশ্চিমাভিমুখী একজন তীর্থযাত্রী
এইমাত্র নেমে এল পুবের উপত্যকা থেকে।
সদা সজাগ ও সতর্ক কান পাতে সে
উত্তরে-দক্ষিণে এবং ফের দক্ষিণে-উত্তরে
তবু হল না বিশ্বাস তার; ক্রমাগত সে খালি শুনছে
এক দুই কিংবা চার পাঁচটি আজান
একই সঙ্গে যেন কোরাসে মেতেছে।

এ-পর্যন্ত খুবই পরিষ্কার : যখন ওই আজান থামে
তীর্থযাত্রীটি ভাবে, প্রথমে সে উত্তরের ধ্বনি
শুনেছিল শেষ — উত্তরের ধ্বনিকে অনুসরণ করেছে
দক্ষিণের ধ্বনি এবং সেইসঙ্গে পিছু নিয়েছিল
দক্ষিণের প্রতিধ্বনি। তা হলে তীর্থযাত্রীটি সেই সকালে
আমাদের তিনটি আজানের কথা বলেছিল;
কিন্তু তুমি তো জানো, এ-আজান শোনার পর
কিছু সময়ের জন্য তুমি কীভাবে তোমার
করোটির অভ্যন্তরে ওই আজানধ্বনি টেনে নিয়ে গিয়েছিলে।
এটাও অবশ্য ঠিক যে, প্রায় সকালে উত্তরের
যে-প্রতিধ্বনিরা হারিয়ে যায় — তারা আসলে কোথায় যায়?
সম্ভবত তীর্থযাত্রীটি যেখানে যাবার জন্য বেরিয়েছে

সেদিকেই তারা যায়। না-উত্তরে, না-দক্ষিণে।
আসলে আমরা সকলেই একদিন হারিয়ে যাব —
আমাদের সম্পর্কে অন্য সকলের
যেটুকু শেষ স্মৃতি বর্তমান, ঠিক সে-পর্যন্ত।
পরবর্তী সময়ে এই অন্য সকলেরা, যারা
আমাদের উত্তরসূরি তারাও হারিয়ে যাবে, যেতে হবে।
আমরা যতগুলি ভেবেছিলাম
তার চেয়েও ঢের বেশি আজান সেখানে ছিল।
তারা আমাদের জন্য কখনো থেমে থাকবে না
তাদের উদাত্ত আহ্বানে জেগে উঠে
আমাদের সারা-জীবনব্যাপী আলোকে অন্ধকারে
সর্বদাই গুনতে থাকব আমরা আমাদের সমূহ ক্ষতিগুলোকে।

নিশিকাব্য

নির্মলেন্দু গুণ

১

আজ আমার কবিবন্ধু আবু কায়সার মারা গেল।
অল্পদিনের ব্যবধানে আমি আমার বেশ ক-জন
অন্তরঙ্গ প্রিয় কবিবন্ধুকে হারিয়েছি,
যাদের সঙ্গে শুরু হয়েছিল আমার কাব্যযাত্রা।
খুব গভীরভাবে লক্ষ করে দেখেছি,
আমি আমার বন্ধু-মৃত্যুতে যেমন কষ্ট পাই,
তেমনি আনন্দও কম পাই না।
সে-আনন্দ হচ্ছে আমার বেঁচে থাকার আনন্দ।
যখন খুব কাছ থেকে একটি তারা খসে পড়ে,
শুধু শূন্যতা সৃষ্টির মধ্যেই সে ফুরিয়ে যায় না।
অগ্নিটানে হাওয়ার মতো ছুটে আসে নতুন জীবন।
মনে হয় বুঝি কিছুটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসার জন্য
সে নিজের আগলে রাখা স্থানটিকে
তার প্রিয় সহযাত্রীদের দান করে দিয়ে গেল।
বেঁচে থাকার আনন্দ আমরা সর্বদা টের পাই না।
বন্ধুজনের মৃত্যুতে সেটা নতুন করে উপলব্ধ হয়।

মৃতরা জীবিতের গতানুগতিক জীবনচক্রে
অস্তিত্বের উপলব্ধিকে হঠাৎ বাঙ্ময় করে তোলে।
সেখানে দেখতে পাই মৃত্যুর আরেক সার্থকতা।

২

ভালোবাসা জমে জমে বুকের ভিতরে
তৈরি হয়েছিল এক গোপন কয়লাখনি।
কেউ জানত না।
এমনকী, যার বুকে খনি, সে-ও না।
ঠিক তখনই, এক পড়ন্ত বিকেলে,
তোমার সঙ্গে আমার চাঁদনিচকে দেখা।

তোমার বন্ধু স্মৃতির সঙ্গে তুমি।
স্মৃতিকে দেখে মন খুশিতে উঠল ভরে।
পাশেই তুমি, কনে-দেখা গোধূলির
আলোয় উজ্জ্বল হাসিমুখে আমাকে দেখলে
তোমার দুটি গোপন বিস্ময়ভরা চোখে।
কোনো শব্দ বা বাক্য বিনিময় হল না।

দৃষ্টি বিনিময়ও সৌজন্যে সাজানো।
স্মৃতিকে বললাম, 'তোমার বন্ধুকে নিয়ে
একদিন আমার বাসায় এসো।'

আমাদের প্রথম দেখা আর বিদায়পর্বটি
ছিল এরকম। খুবই সাদামাটা।
তখন কি জানতাম ওই শাদার মধ্যেই
মিশে আছে প্রকৃতির যাবতীয় রঙ?

সেই তুমি, নামটাও জানিনি তখন,
কাজে লাগবে না, প্রয়োজনহীন ভেবে।
সেই নাম আজ আমার বুকের পিঞ্জরে,
আমার ভালোবাসার কয়লাখনিতে
উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মতো জ্বলছে;
আর আমি পুড়ছি তার কামাগ্নিতে —
ভেসে চলেছি তার ভালোবাসায়।

আমার পূর্ব প্রেমের প্রতিটি স্মৃতিকে
সে ফুৎকারে উড়িয়ে গিয়েছে আকাশে।
এই কি আমার প্রথম প্রেম তবে?

অন্তঃক্ষরণ

হেমোপম দস্তিদার

দিনান্তের উতল বাতাস কিছু বলে:
একদিন উপ্ত বীজ মেলেছিল শুদ্ধ ডালপালা
আকাশনীলিমা ছুঁয়ে রোদ, পাখি, প্রান্তরের সাড়া
তাকেও জাগিয়ে গেছে জীবনের গভীর আশ্বাসে।
নীরব বিস্ফারে ফুলে ও পল্লবে দিনে দিনে
প্রকৃতি সমাজে এই যাত্রা অক্ষুণ্ণ, সহজ।

তারই গান নিঃশ্বাসে নিয়েছ তাই অন্তহীন
পাখির ডানার মতো অনায়াস বাতাসে উড্ডীন,
কখনো ব্যাহত তবু উৎসাহের পক্ষ বিধূননে
স্বপ্নের সঞ্চার চোখে, মনে।

এমন সরল মুক্তি, উজ্জীবন কোথায় হারালো?
অন্তঃক্ষরণের পথে শিকড়ে, শিরায় প্রাণরস
ধীরে ধীরে স্তব্ধ হল না কি?
অথবা স্তম্ভিত সত্তা ক্রমে বোধহীন
অসাড় অভ্যাসে সমর্পিত!

দামাল হাওয়ায় তবু বদলে যায় চেনা এই পুরোনো শহর।

আত্মহননকারীকে

অরুণেশ ঘোষ

এখানে গহ্বরে ঘাস, গমখেত, যব
দিগন্তবিস্তৃত মাঠ সোনালি ফসল
দোল খায়, কেঁপে যায়, পাহারায় শব
নিছক তাড়ুয়া নয় — বৃদ্ধ আত্মঘাতী
দু-দিকে ঝুলিয়ে হাত ঝুলেছে দুপুরে
হেমন্তের, হয়তো বা বসন্তবাতাসে
ক্রোধে ফেটে পড়েছিল শাকম্ভরী দেখে
খিদে নিয়ে মরে গেল, খিদে, খিদে, খিদে

এত উর্বরতা, স্তন, বীর্য, মুগ্ধ দুগ্ধধারা
এতটা সবুজ যোনি এতটা সোনালি
এমন উৎসব, পুজো, সহবাসাবাসি

হোক না বয়স তোর গিরি-শৃঙ্গ-মালা
জপমালা হাতে নিয়ে ফসলের মাঠে
বোসে কি যেত না থাকা মরণের ঘাটে...

২
শুধু তো মৃত্যুই নয় আত্মহত্যা এ যে
শুধু আত্মহত্যা নয় ধুতিতে পেঁচিয়ে
নিজেকে ঝুলিয়ে দিয়ে সুদীর্ঘ দুপুর
কোথাও চিৎকার নেই কান্না নেই কিছু
হাহাকারহীন লোক যে যার মতন
তামাশা দেখিতে কেউ আসিবে না আর —
ভিড় করে, রান্না হবে, হবে খাওয়া-শোওয়া
এরই মধ্যে দোল খাবে মৃতদেহ একা

ভীষ্মের স্বেচ্ছায় মৃত্যু — পচা গন্ধ আসে
কখনো বাসেনি ভালো ঘৃণ্য 'আমি'টাকে
ভালো না বেসেও এমন জন্ম দেওয়া যায়
ওখানে কে বসে বসে গিঁঠ দেয় ধুতি
ওহ্, শরশয্যা থেকে ভীষ্ম, জল দিবি
বলে, পচেছে শরীর, শুধু মাথা জেগে...

৩
আমাদের মাথা জাগে — শুধু মাথা নয়
আমাদের লিঙ্গ জাগে — উচ্ছ্রিতও হয়
অনসূয়া বলে, তারও — এ কেমন শোক
সঙ্গমে আবদ্ধ হয়ে — উচ্চারিত শ্লোক
অশ্রু মুছে হাহাকারে আছারি-পিছারি
এমন কান্নার মধ্যে — স্নান মালগাড়ি
যার ওয়াগনে তুলে দেওয়া হল দেহ
আত্মহত্যা করেছিল — জানিবে না কেহ

আকাশে ওড়ার আগেই — আত্মহত্যা কেন
আকাশে ওড়ার আগেই — মুছে যাওয়া কেন
আকাশে ওড়ার পরে — নক্ষত্রমণ্ডলী
আমরা তো অনন্ত হয়ে — তাকে স্পর্শ করি
অণু হয়ে যাত্রা করি — শুক্র হয়ে ফিরি
শোক নয়, সঙ্ঘবদ্ধ স্তব্ধ হারিকিরি...

দুটি কবিতা

সুবিনয় ধর

তৃতীয় নয়ন

যখনই চোখের কাছে, যখনই কানের কাছে
ছুটি নিই গন্ধঘন বিরল বেলায় —
উৎসবের লগ্ন আসে রাজসমারোহে,
অন্ধকার জ্বলে, বাজে আলোর শানাই।

পাখিরা যেমন গায় আকাশের সংগীত-সভায়
সে-রকম না হলেও প্রায় তুলনীয়
স্বতঃস্ফূর্ত হার্দ্যতায় দ্বিপ্রহর সান্দ্র হয়ে যায়,
ফুলের উল্লাস হয় অনিবারণীয়।

সেসব বিরলক্ষণে নীলকান্ত সমুদ্রের বুকে
যাত্রা করে দলে দলে উজ্জ্বল জাহাজ,
দিক থেকে দিগন্তরে ছুটে যায় তেজি অশ্বদল,
বাতাসকে দীর্ণ করে শঙ্খের আওয়াজ।

সেসব নিবিড় লগ্নে অনায়াসে যুদ্ধ জয় হয়,
পর্যুদস্ত পড়ে থাকে ধূলার উপরে
অন্ধকার পুরোহিত, রক্তাপ্লুত এবং কুৎসিত
যে আমার কানে শুধু ভুল মন্ত্র পড়ে।

চক্ষু কান বন্ধ হয়ে ফোটে যেই তৃতীয় নয়ন
যে-মুহূর্তে ইন্দ্রিয়ের অধিক শ্রবণ
জেগে ওঠে, জ্বলে আলো অকস্মাৎ, নীলিমার স্নেহ
ঝরে যেন বৃষ্টিধারা — স্নাত হয় মন।

আমি তাই কৃতাঞ্জলি হে আমার তৃতীয় নয়ন,
হে শ্রবণ অতীন্দ্রিয়, হে সান্দ্র প্রহর,
ফুটে থাকো শতদলে, জেগে থাকো গভীর অন্তরে,
মরুক সে, যে আমার অন্ধ সহোদর।

ছবি ভেঙে

রাত্রির নদীর জল যে-রকম যায়
আমারও তেমনি যাওয়া দু-কূল কাঁদিয়ে,
অস্তসূর্য যে-রকম পাখিকে ফেরায়,
আমারও, সেভাবে ফেরা প্রতিমা ভাসিয়ে

সুরে সুরে স্থলপদ্ম মাটি ও আকাশ
মুঠোর ভিতরে ধরে মুঠো খুলে খুলে
ধনরত্ন পথেঘাটে কেমন নিরাশ
কীরকম মন্দ্রে তারে একই সুর বলে

চেতনায় অচেতনে কী যে গলাগলি
কী বিবাহ শব্দ আর নৈঃশব্দে মহান
আমার তো সর্বক্ষণই ঘটে অন্তর্জলী
সর্বক্ষণই প্রসবের আর্ত অভিমান।

ছবির মতন সেজে রয়েছে সংসার
ছবি ভেঙে কে যে করে এপার-ওপার।

সংযোজন: প্রায় দু-দশক আগে প্রয়াত হন কবি সুবিনয় ধর। এর আগে কবির একগুচ্ছ কবিতা ছাপা হয়েছিল *বিভাব* ৪৮ তম সংখ্যায় ১৯৯০ সালে। স্বল্পায়ু এই কবির বর্তমান কবিতাদুটি পাওয়া গেছে তাঁর বন্ধু হেমোপম দস্তিদারের সৌজন্যে।

অভিষেক

জগদিন্দ্র মণ্ডল

উদ্বেলিত হতে থাকে এক ঘন বাষ্প
ঘোর কালো অন্ধকারে বুকের ভিতর,
কঠিন সর্পিল পথ; হাওয়া রূঢ় শুষ্ক
অধীর অগ্নিভ বৃত্ত, সূর্য-চূর্ণ ভস্ম!
মর্মের গভীরে ঢেউ তোলে অনুচ্চার
কুরে কুরে খায় ছায়াচ্ছন্ন সত্তার!
প্রকম্পিত চূর্ণ রোদ জলে ভেসে যায়

স্বপ্ন যেন সেতুবন্ধ, রক্ত পায় পায়
এর নাম বর্ণনীল স্তব্ধ বেঁচে থাকা
এর নাম আলো-স্পর্শ বুকে ছবি আঁকা!

বুকে নামে তিল তিল উদাত্ত আকাশ
ঝড়ে নদী ঢেউ তোলে, জলজ বাতাস;
পৃথিবীর ভিতরের জল স্তরে স্তরে
অগ্নিশিখা থরে থরে, শিখা-বারি এক
নিরুদ্ধ বিপুল ব্যথা তবু অভিষেক।

দুটি কবিতা

দেবী রায়

ভবের হাটবাজারে

প্রবীণ এ দু-চোখের মাপে, যে প্রকৃতির
ছিন্ন অংশ চোখে পড়ে — জেনো,
তাও তুচ্ছ নয়!
টুকরো টুকরো করে ভাঙো বিস্কুট, দাও ছুঁড়ে
বা এগিয়ে, ওই জোড়া শালিক মুখে তুলে
নিয়ে যাওয়া মাত্র ওই কুচকুচে মারকুটে বায়স
ওদের পিছু পিছু দৌড়োয়!
মনোরম এই দাবদাহের সকালে —
বেরিয়ে পড়ি এদিক-ওদিক
ভবের হাটবাজারে সুখ-দুঃখের গপ্পো,
মাথার ঝাঁকায় তুলে নিয়ে ফিরে আসি।

ছাদের আলিশায়

ছাদের আলিশায়, দুটি কাক এসে বসে।

চুল ঝাড়ছে? এসব ভাবা যেত, হয়তো... । লিখলে
বেধে যাবে ধুন্ধুমার

আবার
বাস্তবে, একজোড়া কাক চুল ঝাড়তে পারে না হে।

ভেবে নাও, বরং মা ও মেয়ে
এইমাত্র স্নান সেরে এল, বাথরুমে সাবানের গন্ধ
লেগে আছে এখনো!

রাতভর টানা বৃষ্টির শব্দ। জীবনে এই প্রথম
ভেসে আছি বৃষ্টির নৌকায়।

জানালায় বসে পরখ করি : এ-শহরের পথঘাট
গাছেদের পুলকিত চেহারা, পাখিদের হতচকিত অবস্থা।

রাস্তার চেহারা? কাশীর বিধবাদের চেয়েও অবর্ণনীয়।
মেঘ ও বৃষ্টির চাপা উল্লাস.....

চোখ আগলে দাঁড়ায় মেঘ!

দুটি কবিতা

আনন্দ ঘোষ হাজরা

ভাষা

এক জলতল থেকে আরেক তলের দিকে যাওয়া
এভাবে মাছেরা যায়?
লবণঘনত্ব থেকে আরো বেশি ঘনত্বের দিকে
মাছেরা কি যেতে পারে? যেইভাবে মানুষেরা যায়?
বিভিন্ন ঘনকে খেলা, ঘনকপ্রবাহে ঘোরাফেরা
শুধু মানুষেরা পারে; মাছেরা পারে না।

অথচ শব্দেরা পারে
শব্দ অস্থিরতা চায়, বিভিন্ন মাত্রায় যেতে চায়।
ভাষা বন্দীশালা নয়
বন্দীশালা-ভাঙা-ঝড় এবং আগুন।

কার্নিভাল

কীভাবে বুনছ তুমি সারাদিন
এরকম বৈচিত্র্যহীনতা!
শুধু ক্রুশ কাঁটাগুলি নির্দিষ্ট আঙুলে খেলা করে
স্থিরচিত্ত মাছরাঙা যেন সারাবেলা
কচুরিপানায় বসে আছে;
লক্ষ্য মাছ, অধরা অথচ —
কেউ কেউ উড়ে যায় ঠোঁটে কিছু ধরা থাকে
এরকম অলৌকিক অনুভূতি মাঝে মাঝে হয়।
শুধু এইটুকু পাওয়া! এ-জন্যই দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ জুড়ে
একান্ত নকশার ছড়াছড়ি
এরকম বৈচিত্র্যহীনতা?

তার চেয়ে কোলাহল করে সব ছিঁড়ে ফ্যালো যদি
যেমন উৎসব হত মাঝে মাঝে বস্ত্রাহীন
শৈশবে, মেলায়।

দুটি কবিতা

তুলসী মুখোপাধ্যায়

কুহক মায়া

নিরবধি মিথ্যার সহবাসী মাকড়ের জালে
কিংবা কামাচারী আলোকের সম্মোহনী ঢালে
সহযাত্রী পৃথিবীকে পতঙ্গের মতো খাদ্য করে
যারা ডিনারের টেবিল সাজায় —
প্রকৃত প্রস্তাবে তারাই তো সত্যের পূজারী
তারাই তো মানবত্রাণে রাস্তার ভিখারি।

পতিতপাবনের দৈব বিভায় —
মিথ্যা রমণের মোহিনী মায়ায়
পতিতের পতনকে যারা আরো অধঃপতনে ঠেলে দেয়

তারাই তো প্রকৃত সংগ্রামী
তারাই তো আমাদের নিশ্চিত আগামী!

মোহময়ী আবেশে পৃথিবীকে নিজ বশে এনে
তার দশদিকে তারা চন্দনের সুবাস ছড়ায়
আর আকাশ জুড়ে ফোটা ফুলের জয়গান ওড়ায় —
বস্তুত তারাই তো প্রকৃত প্রেমের সঞ্চারী
মিছিলের পুরোভাগে তারাই তো পথের দিশারী।

অতঃপর হাঃ হাঃ হাঃ
পাঁচতারা হোটেলে পতঙ্গ পুড়িয়ে নিয়ে
যত পারিস ঢেকুর তুলে ধরণীর জননীকে খা!

তাঁর জন্মদিনে

আচমকা রবি ঠাকুর এসে
মুখোমুখি সামনে দাঁড়ালে
আমি অসহায় — বড়ো অসহায়...
মাথা থেকে মানুষের শোলার টোপর
নিদারুণ দহনে পুড়ে ধূলায় লুটায়!

যে-কোনো অন্ধ আঁধারে
রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ অনাথের নাথ
জবাকুসুমসঙ্কাশের মতো উজ্জ্বল অভয়
যে-কোনো নাশ-ত্রাস-দমন-পীড়নে
রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ রবি-ইন্দ্রনাথ
পিতা ও পিতামহের মতো পরম আশ্রয়!

মনে হয় — মনে হলেই শুধু মনে হয় :
তিনি কি সুদূর কোনো গ্রহ থেকে ছিটকে এসেছিলেন?
না হলে, এই ঘোর মুষল মরণে
তিনি কেমন করে অমৃতের স্বপ্ন এঁকেছিলেন?
না হলে, এই তমসাময় কামান্ধ পতনে
তিনি কেমন করে উদ্ধারের উদয় জ্বেলেছিলেন?
আসলে সম্ভোগ-লালসামগ্ন এই পৃথিবীর চোখে
তিনি এক নিছক কল্পনা —
কিংবা আকাশকুসুমের মতো তিনি এক অজাতক সবিতা-বন্দনা।

আজ তাঁর জন্মদিন —
শো-কেসে বন্দী সেই বিগ্রহের শুভ জন্মদিন :
ঢাকে ঢোলে কবিতা গানের মহারোলে
নামাবলী-পরা ভক্তের তর্পণে শোধবোধ ঋণ!

সংযোজন : প্রয়াত কবি তুলসী মুখোপাধ্যায়ের কবিতাদুটি পাওয়া গেছে কবি-পত্নী শ্রীমতী প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, কবির কন্যা ও জামাতা, সোমা ও সুমিত চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

সন্ধিপ্রস্তাব

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

এবার সন্ধি হতে পারে, অক্ষর,
চিরসখা, আমাকে ঘুমোতে দাও,
কত জেগে থাকব?

যদিও রান্নার ঝাঁঝ
এ পরবাসে চারদিকে উজান,
আলো ঘুরছে সার্কাসে, তাঁবুর বাইরে,
রাত অনেক।

দ্রাবিড় আর্য হো মুন্ডা মঙ্গোলেরা
বাধ্যত বিদায় নিয়েছে, কিংবা নেবে —
এ এক কঠিন সময়, অথচ বর্ষায়
ইছামতী এখনো তুমুল, বাউরা —
কৃষ্ণসাগরের পারে পারে
অজস্র তামাকগাছ দীন পথিকেরে
বলে দেয় লঞ্চঘাট, ভাতের হোটেল,
কলমিশাক কাচপোকারা
জলস্পর্শ বোঝে।

অক্ষরের রুদ্রাক্ষ কি কিছু নয়?
শুধু গাছফল? পাগলা দাশু?
নিঃস্ব? দু-মুঠো দু-বেলা জোটে না?

সাংঘাতিক ভুল হচ্ছে
দোকানে, নৈরাজ্যে,
আমি ঘুমোলেও রাজদ্রোহে যেতে পারে
অক্ষর, মলাট, নড়বড়ে সেলাই।

ছায়ানারী

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

রুক্ষ তালু ক্রমেই শুকিয়ে আসে, অকারণ উদ্বেগ, চিন্তার তুলো
জলে ভিজলে নিমেষে শুষে নেয় বাতাস, জ্বরতপ্ত চিবুক কপাল —
থার্মোমিটারের পারা নীচে নেমে গেলে দুর্বলতা। অবসাদ ঝেড়ে ফেলে
অনিচ্ছুক পায়ে রাস্তায়, শীতান্তের পাতা ঝরে হলুদ বিকেলে...
অসংখ্য বছরের স্মৃতি-ঝাপটানো বৃষ্টি, পাখিদের ডাকাডাকি গোধূলিসঙ্কেত।
চোখের আড়ালে ঘোর, শহরতলির পুজো একলা দু-জন আজ কেন স্মরণীয়
হবে! প্রকৃতির খোলা স্তন সবুজে ঢেকেছে। ধূ ধূ মাঠ শিলাবৃষ্টি
অপেক্ষা বৃথা যায়, কঠিন আলস্যে দিন কাটে, রাতের বিছানা
দীর্ঘ একা শ্বাস ফেলে।

তোমাদের আলোচনা কালো নীল নক্ষত্রে ভাসে, নৌকো
ক্রমশ দূর, গা ঘেঁষে চলেছে ছায়ানারী, স্পর্শ নেই, আপন
খেয়ালে দোলনা, একদিকে অতীত অন্য পারে ভবিষ্যৎ, কাছে দূরে
অবিরত সরে যায়, আসে। এলোমেলো ঘূর্ণি পাতা নিয়ে ঘুরতে
ঘুরতে ছোটে, সেই দৃশ্য আজ আমার প্রিয়তম নেশা। সূর্য
নামে জলে, সময়ের চলে যাওয়া দেখে ছায়ানারী, টেনিস কোর্টে
শাদা বল দিক-অন্ধ ছুটে যায়...

চিহ্ন

কমল দে সিকদার

চিতা-চিহ্ন ভেসে যায় জলে
নীচে জল ঘোলা জল
জেটিতে আঁধার নামে তুমুল উল্লাসে

হরিধ্বনি দিতে দিতে শ্মশানযাত্রীরা আরো... ...
ইহার ভিতর ভালোবাসা ছিল ইহার ভিতর আড়ি
ছিন্ন করে খেলা সব কোথা দিলে পাড়ি
তুমিও কি ব্যর্থ ছিলে খুব নতুবা আনাড়ি

চিতা-চিহ্ন ভেসে যায় জলে
সূর্য দিল ডুব ওপারের জঙ্গলে —

স্থাপত্য

উত্তম দাশ

এখন তবে স্থাপত্যের কথা বলি —
গর্ভগৃহে তখন অবয়ব তৈরি হচ্ছে
একটি ডিম্বাণুর সঙ্গে শুক্রকীটের মিলন হল
এবং ক্রমে কোষ বিভাজন হতে হতে
এই আমি, আমার চোখে বাবা তৈরি হল
মায়ের মধ্যে থাকতে থাকতে দাদান হল ঠাম্মি হল
আর এই জগৎ-সংসার নির্মাণে এল ধীরে ধীরে।

ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা করেই তো এলুম
খুব নির্বাক বলে কথা বললেন না, সৃষ্টিরহস্যে
কালিদাসের মতো স্তম্ভিত হয়ে রইলেন,
বললাম — দাদাঠাকুর, এখন চলি, মানা ক্যাম্পের পথে
হয়তো কখনো দেখা হয়ে যাবে,
উইন্ডমেয়ার লেকে যখন সূর্যের রেণুগুলো
চূর্ণবিচূর্ণ হবে, তখন হয়তো তোমাকেই দেখব আবার,
রোটাং পাসে মাইনাস সাত যখন থাবা মারবে বাতাসে
তোমার করুণা যেন স্পর্শ রেখে যাবে মুখমণ্ডলে,
আইফেল টাওয়ারের ত্রিতল থেকে যে প্যারিস শহর
সেখানেও তোমার সৌন্দর্যবোধ কম খেলা করবে না।
ধরো, ব্ল্যাক ফরেস্ট পেরোচ্ছি, আধুনিক জার্মানি
হিটলার নেই, কম্যুনিজম নেই কিন্তু তুমি আছ
বন্ধুর মতো অরণ্য থেকে বিবেকবার্তা পাঠাচ্ছ
ইন্টারনেটে জগৎসভায় সবাই দেখছে,
আমাদের বারুইপুরের পদ্মপুকুরে যে জলতরঙ্গ
তোমার মহিমা সেখানেও হাত পেতেছে।

এত নির্বাক, নিজের কথা কিছুই তো বললে না
আমি কথা বলতে শিখিনি, সবে সাত মাস
হাসলে মুখমণ্ডল জুড়ে তুমি খেলা করো
কাঁদলে বাগদাদ ছেড়ে পালাচ্ছে কোলে-পিঠে
শিশুসন্তান নিয়ে যে ইরাকি দম্পতি
তার অসহায় ভঙ্গিটুকু তুমিই তো নির্মাণ করেছ

এবং এ-সবই মানবতার নামে,
তা হলে তুমি মানুষ তৈরি করলে কেন
তোমার সুন্দর কি সমুদ্র পাহাড় আর অরণ্যে
কৃপণ হয়ে থাকত, আসলে তুমি সৃষ্টিকর্মের
কিছুই বোঝো না, এই যে আমাকে
সৃষ্টি করলে, দেখো, কত কষ্ট পাব —
তুমি খুশি হবে?
আনন্দের কথাটা বলিনি কিন্তু
আমি তাও তৈরি করব, তুমি যাকে বলো নির্মাণ —
তাই,

সবে ভোর হয়েছে
আমি এখন বড়োমার কোলে ঘাটে বসে
আম আর কাঁঠালের শিহরনে
আমার জগৎ সৃষ্টি করছি

ঈশ্বর তুমি আমাকে চুম্বন করবে না?

দুটি কবিতা

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

লিফ্‌ট

এ-এক মজার খেলা, বোতাম টিপে ধরতে না ধরতে
পলকের মধ্যে উঠে যাচ্ছি ওপরে, আরো ওপরে
প্রায় আকাশ ছুঁয়ে দেখতে পারি এরকম উচ্চতায়,
কিন্তু এমন একটা বদ্ধ খাঁচার মধ্যে রয়েছি, আকাশ দেখতেও পাই না;
শুধু অনুভব করতে পারি ক্রমাগত উঠে চলার গতিবেগ
শুধু বুকের মধ্যে হাহুতাশ আর হাহাকার শূন্যতার,
মাটি ছেড়ে সব্বাইকে নীচে রেখে উঠে যাওয়ার দুর্নিবার সুখ।

সবাই এমন করে উঠতে চায় অনেক ওপরে
সবাই এমন করে আকাশের নিরিবিলি বারান্দায় নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে

নীচের মানুষজন, ঘরবাড়ি, সমাজসংসার দেখে নিতে চায়
নির্বিকার চোখে নীল দূরবিন রেখে।

অথচ এমনও হয়, একদিন দ্রুতবেগে নেমে আসতে হয়,
কেননা উচ্চতা বড়ো ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নের বুদ্বুদ,
এভাবে নামতে হলে মাথার ওপরে কোনো আকাশের চন্দ্রাতপ নেই,
পায়ের নীচেও মাটি অবশিষ্ট থাকে না তখন,
শূন্য, নিরালম্ব হয়ে নেমে যাওয়া, ক্রমাগত অবতরণের
যেন আর শেষ নেই, ক্রমে অন্ধকার
বিশাল মুখের মধ্যে গ্রাস করে কল্পনাপীড়িত
অলৌকিক যন্ত্রযান, যারা নেমে যায় তারাও জানে না
শেষ কাকে বলে!
ওপরে ওঠার আগে একবার ভেবে দেখা বড়ো প্রয়োজন
মাধ্যাকর্ষণের কিছু অমোঘ নিয়মাবলী, আর কিছু সামান্য হিসেব
নীচের সবুজ ঘাসে পুনরায় স্থির হয়ে দাঁড়ানো যাবে কি?

আমার পৃথিবী

আমার পৃথিবী ক্রমে ছোটো হয়ে আসে
প্রতিদিন, বহু ব্যবহারে ক্ষয়ে যাচ্ছে প্রিয় ঘরবাড়ি
সমাজ-সংসার, সব কিছু একাকার গণ্ডির ভেতর
এবং আমিও ক্রমে শীর্ণতর, ম্লান।

পৃথিবী বলতে যারা গাছপালা, নদী কিংবা সমুদ্র বুঝেছে
পৃথিবীকে যারা খোঁজে উপত্যকা পাহাড় পর্বতে,
আমি ঠিক সেই দলে পড়ি না এখন
পৃথিবী বলতে আমি মানবসমাজ কিংবা সভ্যতা বুঝি না।

আমার পৃথিবী আজ আশ্চর্য সুন্দর অনুভূতি
আমার পৃথিবী জুড়ে অবাস্তব স্বপ্নরাজ্য গড়েছি একাকী
বহুদিন, বহুরাত পরিশ্রম করে, অথচ পৃথিবী
এখন সঙ্কীর্ণ হয়ে সিঁদুরকৌটোর মধ্যে অনায়াসে ধরে।

এভাবে চললে জানি আমার পৃথিবী ক্রমে ধুলোর আশ্রয়ে
আমাকে ক্রমশ টেনে নেবে একদিন।
আমার কবিতাগুলো অনায়াসে ভুলে যাবে লোকে
হয়তো আমার নাম উত্তর বাতাসে মিশে ভেসে যাবে দূরে, বহুদূরে!

মৃত বীজকোষ

সুব্রত চক্রবর্তী

চূড়ান্ত স্মৃতির কাছে নতজানু মানুষের ঘাড়ে ঠাণ্ডা উজ্জ্বল কৃপাণ...
মানুষ পায়নি টের সেই ধার, শুধু কোনো পাথরের ছায়া
অনুভব করেছে সে। শুধু কোনো অনুপ্ত বীজের
অন্ধকারে ভরে যায় তার মাথা। অবেলায়, বিদায়ী পাখির
রক্তাক্ত পালক ঝরে পড়ে চারিদিকে... সে কি চিরমায়া,
অব্যয়, অভিন্নমন, সে কি শাদা অঙ্গুরীয়ক্ষত!

নিভন্ত উরুর কাছে জ্বলন্ত আঙুলগুলি আজো নড়ে; হিমশূন্যতায়
কেউ নেই... ভাস্বর পাথরগুলি সারারাত কঠিন আকাশে
পোড়ে, পুড়ে ছাই হয়... আর শান্ত, ঘুমন্ত উরুর নীচে
উল্কামুখী বাঘ
জল খায়; কর্কশ জিভের শব্দে জেগে উঠে বাদামি তিলের
দীর্ঘ লোম জড়িয়ে ধরেছে ওকে —
হাত ধরে নিয়ে যায় মৃত বীজকোষে।

সংযোজন : প্রয়াত কবির এই কবিতাটি পাওয়া গেছে কবিপত্নী শ্রীমতী মালা চক্রবর্তীর সৌজন্যে।

দুটি কবিতা

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

সাপ নেমে এসে

বালিশের তলায় যা ছিল তা হচ্ছে একটা বিশাল বড়ো বিছে
একটা অ্যাসিড বাল্ব, একটা ঘাড় কনকন করা পাথর যেটা
এখনো গলায় ঝুলছে।
বিছেটা সব কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল,
চোখের জল মুছিয়ে তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম জঙ্গলে,
গলায় বেঁধে দিয়েছিলাম বাল্ব, বালিশের তুলো
ছড়িয়ে দিয়েছিলাম রাস্তায় —
যখন পিচ গলছে, কান্না গলছে মুখে
— ঠিক তখনই তুলোগুলো উড়ে যাচ্ছিল

মাথার ওপর দিয়ে —
মানুষ ভাবছিল মেঘ, বৃষ্টি এল বলে।
আমি তো সব জানতাম তাই হাঁটছিলাম, জানতাম
কোথায় দাঁড়িয়ে আছ অন্ধকারে, কোথায় সরিয়ে নিচ্ছ মুখ।
আমি তো চেয়েছিলাম,
তুমি তো চেয়েছিলে সব ঠিকঠাক হোক —
বাজার থেকে কিনে এনেছিলাম এক রকমের দুটো
দারুণ দামি তালা,
একটা তোমার একটা আমার,
কিন্তু চাবিগুলো বদলে দিল কে?
এখন ট্রামের ভেতর বসে বসে ঢুলছি, অন্ধকারে বৃষ্টি পড়ছে সত্যি,
বিছেটা ফিরে এসেছে, মুখে অ্যাসিড বাল্ব।
ট্রাম গুমটিতে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাম। কনডাকটার চিৎকার করছে —
— নামুন নামুন, নইলে বাড়ি থেকে বালিশ এনে ঘুমোন।
অদ্ভুত এক বাড়ি, অত্যদ্ভুত দেওয়াল, ছবির সাপ নেমে এসে
খুঁজে যাচ্ছে হারিয়ে যাওয়া স্তনের নীল বোঁটা, পাশে
গুন গুন করতে করতে
বালিশের খোল দিয়ে মেঝে পুঁছছে রাধা।
তুলোগুলো সব সত্যি মেঘ হয়ে এখন উড়ছে
নতুন মেঘের পাশে।

বরফ

১

একটা নদী বরফ হয়ে আছে
একটা নৌকো বরফ
হাজার মাছ বরফ হয়ে আছে
লক্ষ ঝিনুক বরফ।

একশো মেঘ বরফ হয়ে আছে
দশটা প্লেন বরফ
একটা গাছ বরফ হয়ে আছে
অনেক মানুষ বরফ।

২
হাত ঘষে নাও স্তব্ধ হাতে
ঠোঁট ঘষে নাও ঠোঁটে,
নাকের ওপর নাক রাখলে
বরফ গলতে থাকে।

জল হয়ে যায় নদীর মতো
গাছের রঙ সবুজ,
চোখের নীচে নৌকো চলছে —
একটা মাছ অবুঝ।

৩
অবুঝ মাছের ভালো লাগছে
বরফ বরফ গন্ধ
বরফজন্ম গলে গেলেই
দশহাজারি ধন্ধ।

স্মৃতির মধ্যে বরফ জমুক
স্বপ্ন হোক বরফ —
অন্যে লিখুক বরফ দিয়ে
ভালোবাসার হরফ।

ভূমধ্যসাগর
অভী সেনগুপ্ত

নিজেকে উন্মুক্ত মেলে দিয়ে চলাফেরা করে এখানে প্রকৃতি
জলের সম্পন্ন এই সাম্রাজ্যের চোখ-জুড়োনো রূপের থই খুঁজে-পাওয়া
সত্যি দুঃসাধ্য আমার কাছে
অপলক সাক্ষী বলতে নিঃসঙ্গ আকাশ, কখনো এক-আধজন
নির্ভেজাল রূপচোর আমার মতন
সিন্ধুসারসের স্বভাবের একঝাঁক প্রহেলিকা আমাকে জড়িয়ে ধরে
নিয়ে যায় দূর ইতিহাসের গভীরে —
সাবলীল ভেসে যাচ্ছে ওই ক্লিওপেট্রার নিভৃত বজরা, সঙ্গী কোনো-না-কোনো
তৃপ্ত প্রেমিক... টলেমি, সিজার হয়তো মার্ক অ্যান্টনিও

এই রূপের বিস্তীর্ণ সমারোহে যদি থেকে যাই আমি কী আর এমন
এসে যাবে সমাজ-সংসারে —
পাগলের পরিণতি ভেবে নিয়ে কলকাতার দু-চারজন চেনা
মুচকি হাসবে, এইমাত্র
মনোবেগে দূরত্ব টপকে আমি চলে যাচ্ছি মিশর পেরিয়ে
ইজরাইল, তুরস্ক, গ্রিস, ইতালি...
আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ... ভূমধ্যসাগরের তটরেখা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে
প্রাচীন সভ্যতা আর চলমান আধুনিকতার যাচ্ছি আনাচে-কানাচে
পাশাপাশি বাস্তবিক বালুকাবেলায় থেকে পুরো কৌতূহলে দেখে নিচ্ছি
— পরনে শর্টস শুধুমাত্র, দুই সাবলীল বন্ধু, মুহূর্তে মসৃণ স্পিডবোট চড়ে
সমুদ্রের গোপন অঙ্গের দিকে কীভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়...
কে কে ওরা? — কমবয়সী পিকাসো আর পল এলুয়ার?
মাঝবয়সী বিষ্ণু দে, যামিনী রায়-ও হতে পারে...
ধরাছোঁয়ার বাইরে অন্য শিল্পের আস্বাদ নিতে যারা যায়,
রসিকেরা বলেছেন, সেই সুসময়ে
ছবি আর কবিতার বাইরে অন্য নাম ঘুণাক্ষরে ভাবতে নেই —

প্রকৃতির অবসর কাটানোর দায়ভার কোন নিরালায় রাখা থাকে
ভূমধ্যসাগর ছুঁয়ে যা জানার ঠিক জেনে নিচ্ছি আমি —

আমৃত্যু রঙ্গন
দেবারতি মিত্র

রঙ্গন বলত, তুমি কিছুই পারো না।
ভাবো কেন অত?
শুধু ফুটে ওঠো
ঘোর লাল বোঁটাহীন পলাশফুলের মতো
শুয়ে থাকো গাছের তলায়।
রঙ্গন বলত
তোমার চোখের জল, তোমার বুকের স্ফুট মেঘ
অন্ধকারে অবিরত বৃষ্টি হয়ে ঝরে,
সৃষ্টির অপার কষ্ট শুরু হয় — ফুল ধরে, ফল ধরে,

প্রকৃতি আপন মনে কাঁদে কেন তুমি শুনেছ কি?
দ্যাখো ওই কালো পাথরের ঢেউ উঠে গেছে —
চাঁদের মায়ের অশ্রু লেগে আছে এখানে ওখানে।

রঙ্গন বলত, আরে, সবাই কি সাঁকো পার হতে জানে?
বিনুনির জট খোল্,
চাঁপাগাছে দোলনা বেঁধে আকাশ ছাড়িয়ে যা না তুই,
কাঁচা মিঠে আম মাখ্ নুন লংকা দুপুরে সারং রাগ দিয়ে।
একছিটে ভুল দিস,
তবে খাবে অনমিত্র, তবে খাব আমি।

তারপর রোদ-বৃষ্টি-বাতাসেতে এত দুঃখ গুলে গেছে
মেশানো চলে না আর,
ঘনতা চরম সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।
আকাশের পট ভেঙে উথলে উঠছে
মেধা ও দুঃস্বপ্ন আর আমৃত্যু রঙ্গন।

সুতো ছিঁড়ে যায়

অরণি বসু

নিঃশব্দ চরণে এসে দাঁড়াই, কুয়াশার ভিতর থেকে অস্পষ্ট ছবি জেগে ওঠে।
আরো দূরে চূর্ণ সংগীতমালা, অসম্পূর্ণ চিত্রকল্প, চড়াই-উতরাই —
কোথাও পৌঁছোতে হবে। কোথায়?
ব্যস্ত লোকালয়, সাপলুডো, চোখের নীচে কবেকার শুকনো জলের দাগ।
নিজের সামনে বারবার নিজেকেই দাঁড় করাই।

ঘুরে বেড়াই, ঘুরতে ঘুরতে আবার স্তব্ধতার কাছে এসে দাঁড়াই,
নিঃশব্দ চরণে।
কিছুটা সত্য আর অনেকটা মিথ্যা,
কিছুটা মিথ্যা আর অনেকটা সত্য
জড়াজড়ি করে থাকে সারাজীবন —
সারাজীবন অনন্ত কুয়াশা, শিশির, ভয়, শান্তিজল।
নিজের সামনে বারবার দাঁড় করাই নিজেকেই আর চেনার চেষ্টা করি,
খুব চেষ্টা করি —
আজকাল প্রায়ই সুতো ছিঁড়ে যায়।

অলোক চট্টোপাধ্যায়ের গানের আসর

কালীকৃষ্ণ গুহ

কিছুক্ষণ আগে অলোক চট্টোপাধ্যায় গান গেয়ে উঠেছেন। শুদ্ধ কল্যাণ, ছায়ানট, দরবারি। শ্রোতারা দু-ঘন্টা মাথা নিচু করে বসে থেকেছে। কেউ কেউ লুকিয়ে চোখের জল মুছেছে— যারা গান শুনতে শুনতে বিশুদ্ধ একটা কান্নার সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত কান্না মিশিয়ে নিচ্ছিল।

গান শেষ হলে শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক মলিন যুবক হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল 'আজ বুঝতে পারলাম আমরা অমৃতের পুত্র।' মনে হল অনেক ক্ষয়ক্ষতি পার হয়ে এসেছে সে। সকলেই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। আর কেউ কিছু বলেনি।

শ্রোতারা চলে গেলে অলোক এক বন্ধুকে বললেন, 'বাবার মৃত্যুর পর এখন আর বাড়িতে থাকতে পারি না। সারাদিন বাইরে থাকি, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই।'

কোন কথা কখন কোথায় যে এসে পড়ে! অন্তহীন একটা সময়ের মধ্যে সব কিছু ঘটে চলেছে, বুঝতে পারি।

বাড়ি ফেরার পথে আকাশে তাকিয়ে মনে পড়ল, কাল ছিল দোলপূর্ণিমা!

চৈত্রের শালবনে

আশিস সান্যাল

ক্রমশ বিহ্বল রাত
প্রাঞ্জল বাতাসে
চৈত্রের শালবনে এ কী আলোড়ন?
সব কিছু ভালোবেসে
মনে হয়
তার কাছে আছে আরো বহু প্রয়োজন।

হরিদ্রা বনের পাশে
সারারাত

তাই আজও বসে আছি তৃষিত শরীরে।
সে যদি আবার আসে
স্বপ্নময়
চৈত্রের বিহ্বল রাতে নির্মল সমীরে!

জানি না কী নাম তার —
চোখ তার
মনে হয় পরিচ্ছন্ন দিঘির মতন।
জামরুলের মতো বুক
চুল তার আউলিয়া সফেদার বন।
প্রতিবার কাঁপে ঠোঁট
যতবার কাছে গিয়ে হাতে রাখি হাত —
অপরূপ ভঙ্গিমায়
কেঁপে ওঠে প্রত্যহের প্রসারিত রাত।

ক্রমশ বিহ্বল রাত
চৈত্রের বাতাসে
তোমার মুখশ্রী যেন নীলিমায় ভাসে।
কাছে এসো অনামিকা
নিরুচ্চার বুকে রাখো বুক —
এর চেয়ে পৃথিবীতে
জানি আর নেই কোনো নিরাময় সুখ।

স্বপ্ন-মঙ্গল

রবিউল হুসাইন

প্রতিটি বইয়ের একটি মলাট থাকে
প্রতিটি নদীর থাকে পাড় বালুচর
মানুষের তেমন কী আছে মনোলোকে
দুঃখভরা ভালোবাসা বিন্দুবৎ আনন্দ তারপর

মাইল মাইল দীর্ঘ জীবনের সঙ্গে দুঃখ-সংগ্রাম
খানাখন্দ উঁচুনিচু জমি বনভূমি জঙ্গল
কর্দমাক্ত জলাভূমি তীব্র বায়ুস্রোত অবিরাম
তবুও উচ্চারিত হোক জীবনের জন্য এক স্বপ্ন-মঙ্গল

নীলপদ্মে পা রেখেছ

মৃণাল বসুচৌধুরী

নীলপদ্মে পা রেখেছ
দুই হাত জলের ওপরে
ভুবনমোহিনী ওই শরীরের চারপাশে
রঙিন মাছের খেলা
প্রবালপ্রাচীর ছুঁয়ে ভেসে আসা
জলচর প্রাণীদের অলস মুগ্ধতা
জেটির ওপর থেকে ছুটে-আসা ব্যাকুল উচ্ছ্বাস
মূর্ত করে চরাচর
বিনম্র আভায়
ভাঙা চাঁদ
নিজেকে লুকিয়ে রাখে তোমার দু-চোখে

দূর পাহাড়চুড়োর ওই প্রাচীন মন্দির থেকে
কখন যে নেমে এলে সমুদ্র-শাসনে
কখন যে মানবী থেকে
মায়াবী দেবতা হয়ে যাও
এ-সমস্ত বোঝার আগেই
ভক্তদের ভিড় বাড়ে
শুরু হয় নগরকীর্তন

কাছে গিয়ে
নতশির প্রণাম জানাব
নাকি অভিমানী নীরব বন্দনা নিয়ে
চলে যাব ধূসর আড়ালে
আমি ঠিক বুঝতে পারি না
বুঝতে পারি না কেন
জাহাজঘাটার স্মৃতি সারাক্ষণ
শুয়ে থাকে ছায়ার ভেতরে।

দুটি কবিতা

গৌরী ধর্মপাল

নন্দন

এই তো সেদিন হলে বাবা, ছত্রিশ দিন মোটে
তারি মধ্যে পড়াশোনা, চাঁদনগরী মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসা
চাকরি বিয়ে দিল্লিপ্রবাস কতরকম অবাক কাণ্ড ঘটে।
আমরা আছি সেই ভুঁয়েতেই, কালীমায়ের কালীক্ষেত্তর কলকাতাতেই
ছিটচন্দন পাতা কুড়োই একটার পর একটা, বুড়োই
শিশুবয়স যৌবনিয়া প্রৌঢ়ি এবং বার্ধক্য
বই-তরণী সাঁতার কাটি
পৃথ্বী মায়ের ভুবনডাঙ্গায়
নিত্যসূতন সুজ্জি ওঠে
সুজ্জি ডোবে
যখন তখন
জনম জনম
পার হয়ে যাই
আশ্চয্যের কৌটো খুলি
ভোমরা হয়ে নীল আকাশে জুটি
ছুটি ছুটি ছুটি
সাঁওতালি নাচ গরবা নাচে
চক্রঘুরণ
শঙ্খঘুরণ
পদ্মঘুরণ
ঘুরি
ছুটি ছুটি ছুটি

উড়ুউড়ু

বুঝিনে পুয়ার বুঝিনে ত্রিপদী
জলে ভেসে আসে ছন্দের নদী
যেমন ইচ্ছে বয়
ঢেউ তোলে ঢেউ ঢেউ ভাঙে ঢেউ

হেলে বেঁকে ছোটে হাঁটে চোষে মৌ
জাহাজ ডোবায় নৌকো ভাসায়
হয় নয় নয় হয়
জলস্তম্ভ ফেটে নৃসিংহ
কখনো কোঁকায় হংহো হংহো
কখনো অনলে গর্জন করে
বড়বা নলিনীলীনা
বারে বারে ঢেউ ঘুরে ফিরে আসে
মুখ চেয়ে পরিচিত হাসি হাসে
আড়চোখে চোখ রেখে দেখে নেয়
চিনেছি চিনেছি কি না
একটু একটু করে নদী ওঠে
একটু একটু করে পুটে ফোটে
অক্ষি নীলোৎপল
জাগে হিমালয় নড়ে হিমালয়
বাড়ে হিমালয় ওড়ে হিমালয়
সূর্য তাকায় আঙুলের ফাঁকে
জল করে ছলছল
পয়ঃপয়ারে ত্রিপদী উড়ুক
উড়ু উড়ু টলমল

শিকারি

বিজয়কুমার দত্ত

মহাকাশ-বিজ্ঞানীদের দূরবীক্ষণে নাকি দেখা গেছে
মঙ্গলগ্রহে প্রাণের স্পন্দন। প্রত্যাশার অস্ফুট কুঁড়িতে
ফুল ফুটিয়ে তাঁরা জানাচ্ছেন, ওই গ্রহে
জলের আভাস তাঁরা পেয়েছেন এখন।

পৃথিবীতে প্রত্যেকদিন চলছে প্রাণের বহ্নুৎসব —
বিস্ফোরণে মরছে মানুষ, ধ্বংস হচ্ছে জীবন

নষ্ট হচ্ছে পরমা প্রকৃতি, লুপ্ত হচ্ছে
চেনা ও অচেনা প্রজাতি।

মঙ্গলগ্রহে প্রাণের সাড়ায়, তবে কি এবার, হবে
জীবনের ভারসাম্যের নতুন তত্ত্ব? নাকি প্রতর্ক?
এই একুশ শতকেও সারা পৃথিবী জুড়ে
হত্যা ও ধ্বংসের মিছিল, এমন স্বচ্ছন্দ সহজ
এখন ভাবতেও ভয় করে। মানবপ্রজাতি কি
বিবর্তনের উলটোযাত্রায় একাই এগিয়ে যাবে
প্রগতি নিশান বাতাসে উড়িয়ে?

মঙ্গলগ্রহে প্রাণের স্পন্দন
আসলে আগামী হত্যাকারীদের, নতুন শিকার।

ডাক

মতি মুখোপাধ্যায়

আঠারোশো ন-সালে লামার্কে তাঁর ফিলজফিক জুওলজিতে
নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন
প্রয়োজনে জীবদেহে নতুন অঙ্গের উৎপত্তি
অথবা পুরোনো অঙ্গের অবলুপ্তি ঘটতে পারে
ক্রমাগত ব্যবহারে আসে অঙ্গের সবলতা
ক্রমাগত অব্যবহারে যেমন নিষ্ক্রিয়তা বা অবলুপ্তি
এভাবেই ক্রমে অভিব্যক্তির কারণে
ঘোড়ার অগ্রপদ যুদ্ধক্ষেত্র বা রেসকোর্সের উপযোগী হয়েছে।

বোধ করি শের শাহ্ তারো ঢের আগে
অশ্বচিন্তা থেকে প্রচলন করেছিলেন ঘোড়ার ডাকের
তারো আগে পায়রা নিয়ে যেত লাভলেটার
তারো আগে মহাকবি কালিদাস
ডাকবহনের নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন মেঘকে
হাল আমলের সুকান্ত নামে এক কবি
হাতে লণ্ঠন রাত-চরা রানারের কথা লিখেছেন।

জড় বা জীব এখন সকলেই পরিবহনে উপযোগী
এইমাত্র কানে মোবাইল নামে যন্ত্রটি ধরে

এইচ এসের যে-ছাত্রীটি রাস্তায় হাঁটছে
হাঁটতে হাঁটতে হাসছে
হাসতে হাসতে কথা বলছে
কথা বলতে বলতে রাস্তাকে বিছানা ভেবে লুটিয়ে পড়ছে
দোহাই, তাকে উন্মাদিনী ভাববেন না
হৃদয়ের ডাকের সহজ উত্তর সে খুঁজে পেয়েছে।

কষ্টিপাথর

খালেদা এদিব চৌধুরী

পাতায় রেখেছি হাত, তুমি সরে গেলে দূরে
কত দূরে, তার হিসেব জানি না
এই হাতে কষ্ট দানা বেঁধে আছে, এই চোখে শোক
মানুষ তাকায় নীল চোখে জীবনের বিষুবরেখায় —
আমাকে তো ডাকবে না, বলবে না কোনো কথা
যে-কথা ছিঁড়েই গেছে, জুড়ে গেছে, আত্মা আর তোমার শরীরে।
কী করে আকাঙ্ক্ষা করি — ভুল ভালোবাসা ছিল কি না
তাও তো জানি না — বলা হল না তোমাকে।
এই চোখ আজ অন্ধ —
এই হাত আজ কষ্টিপাথরের খণ্ড, এই হাত দাহ-জ্বালা
হাওয়ার ভেতর দিয়ে চলে যায় সুচবিদ্ধ অনুরাগ
কোনোদিন মুখ ফেরাবে না
কোনোদিন কুয়াশাও জমবে না আর
পাতাগুলো হয়ে যাবে প্রাণহীন
তোমার চোখের কোণে সেই কোন আদিকালে
দেখেছি আমার কনীনিকা
জানলে না তুমি কোনোদিন!
তোমার আদরমাখা হাত বাড়ালে না।
এখন শেষের বেলা করতলে কখনোই রাখবে না মুখ
আসবে না উদাসীন পথে
ঘাসের উপর দু-পা মেলে বসবে না আর কখনোই
ব্যাকুল তোমার হাত তুলে বলবে না —
— 'এখানে এখন আর কিছু নেই,
আমি তো অনন্ত কক্ষপথে বসে আছি তোমার আশায়।'

সে জানত না

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

জীবন ঘুরে মৃত্যুর কেমন স্বাদ
সে জানত না...
জাহাজের পুলকিত মাস্তুলকথা
সে শোনেনি...
কারো শুভ জন্মদিন সোমবার!
সে জানত না...

এসব জানে না তাই
গর্ভগৃহের দিকে যেতে চায়
সেই ম্রিয়মান প্রদীপময়
ঘরের কাছে নতজানু হতে চায়
গর্ভগৃহের গা-ছোঁয়া সেই অলিভগাছটা
আজো আছে;
তার পাশেই পরিণত ধ্বংসস্তূপ...
সে জানে না কোনদিকে যেতে হয়
সময়ের কোন নির্দেশে কোনদিকে
যেতে হয়...!

জন্ম ও মৃত্যুর তফাত সে জানে না
যেদিকে এই পৃথিবীর মানুষের
জন্মের মর্মরিত কষ্ট রক্তপাত
চলো! সে-দিকের যাত্রামঙ্গল পড়ি
চলো! পায়ে পায়ে সেদিকে এগোই!

দুটি কবিতা

গোবিন্দ গোস্বামী

প্রবাহের প্রতি

সাঁকোর ওপার থেকে আকাশ ডাকে
এপারেও খেয়া থেকে নিরুদ্দেশ
পরিচিত জলের হাতছানি
ঢেউগুলি মিশে আছে নক্ষত্রের নরম শরীরে

সবারই তো আলো হওয়ার কথা ছিল
কেউ বারণ শোনেনি
দু-আঙুলের ফাঁকে হলদে ধোঁয়ার দাগ
অভ্যাস ফিরে গেলেও
নির্বিকল্প বিছানায় ঘামের অস্বস্তি
দীর্ঘদিনের ব্যবহারে শিথিল অন্তর্বাস
ক্রমশ পরিচ্ছন্ন নামাবলী হয়ে
মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে মিশে যায়

এ-পর্যন্ত উপক্রমণিকা

আকাশ ছোঁওয়ার ইচ্ছে থাকলে
অনায়াসে সবার আঙুলে নীল রঙ লাগিয়ে দেওয়া যায়
একদম ঠিকঠাক ওপরে ওঠার পর
নীচে নেমে অনাময় নিকেতন ঘিরে দৃশ্যমান
মহার্ঘ শার্সির বুকে অন্তরঙ্গ জীবনের ছায়া

আনন্দমঞ্জিল

পরিত্যক্ত পোড়ো বাড়িটা
ভূতের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে প্রোমোটার
আগাছার জঙ্গলের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে
শ্বেতপাথরের ক্ষয়ে যাওয়া ধূসর শরীর
অস্পষ্ট অক্ষরে ম্লান 'আনন্দমঞ্জিল'
শরিকেরা শহুরে ঠিকানায় নিরুদ্দেশ
শেকড় নামানো বটের জটে
চামচিকে বাদুড়ের নিশ্চিন্ত বিহার
সাত পুরুষের বিত্ত-ভাবনার পরিণাম
পাইক বরকন্দাজ হাতিশাল আস্তাবল
ঝাড়লণ্ঠনের আলোর ধাঁধায়
মজলিশ-মহলের হাওয়ায় ভাসে বাইজির ঘুঙুর
পাশেই মজে যাওয়া নদীর পাঁকে বেওয়ারিশ কঙ্কাল
নেপথ্যের অন্ধকারে ভেসে ওঠে হাহাকার
হারানো ঐশ্বর্যের গোপন আর্তনাদ
মাটির গভীরে শ্যাওলা-ধরা ইটের দীর্ঘশ্বাসে জেগে ওঠে

প্রবীণ ঝাউয়ের পাতায় মর্মরিত বসন্তের গান
ক্লান্ত জ্যোৎস্নার প্লাবন পেরিয়ে
নষ্ট চাঁদের ধূসর ইতিহাস খুলে
পরিত্যক্ত পোড়ো বাড়িটা

আজ আকাশ ছুঁয়ে থাকা অন্য এক বারোয়ারি আনন্দমঞ্জিল

উদ্ভাসন

অর্চনা আচার্যচৌধুরী

বৈদ্যুতিক আলো নেই, টিমটিম লণ্ঠন জ্বলে।
হাতে ঘোরে রঙিন মদের গ্লাস, অগভীর অন্ধকার, বন্ধু চারজন —
উচ্ছ্বাসের আলোড়নে উচ্চকিত ঘরে,
একটি চুমুক শুধু, থেমে যায় মুহূর্তেই স্নায়ুদের গান।

নিভে যায় কোটি কোটি নক্ষত্রের ছায়াপথগুলো।
আমি কি করেছি পান লীথীর রক্তিম ঠাণ্ডা জল?
তবে কেন কুরে খায় বিস্মৃতির অমারাত্রি মস্তিষ্কের পেশি?
হারিয়ে ফেলেছি আমি সব কিছু, এমনকী জীবনের ছন্দের স্পন্দন।

আমার কোমর বুঝি জড়িয়ে ধরেছে কোনো পুরুষের রোমশ অভিজ্ঞ দুটি হাত।
কোন পথে যাই আমি, এ-জগৎ আমার অচেনা —
হঠাৎ উঠল জ্বলে আলো, জেগে ওঠে নারীসত্তা, জ্বলে উঠি আমি,
নিষিদ্ধ প্রেমের ছোঁয়া, ঘৃণায় সিঁটিয়ে ওঠে সচেতন মেয়ে।

বেদনায় মোচড়ায় আমার বুকের তন্ত্রীগুলো।
আমাকে তাড়িয়ে নেয় একটি অঙ্কুশ —
পাপের আগার থেকে মুক্ত হই এক ঝটকায়,
ভুলে যাই পরিপার্শ্ব, বাস্তবের জটিল আবর্তে ফিরে আসি।
মুছে ফেলি পাপবোধ, পরিশ্রুত হতে হতে হতে...
অবশেষে হয়ে যাই সুপবিত্র পারিজাত ফুল।

লীথী — গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী পাতালের নদী। অবগাহনে পূর্বস্মৃতি লোপ পায়।

একটা গল্প

অসীম সেনগুপ্ত

মাঠের আকাশ জুড়ে কুয়াশার গাঢ় আস্তরণ।
জানলার শার্সিতে আঁটা
ছেঁড়াখোঁড়া রঙিন কাগজে, শন শন শব্দ তুলে
শুকনো শীতের কিছু কনকনে হাওয়া
তুষার নেকড়ের মতো শুঁকে শুঁকে কি যেন খুঁজছে এলোমেলো সারা ঘরটায়।
নড়বড়ে কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে ভাঙাচোরা বৃদ্ধাটি
ধীরে ধীরে নেমে আসছে নীচে।
মনে মনে হেঁটে যাচ্ছে জেরুসালেমের পথ দিয়ে।
মাথায় শণের চুল,
কিছু দাঁত ঝরে গিয়ে তোবড়ানো গাল
সারা মুখে পড়া যাচ্ছে মৃত্যুর ঠিকানা।
ঝুলন্ত জামাটায় কত যে তালির চিহ্ন!
কোনোমতে হাড়গুলো ছুঁয়ে আছে।
কাচফাটা ল্যাম্প হাতে;
অনর্গল ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চিমনিটা কালো হয়ে গেছে।
অস্ফুট বিড়বিড়, মাঝে মাঝে অনুচ্চ দিব্যি ঈশ্বরের নামে।
রাস্তায় গাড়ির হর্ন, বাগানের অরচার্ডে খিলখিল হাসি;
দেয়ালের অন্যদিকে হাঁপানি রোগীর কণ্ঠে দম-ওঠা কাশি
কিছু লোক যে বেঁচে আছে এইটুকু নিশানাই তার।
আবছা আলোয় ঘরে অসংখ্য খাঁচার মধ্যে
অসংখ্য পাখির চোখে
ঘুম ঘুম খর অবসাদ।
ভাঙা জানলা দিয়ে অদূরেই দেখা যাচ্ছে
রেইনগাছের ডালে ঝুলে আছে
ডিসেম্বরের শীতে কুঁকড়ে থাকা বড়ো একটা তারা।
সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না
ল্যাম্প হাতে ঘুরে ঘুরে দেখে বৃদ্ধা।
ভেঙে-পড়া ক্লান্তিতে ভাগ্যকে গালি দেয়।
অতীত কবরে শুয়ে। ভবিষ্যতের প্রেত
দরজায় ওত পেতে আছে।
'ন্যাজারেথ ন্যাজারেথ...' কী যেন বলতে চায় বোঝাও যায় না।

বুকের মধ্য থেকে হামাগুড়ি দিয়ে
কী যেন আসছে উঠে গলার ভিতরে।
পাখি পোষা শখ তার। সব চেয়ে প্রাচীন পাখি বৃদ্ধা নিজেই।
কোনোমতে চুল্লিতে কাঠকুটো দিয়ে
হাঁটু গেড়ে বসল সে প্রার্থনার মতো
আগুনের স্নেহে চামড়ার নীচের হাড়গুলো
একটু তাপের স্বাদ পেতে না পেতেই
পৃথিবীর মতো একা বৃদ্ধাটি মারা গেল।

বলা আছে, পাশের বস্তি থেকে কাল ভোরে
জোসেফ হেমব্রম এসে
খাঁচা খুলে পাখিগুলো সব ছেড়ে দেবে।

বুদ্ধদেব বসুর মহাভারত-ভাবনা

অমিয় দেব

বুদ্ধদেব বসুর মহাভারত-ভাবনা

অমিয় দেব

বুদ্ধদেব বসুর শেষ সমাপ্ত গ্রন্থ *মহাভারতের কথা*। প্রথম বেরিয়েছিল *দেশ* পত্রিকায়, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের মধ্যচৈত্র থেকে ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের মধ্যশ্রাবণ পর্যন্ত আঠারো কিস্তিতে। বইতে অনেক পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়, বেরোয় ১৩৮১-র বৈশাখে, তাঁর মৃত্যুর (২ চৈত্র ১৩৮০ তথা ১৮ মার্চ ১৯৭৪) অব্যবহিত পরে। অবশ্য শেষ প্রুফ তিনিই দেখে গিয়েছিলেন, ভূমিকার তারিখ 'মার্চ ১৯৭৫'। ভূমিকায় বলেছিলেন এক দ্বিতীয় খণ্ডের পরিকল্পনা তাঁর আছে, যদিও জানেন না তা কবে লিখে উঠতে পারবেন। কী থাকতে যাচ্ছিল ওই দ্বিতীয় খণ্ডে তা এখন কেবল অনুমানই করা যেতে পারে। তবে অনুমানের ভিত্তি শুধু এই বই-ই নয়, মহাভারত-সংক্রান্ত আর যা যা লিখেছেন হয়তো তাও। বছর দেড়েক আগেই লিখেছিলেন কাব্যনাট্য 'সংক্রান্তি', ১৩৭৭-এর শারদীয় *দেশ*-এ বেরোয়, গ্রন্থভুক্ত হয় শ্রাবণ ১৩৮০-তে। তার আগে আরো দুই কাব্যনাট্য, 'প্রথম পার্থ', (১৯৬৯) ও 'অনাম্নী অঙ্গনা' (১৯৭০), প্রথম *দেশ*-এ ধারাবাহিক ছাপা, পরে এক মলাটে গ্রন্থিত। আর ১৩৭৫-এ বই হয়েছে *কালসন্ধ্যা*, লেখা ১৯৬৭-৬৮-তে, প্রথম আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত, ছাপা *দেশ*-এ ধারাবাহিকভাবে। ১৯৬৬-তে লেখা ও ছাপা *তপস্বী ও তরঙ্গিনী*-র কাহিনী মহাভারত থেকে নেওয়া হলেও ভারতকথার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ নেই, এই আলোচনায় তা আসবে না, যেমন আসবে না ১৯৬৮-তে লেখা তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থের শেষ রচনা, 'সাবিত্রীর জন্য কবিতা', যাকে নিয়ে তিনি গোড়ায় এক নাটক লেখার কথা ভেবেছিলেন। এই আলোচনা হবে অন্য চারটি কাব্যনাট্য নিয়ে। আর 'মহাভারতের কথা' তো আছেই।

ঘটনার কালক্রম অনুযায়ী কাব্যনাট্য চারটির ক্রম 'অনাম্নী অঙ্গনা', 'প্রথম পার্থ', 'সংক্রান্তি' ও 'কালসন্ধ্যা'। যদিও 'অনাম্নী অঙ্গনা' সংস্থাপিত কুরুক্ষেত্রের অনেক আগে, উৎস আদিপর্ব, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রাত্রিশেষের উক্তিতে সেই ভবিষ্যৎ নিহিত। কাহিনীটি আমাদের মনে রাখতে হবে। সত্যবতীর আজ্ঞা না মানতে পেরে নাচার অম্বিকা ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন, স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর এক দাসীকে তাঁরই বসনে-ভূষণে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর শয্যায় যেখানে সত্যবতীর কানীন পুত্র ব্যাসের আবির্ভাব হবে (ব্যাসের জন্মকথাও প্রসঙ্গক্রমে তাঁর বধূকে শুনিয়ে দিয়েছেন সত্যবতী — ঋষি ও ধীবরযুবতীর যে-কুয়াশাচ্ছন্ন মিলন একটু আগে লেখা [১৯৬৭-৬৮] উপন্যাস 'আয়নার মধ্যে একা'-তেও চিত্রিত হয়েছে)। ঋষি হয়তো ছলনা ধরতে পারবেন না ভেবেছিলেন অম্বিকা, কারণ তাঁর বিশ্বাস কোনো কোনো অবস্থাতে সব নারীই সমান। কিন্তু ছলনাতে রুষ্ট হলেন না সেই ত্রিকালজ্ঞ, বরং দাসীর সমর্পণে প্রীত হলেন। যাবার সময় বলে গেলেন:

'তোমার পুত্র হবে ধীমান, প্রাজ্ঞ,
নম্র, মৃদুভাষী, ধীর।
তুমি তার নাম দিয়ো বিদুর, কেননা বিদ্যা হবে তার স্বভাবসিদ্ধ।'

আরো বললেন:

ঘোর যুদ্ধ আসন্ন : তিনি নিজে থাকবেন দূরে,
আর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র — ঘটনাস্থলে উপস্থিত —
তবু থাকবে শান্ত, শান্তির সাধক, নির্লিপ্ত,
যেন সিন্ধুবিহারী হংস, তরঙ্গ যাকে সিক্ত করে না।

এই ভবিষ্য মাথায় পুরেই আমরা বুদ্ধদেব বসুর মহাভারত-ভাবনায় প্রবেশ করি। প্রসঙ্গত এটাও আমাদের খেয়াল থাকে যে শূদ্রাণী নিতান্তই যন্ত্র নয়, হয়ে-ওঠা চারিত্রও, হয়তো বা তার অবজ্ঞাত বর্ণে অসংকুচিত। রাজবধূ অম্বিকার শেষবাক্য:

মূর্খ! জানিস না,
মাতা যার শূদ্রাণী, আর পিতা বর্ণসংকর —
সেই পুত্র যত না পূর্ণাঙ্গ হোক,
অন্ধের চেয়েও, ক্লীবের চেয়েও
শতগুণে রাজা হবার অযোগ্য।

শুনে সে বলতে পারে:

রাজবধূ, আমি তা জানি।
এখানে মিলে গেছে ব্রাহ্মণের শাস্ত্র আর শূদ্রাণীর অভিলাষ।
আমি যদি ধীবরকন্যা সত্যবতী হতাম
তাহ'লে একবার যমুনার বুকে কুজ্ঝটিকায় আবৃত হবার পর,
একবার ব্যাসদেবকে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ ক'রে
আর-কিছু কাঙ্ক্ষনীয় আমার থাকতো না —
না ভরতবংশীয় রাজদণ্ডধারী স্বামী, না রাজত্ব, না অন্য কোনো সন্তান।

এই নাট্যপর্যায়ের শেষ রচনা (রচিত অবশ্য আগে) 'কালসন্ধ্যা'-র সমাপ্তি আমাদের মনে পড়ে যায়। মৌষলশেষে তাঁর অবোধিত বিপর্যয় ও ক্লান্তির মাথায় যখন অর্জুন পিতামহকে বিদায় জানিয়ে শ্লথচরণে বেরিয়ে গেলেন, তখন অর্জুনের 'চ'লে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে' ব্যাসদেব বলে উঠলেন:

এইসব কুশীলব — ক্ষণজীবী প্রাণের ফুৎকার,
একমাত্র অক্ষরেই নির্ধারিত এদের উদ্ধার।

পরবর্তী মঞ্চনির্দেশও কম জরুরি নয়।

[ব্যাসদেব আবার আসীন হ'য়ে পুঁথিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে, লেখনী তুলে নিলেন।

মঞ্চে আলো ম্লান হ'য়ে এলো। রচনায় নিবিষ্ট ব্যাসদেবকে কিছুক্ষণ দেখতে পাচ্ছি
আমরা — কোনো শিলাখণ্ডের মতো অস্পষ্ট ও স্থির। ধীরে যবনিকা নামলো।]

দ্যুমেজিল-বিয়ার্দোরা অবশ্যই আপত্তি তুলবেন। শ্রুতির এই লেখ্যতাকে তাদের মনে হবে অপৌরাণিক, কিঞ্চিদধিক আধুনিক। *মহাভারতের কথা*-র এক আলোচনায় পুরাণবেত্তা রবের আঁতোয়ান, এস.জে. মজা করে ওই অপ্রতিরোধ্য গ্রন্থকে বলেছিলেন, যুধিষ্ঠির লিখিত বুদ্ধদেব বসুর জীবন। উদাহরণ নিয়েছিলেন ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াকের যীশুজীবনীর বিদূষণ, 'যীশু কথিত ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াকের জীবনকাহিনী' থেকে। মজা করলেও হয়তো শেষপর্যন্ত রবের আঁতোয়ান ভুল বলেননি, মহাভারতকে দূর পুরাকালে ন্যস্ত না করে আপন বীক্ষায় উপন্যস্তই করছিলেন বুদ্ধদেব বসু। পুরাণের যে-সংজ্ঞার্থ তিনি শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন তা সেই ঋগ্বেদের (১.৯২.১০) 'পুনঃপুনর্জায়মানা পুরাণী সমানং বর্ণমভি শুম্ভমানা', যার নিকটতর অনুবাদ তাঁর প্রস্তাবে 'পুনঃ পুনঃ নবজাত, নিত্য সমরূপা ও বর্ণের দ্বারা অলংকৃতা' (রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ : 'পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত, নিত্য, এবং একরূপধারিণী')। প্রকারান্তরে তিনি মহাভারত নতুন করে পড়বার যৌক্তিকতা প্রচার করছেন। আর আমাদের তো মনেই আছে *মহাভারতের কথা*-র শিরোভাগের সেই উদ্ধৃতি:

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥

কোনো-কোনো কবি এই ইতিহাস পৃথিবীতে পূর্বে বলেছিলেন,
কেউ-কেউ সম্প্রতি বলছেন, ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন।

শ্রুতির ভবিষ্যৎ যদি দ্রৌপদীর শাড়ির মতো অন্তহীন হয়, ক্ষতি কী! বিশুদ্ধ মহাভারত আমরা নতুন করে না শুনি, মহাভারতের বেশে বুদ্ধদেব বসু তো শুনব। ভূমিকায়, তাঁর সকল গবেষণা সত্ত্বেও, তিনি জানিয়েছিলেন, 'আমি পণ্ডিত নই, প্রেমিকমাত্র; এই আলোচনা এক রসভোক্তার আনন্দবোধের নিঃসরণ।' আর এই আনন্দবোধ যে অন্যভাবেও ফলবতী হয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো ওই নাট্যচতুষ্টয় যার মাত্রা কুরুক্ষেত্র, প্রথমটিতে দূরবর্তী হলেও অনিবার্য ভবিষ্যৎ এবং শেষটিতে সদ্য অতীত।

তবে এই নবজন্ম যে 'প্রগতি' পর্যায়ের পুরাণের পুনর্জন্ম থেকে খানিক ভিন্ন তা বলা বাহুল্য। পুরাণকে সেখানে নতুন পোশাকে পরিবেশন করা হচ্ছিল, বুদ্ধদেব বসুর এই মহাভারত-ভাবনা তা নয়। বরং পুরাণের চাপে অধুনা দৃশ্যত ঈষৎ ধ্রুপদী হয়ে উঠছে। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় এসেছে তৎসমের যাথার্থ্যপ্রবণতা, যদিও তার স্বাচ্ছন্দ্য সে হারায়নি। নেই সেই প্রথম পর্বের পুনরুক্তি, হালকা চালে ঢেউ তুলতে তুলতে এগোনো। যদি কেউ বলে তিনি যেমন পুরাণকে আত্মস্থ করছেন তেমনি পুরাণও তাঁকে কিছুটা আত্মস্থ করে নিচ্ছে, খুব ভুল বলবে না। বিস্রস্ত ও ধ্বংসপরায়ণ দ্বারকার ছবি নানাভাবে ফুটিয়ে তুলতে তুলতে এক জায়গায় এক প্রহরীকে দিয়ে আরেক প্রহরীকে বলানো হচ্ছে:

শিখে নে, শিখে নে, শিখে নে
সার্থক কেন নরজন্ম।
চেষ্টা, পরিশ্রম, অর্জনে উদ্যম
এ তো শুধু দুঃখেরই উৎস।
নিষ্ঠা ও সংযম, ভক্তি ও কৃচ্ছ্র
অমিশ্র দুঃখেরই উৎস।
আনন্দ আছে শুধু অজ্ঞান জন্তুর,
জীবজন্মের সার মাধ্বী ও শিশ্ন,
অতএব বল দেখি কী বা তায় এসে যায়
আছেন বা নেই তোর কৃষ্ণ?

কিংবা 'প্রথম পার্থে'র গোড়ায় এক বৃদ্ধের মুখে শুনি আমরা, আসন্ন কুরুক্ষেত্রের অবতরণিকা:

আজ সেই দিন, আমরা যার অপেক্ষায় ছিলাম এতকাল:
অঘ্রান মাস, তিথি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী।
দুপুর পেরিয়ে গেলো, সূর্য নামে পশ্চিমে।
ধীরে, সূর্যদেব, ধীরে,
আজ ত্বরা করবেন না,
আজ বিলম্বিত হোক আপনার সান্ধ্য স্নান।
সময় দিন, আমাদের সময় দিন,
আমরা উৎকণ্ঠিত, আমাদের সময় দিন:
কেননা আজ সূর্যাস্তের আগে এক বিশাল
সিদ্ধান্ত নেবেন নেতারা : কুরুকুল ধ্বংস হবে না রক্ষা পাবে,
নারীকণ্ঠে ক্রন্দনরোল উঠবে কিনা,
মাতবে কিনা মহোৎসবে শেয়াল-কুকুর হস্তিনাপুরে—
সেই সিদ্ধান্ত।
আমি তা-ই শুনেছি, কিন্তু ঠিক জানি না।

একটু পরেই, অন্য বৃদ্ধের মুখে:

কেউ বলে দর্পিত দুর্যোধন দায়ী,
কেউ দোষ দেয় দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠিরকে,
কেউ বলে কৃষ্ণ বিশ্বাসযোগ্য নন; —
আমরা কিছু জানি না। শুধু ভাবি :
যে-দেশে আছেন ভীষ্মের মতো জ্ঞানী, বিদুরের মতো সাধু,
আর গান্ধারীর মতো সত্যদর্শিনী, সেখানেও কেন যুদ্ধ?

একই বংশ, একই রক্ত শিরায়, একই পিতামহ,
এক স্বার্থ, এক জন্মভূমি, ভ্রাতৃব্যেরা সকলেই ধর্মজ্ঞ —
তবু দ্বন্দ্ব কেন?
সমাধানের কোনো উপায় কি নেই — অস্ত্র ছাড়া?
বিতর্কের কোনো উত্তর কি নেই — রক্তপাত ছাড়া?
কেউ কি নেই, যিনি শেষ মুহূর্তে মিলিয়ে দিতে পারেন
গান্ধারীর শতপুত্র ও পঞ্চপাণ্ডবকে
যারা ছেলেবেলায় খেলা করেছে একসঙ্গে, এক অন্ন খেয়ে?

শুধু যে ভাষারই উদাহরণ আমি দিচ্ছি তা নয়, ভাবেরও উদাহরণ দিচ্ছি। এই নাটক উদ্যোগপর্বের এক তুঙ্গ মুহূর্তকে ঘিরে তৈরি হয়েছে, বিষয়, যুদ্ধ কি অনিবার্য, নাকি এখনও আছে নিবারণের উপায়! উদ্যোগের কথা ভাবতে গিয়ে ফরাসি জিরোদু-র এক নাটকের কথা আমার একবার মনে হয়েছিল, নাম, 'ট্রয়ের যুদ্ধ হতে যাচ্ছে না' — বেদনা-বোঝাই ব্যঙ্গ, কারণ ট্রয়ের যুদ্ধ তো হচ্ছেই, কে ঠেকাবে! কুরুক্ষেত্র কি ঠেকানো যেত, কোনো যুদ্ধই কি ঠেকানো যায় — এমন প্রশ্ন কি বুদ্ধদেব বসুর মনে! নেয়া যাক কর্ণকে। কর্ণ কি ঠেকাতে পারেন না! বৃদ্ধেরা বলছেন, নিজেদের বলছেন, বলছেন আমাদেরও:

এ-মুহূর্তে তাঁরই উপর নির্ভর—
কুরুকুল ধ্বংস হবে, না রক্ষা পাবে,
রাঙবে কিনা ক্ষত্রশোণিতে কুরুক্ষেত্র,
যুদ্ধ হবে — কি হবে না।

কেননা তিনি কুরুপক্ষের স্তম্ভস্বরূপ,
অথচ কুরুবংশের অনাত্মীয়,
কুন্তী, মাদ্রী বা গান্ধারীর গর্ভজাত নন;
তাই ধর্মত
তিনি পারেন যুদ্ধ থেকে স'রে দাঁড়াতে;
আর তিনি স'রে দাঁড়ালে
দুর্যোধনেরও রণস্পৃহা নিস্তেজ হবে —
অন্তত আমার তা-ই ধারণা।

আর তাই এই নাটক, প্রথম পার্থের কাছে তিন পর্যায়ক্রমী দৌত্য — কুন্তীর (তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, এসো পাণ্ডবপক্ষে), দ্রৌপদীর (তুমি বন্ধু হও আমার, কুরুবংশের কেউ নও, এ-যুদ্ধে কী লাভ তোমার), কৃষ্ণের (তুমি পাণ্ডব বলে নয়, ভ্রাতৃহত্যার কারণে নয়, মানুষের মঙ্গলের জন্য, সরে দাঁড়াও); আর তিন দৌত্যই অমোঘভাবে ব্যর্থ। যুদ্ধ হবেই। দ্বিতীয় দৌত্যের

ব্যর্থতার পর অর্থাৎ দ্রৌপদীর প্রস্থানের পর, দুই বৃদ্ধের উদ্বেগ তীব্র হয়ে উঠছে : প্রাচীন গ্রিক নাটকে যাকে স্টিকোমিথিয়া বলা হত, বাক্যের পিঠে বাক্য, প্রায় সেই রকম শুনি আমরা:

১. সূর্য আরো পশ্চিমে।
২. বেলা প'ড়ে এলো।
১. পাঞ্চালী সুবচন বললেন।
২. পাঞ্চালী যুদ্ধ চান।
১. কর্ণ সুবচন বললেন।
২. কিন্তু কর্ণ অটল।
১. তিনি জয় চান না। তবু যোগ দেবেন যুদ্ধে।
২. যদি যুদ্ধ হয়।
১. হবেই।
২. হবেই?
১. পাঞ্চালী তা-ই বললেন না?
২. পাঞ্চালী তা-ই বললেন?
১. আমরা উদ্‌ভ্রান্ত।
২. কে যেন আসছেন।
১. কেউ আসছেন?
২. মনে হয়, কৃষ্ণ।
১. কৃষ্ণ? এবার তবে সমাধান।
২. কী-সমাধান?...
১. জানি না। হয়তো সবই স্থির হ'য়ে গেছে।
কিন্তু আমরা জানি না।
২. কৃষ্ণ জানেন?
১. হয়তো যা হবার তা আগেই হ'য়ে গেছে।
কিন্তু আমরা জানি না।
২. কৃষ্ণ জানেন?
১. তাও জানি না। আমরা উদ্‌ভ্রান্ত।

'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'-এর উত্তরাধিকারী এই নাটক কোনো সময়চিহ্ন ধারণ করে নেই তা বললে বোধহয় একটু ভুল হবে। বুদ্ধদেব বসু বিশ্ব-রাজনীতি নিয়ে হইচই করতেন না সত্য, কিন্তু একেবারে ওয়াকিবহাল ছিলেন না, তা বোধহয় নয়। কেন এই কুরুক্ষেত্র সন্নিকট মুহূর্তে দুই বৃদ্ধকে দিয়ে প্রহর গণিয়ে নিচ্ছেন, হস্তিনাপুরের দুই ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞা, সাধারণ্যের প্রতিভূ, রাজন্য থেকে একান্ত দূরবর্তী! যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন রাজন্য, যুদ্ধের অন্তিম ভুক্তভোগী সাধারণ্য। বিশ শতকের ষাটে-সত্তরে মহাভারতের ক্ষত্রকুলের সমধর্মা ঠিক কারা ছিলেন তা বোধকরি খুব

জরুরি নয়, কিন্তু জরুরি এই যে সাধারণ্য যুদ্ধ চায় না। আর এ-দুয়ের ভেদ বিপুল। কোন কর্ণ কোন কুন্তী কোন দ্রৌপদী কোন কৃষ্ণ শুনবেন এই দুই বৃদ্ধের কথা, কিন্তু এঁরা না-থাকলে তো মঞ্চ অচল। হোমারের-চতুর্থ ইলিয়াডের সেই স্বেচ্ছাচারী দেবসভা কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে জিরোদুদের ভাবনা মথিত করে তোলেনি! জেয়ুস বললেন, পারিস-মেনেলাউস দ্বন্দ্বযুদ্ধে তো মেনেলাউস জিতলেন, কারণ প্রথম লড়াইয়ের পরেই পারিস উধাও (আফ্রোদিতে তাঁকে অলক্ষ্যে উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন), অতএব হেলেনকে প্রত্যর্পণ করা হোক (সেই ছিল পারিস-মেনেলাউস দ্বন্দ্বযুদ্ধ তথা যুদ্ধবিরতির শর্ত), ট্রয় বাঁচুক। হেরা-আথেনার তীব্র আপত্তি। ট্রয়কে পুড়তেই হবে। শেষপর্যন্ত, বিরক্তিসত্ত্বেও, রাজি হলেন জেয়ুস, কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিতে যে হেরার প্রিয় কোনো নগর বা জনপদ যখন জেয়ুস ধ্বংস করতে চাইবেন, তখন যেন হেরা বাধা না দেন। যুদ্ধ বন্ধ ছিল কিছুক্ষণের জন্য, দেবগণের প্ররোচনায় তা আবার নতুন করে শুরু হয়ে গেল। আর বিরাম নেই, আকিলেউসের হাতে হেক্তোরের নিধন পর্যন্ত অব্যাহত ইলিয়ড। আমাদের দুই বৃদ্ধ নাটকে শেষ করছেন এই বলে যে:

কর্ণ বেছে নিলেন মহত্ত্ব, তাঁর মৃত্যুর মূল্যেও।
তাই আরম্ভ হবে মহাযুদ্ধ, কাল সূর্যোদয়ে।
— মাতা কুন্তী, কেন তোমার প্রথম পুত্রকে ত্যাগ করেছিলে?

কেউ-কেউ কামনা করেন মহত্ত্ব — মৃত্যুর মূল্যেও।
মানি, তাঁরা শ্রদ্ধেয়। কিন্তু আমি তাদের ভয় করি।
আমি বলি, তারাই ধন্য, যারা সাধারণ,
যাদের চরম লক্ষ্য সহজ সুখ, সাংসারিক তৃপ্তি —
তাদেরই জন্য মানব-বংশ আবহমান।

প্রায় একই সুর আমরা শুনে এসেছি 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'-র গাঁয়ের মেয়েদের কথায় যখন অঙ্গদেশ খরার দাপটে মুমূর্ষু।

দুঃখ আমাদের মুখরা ননদিনী, মৃত্যু আমাদের পূজ্য ব্রাহ্মণ,
তবু তো ভালো কিছু জেনেছি সংসারে, জেনেছি দেবতারা বন্ধু —
যেহেতু ফ'লে ওঠে সোনালি ধান আর সোনার সন্তান মায়ের কোলে,
এবং অগ্নি ও জলের মিতালিতে অমৃতস্বাদ পায় অন্ন।

আর এরই অন্য মাত্রা শুনি নাটকশেষে রাজপুরোহিতের বচনে:

মুক্ত হ'লো স্রোতস্বিনী, অঙ্গদেশ রজস্বল,
পুত্র এলো স্বরাজ্যে, পূর্ণ হ'লো প্রতীক্ষা;
শান্তার পতি অংশুমান, যেমন সত্যবতীর শান্তনু
উৎসব করো জনগণ, ধ্বনিত হোক জয়কার।

'প্রথম পার্থ'-তে কুরুক্ষেত্র শুরু, 'সংক্রান্তি'-তে কুরুক্ষেত্র শেষ। দুটি নাটক একযোগে দেখলে বা পড়লে বুদ্ধদেব বসুর মহাভারত-ভাবনার এক মূল সূত্র মেলে। 'প্রথম পার্থ' যেমন 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'-এর, তেমনি 'সংক্রান্তি' উত্তরাধিকারী 'গান্ধারীর আবেদন'-এর। কিন্তু আর আবেদন নয়, এখন একদিকে অভিযোগ অন্যদিকে মাতৃস্নেহ।

যুদ্ধ অন্যায়, যুদ্ধ নিবারণীয়।
কিন্তু একবার আরম্ভ হ'লে
পাপ থেকে জ্ব'লে ওঠে পাপ,
ছড়িয়ে পড়ে হিংসা থেকে প্রতিহিংসা,
চিত্তভ্রংশ থেকে চিত্তভ্রংশ —
অপরাধহীন কেউ থাকে না।
কিন্তু কেন যুদ্ধ, কেন এই পরিকীর্ণ সন্তাপ?...
তখনও সময় ছিলো, মহারাজ, তখনও সম্ভব ছিলো —
কেন উপেক্ষা করলে
তোমার ভ্রাতার মঙ্গলবাক্য — দাসীপুত্র মহাত্মা সেই বিদুর,
যিনি ভীষ্মের মতোই কুরুবংশের বন্ধু?
কেন কর্ণপাত করলে না
শতপুত্রের জননী, শতগুণে শঙ্কিতা,
তোমার হিতৈষিণী প্রণয়িনী পত্নীর ভর্ৎসনায় — প্রার্থনায়?...
এখন ভাবছো কোনো দেবতা তাকে রক্ষা করবেন?
মূঢ় পিতা, এখনো তুমি অন্ধ!

কিন্তু স্নেহান্ধ পিতা এখনও আশা করছেন জয়ের। ন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধন অপরাজেয়, কিন্তু তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রেরা যদি আরো একবার অন্যায়যুদ্ধে লিপ্ত হয়! কৃষ্ণকে তো বিশ্বাস নেই, এমনকী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও তো সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। এই অষ্টাদশ দিবসের সূচনাতেই তাঁর চক্ষুষ্মান কথক সঞ্জয়কে তিনি বলেছিলেন:

মহান আদর্শ! ধর্মরাজ্য!
তুমিও তা-ই বলো, সঞ্জয়?...
কূটনীতি নয়, সতর্কতা নয়,
আমি তোমার কাছে সরল সত্য শুনতে চাই।
শাস্ত্র ছেড়ে দিয়ে, তত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে —
যেমন বন্ধু কথা বলে বন্ধুর সঙ্গে,
বা পতির সঙ্গে রহস্যালাপে কান্তা,
তেমনি ক'রে
বলো আমাকে, সঞ্জয়,

তোমার কি মনে হয় কুরুক্ষেত্র
ধর্মক্ষেত্র, এই যুদ্ধ
ধর্মযুদ্ধ?

যেন নিজের প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিচ্ছেন, যখন আরো এক অন্যায় যুদ্ধের অবসানে দুর্যোধন দ্বৈপায়নতীরে মুমূর্ষু — এবং এই চিত্র তাঁর আর গান্ধারীর কাছে প্রতিভাত হয়ে উঠল সঞ্জয়ের দৃষ্টিতে:

বনে, নির্জনে — যেখানেই যাও,
আছে জন্ম, জীবন, জীবনের শৃঙ্খল।
শিশুরাও নিষ্পাপ নয়, গান্ধারী।
মাতার স্তন্যে সংক্রমিত হয় পাপ,
পৃথিবীর অন্নে পুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
সব কর্মে পাপ, সব ধর্মাচরণে পাপ —
দুর্যোধন আর যুধিষ্ঠিরে কোনো ভেদ নেই।

পুত্রশোকে আর্ত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র ও সত্যদর্শিনী কিন্তু পুত্রস্নেহে কাতর গান্ধারীই কুরুক্ষেত্রের শেষ সাক্ষী, তাঁদের উপর দিয়েই বয়ে যাচ্ছে এর মৃত্যুস্রোত, তাঁরাই আক্রান্ত এর অমানুষিতায়। আর এই সংক্রান্তিই যখন ছত্রিশ বছর পরে, গান্ধারীর অভিশাপেই হোক বা কৃষ্ণকথিত কালপর্যায়েই হোক, দ্বারকায় কালসন্ধ্যা হয়ে নামল, তার সাক্ষী হলেন কৃষ্ণপত্নী সত্যভামা ও অর্জুনপত্নী সুভদ্রা, দুই নারী যাঁরা প্লাবন পেরিয়ে হবেন উদ্ধাস্তু। 'কালসন্ধ্যা' নাটকজোড়া আছে এক ত্বরা, কুরুক্ষেত্রের আঠারো দিন এখানে এক দিবসেই সাঙ্গ। তার উপর ওই সর্বৈব ধ্বংসের এক প্রকরণরূপে, সত্যভামা ও সুভদ্রার চোখের উপর ঘটে চলেছে বেলেল্লাপনা ও বিশৃঙ্খলা, মধ্যদিনে সূর্যাস্তের সব পূর্বলক্ষণ। আর তাঁদের উদ্ধার, কৃষ্ণ যখন এলেন তখন তাঁর মুখ থেকে শোনা গেল:

এও নিয়মের অংশ, আদিষ্ট, অলঙ্ঘনীয়,
আঘাতের প্রত্যাঘাত, ধ্বনিজাত প্রতিধ্বনি,
লোষ্ট্রাহত জলের কম্পন শুধু।
জেনো, যাঁরা ছিলেন বিশ্রুত বীর, তাঁরা অনাবশ্যক এখন,
তাই প্রত্যাহৃত।
জেনো, এই ধ্বংস — এও ভালো। এরই সংযোজনে
ফিরে এলো বৃত্তবিন্দু, পূর্ণ হলো কালের ঘূর্ণন।

এ তো সুভদ্রা-সত্যভামাকে বলা। তাঁদের শোক এতে দূর হবার নয়। তাঁরা আমাদের পুরজনেরই সামিল, মৃত্যু নয়, কালপর্যায় নয়, জীবনই তাঁদের প্রত্যাশা। কিন্তু অর্জুন, গাণ্ডীবধন্বা, খাণ্ডবদাহন থেকেই কৃষ্ণের সখা, কুরুক্ষেত্রে নিত্যসঙ্গী, নরনারায়ণ যুগলের এক — তিনি কি

বুঝতে পারলেন যখন প্রায় গীতার স্বর শোনা গেল কৃষ্ণের মুখে, 'যা আছে, তা চিরকাল ধ্বংসের অতীত,/যা নেই, তা কখনো ছিলো না'? না। আর যখন হস্তিনার পথে যাদবরমণী-শিশু-বৃদ্ধ-পরিজন ও স্বর্ণমাণিক্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হলেন দস্যুদের হাত থেকে, তখন পরিতাপ ছাড়া আর কোনো সম্বল রইল না তাঁর : 'যাকে সারাজীবন জেনেছি আমি "আমি" ব'লে/ সে কি তবে পরিত্যাজ্য নিঃসার নির্মোক,/ অথবা পুত্তলিমাত্র — চালিত, অজ্ঞান,/স্বেচ্ছাচারী দেবতার হাতের পুত্তলি?' একমাত্র ত্রিকালজ্ঞ ব্যাসের কাছেই আছে তাঁর এই অবোধ সংশয়ের উত্তর : 'সব দেবতার দান। তুমি পেয়েছিলে/প্রচুর, অপরিমাণ, মানবের প্রাপ্যের অধিক। /তার মূল্য দিতে হবে।/...তুমি, পার্থ, কখনো হবে না প্রাজ্ঞ। তবু শেখো/অন্তত বিনয়, দৈন্য, আত্মসমর্পণ। ... জেনো, আজ এক বৃত্ত পূর্ণ হ'লো, অন্য এক বৃত্ত এর পরে —/ হয়তো বা আরব্ধ এখনই।'

এই যে একের পর এক বুদ্ধদেব বসু উদ্ধৃত করছি তার কারণ দুটো। এক, বুদ্ধদেব বসু আর তেমন পঠিত নন এখন, যদিও ওঁর কাব্যনাট্য কোনো কোনোটির এখনো অভিনয় হয়। তাই তাঁর শব্দসম্ভার, ধ্বনিমাধুর্য ও ছন্দসৌকর্য আমি সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আর দুই, এতে তাঁর মহাভারত-বীক্ষা হয়তো প্রত্যক্ষতর হয়ে উঠছে। অন্তত পুরাণ তাঁর কাছে কী, তার খানিক দিশা পাচ্ছি। পুরাণ শুধু তার আপন দেশকাল বা ভূমিলগ্ন হয়েই নেই, তার দ্যোতনা কালান্তরে-দেশান্তরেও ছড়িয়ে দিচ্ছে এই দিশা। *মহাভারতের কথা* আলোচনা করতে বসে এই পুরাণ ব্যাখ্যানকে যে রবের আঁতোয়ান, এস.জে.-র খানিক ব্যক্তিগত মতে হয়েছিল, তার কারণই তাই। পুরাণবেত্তাদের কাছে পুরাণ তার সৃষ্টিকালীন কৌম বিশ্বাসের আধার, প্রতীকসম্ভব আখ্যানমাত্র নয়। সেই বিশ্বাসে ব্রতী নন বুদ্ধদেব বসু, তাঁর প্রবণতা প্রতীকের দিকে। সুতরাং ধর্মের জয় তথা অধর্মের পরাজয়, এমন কোনো দ্বৈতসিদ্ধির সাক্ষাৎ আমরা তাঁর মহাভারত ভাবনায় পাব না। অন্যদিকে পুরাণকে পুরো ইতিহাসের আধার হিসেবে ভাবতেও তিনি রাজি নন, রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' তাঁর চিন্তার একাংশ-প্রেরণা জোগায় বটে, কিন্তু তার সূত্র ধরে তিনি বৌদ্ধোত্তর হিন্দু রক্ষণশীলতার মর্মোদ্ধার করতে বসেননি। আর ইরাবতী কার্ভের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে বটে, কিন্তু খুব পদ্ধতির মিল নেই তাঁর সঙ্গে। তিনি পুরাণবেত্তা নন, ঐতিহাসিক নন, নৃতাত্ত্বিকও নন, মহাভারত তিনি পড়ছেন এক মহাগ্রন্থ হিসেবে (এবং তাতে যা আছে তার সবই তিনি পড়ছেন, কোনো বীরগাথার পশ্চাদ্ধাবন করে এদিক-ওদিক কর্তন করছেন না)। আমি জোর দিতে চাই পড়ছেন কথাটার উপর, যেভাবে তিনি অন্য মহৎ রচনা পড়েন সেভাবেই পড়ছেন। তাই তিনি কেবল তুলনা করতে গিয়ে অন্য ইন্দো-য়োরোপীয় বীরগাথা হোমারের কথাই ভাবেন না, তলস্তয়-গ্যেটের কথাও ভাবেন। তিনি মহাভারত পাঠক, আর পড়তে পড়তে অন্য অনেক পাঠের স্মৃতি তাঁর মনে কাজ করে যায়। রাম আসেন, বোধিসত্ত্ব আসেন, এমনকী 'চার অধ্যায়'-এর অন্তর কথাও তাঁর মনে পড়ে। রবের আঁতোয়ান এস.জে.-র পাশাপাশি সুবীর রায়চৌধুরীও আলোচনা করেছিলেন 'মহাভারতের কথা' নিয়ে, তাঁর মনে হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর কাছে মহাভারত উপন্যাসোপম। বইটিকে অনেকেই বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কৃতি বলে ভাবেন, অন্তত একসময়

ভেবেছিলেন। তা এই হিসেবেই নয় যে মহাভারত-চর্চায় এক অভিনব সংযোজন ঘটল, এই হিসেবেও যে সারাজীবন ধরে তাঁর মানসে যে-কথা গুঞ্জরিত হচ্ছিল এই বইতে তার চরম প্রকাশ ঘটল। এমন হতেও পারে যে পুরাবিদ্যায় বা মহাভারত-চর্চায় বুদ্ধদেব বসুর কোনো বড়ো স্থান রইল না, কিন্তু এই বইয়ের মূল্য তাতে বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে না।

তাঁর কাব্যনাট্য চারটিতে ('তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নিয়ে, আগেই বলেছি, আলোচনা করছি না) অনেকেই আছেন — ব্যাস, সম্ভাবনা হয়ে হলেও বিদুর, আর বিদুরের সম্ভাবনাসূত্রে সত্যবতী-অম্বিকা ও সেই নামহীন দাসী যে বিদুরকে গর্ভে ধারণ করেছিল, আছেন কর্ণ, কুন্তী, দ্রৌপদী ও কৃষ্ণ; আছেন ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী ও কুরুক্ষেত্র-কথক সূত সঞ্জয় আর অপ্রত্যক্ষ হলেও চিত্ররূপী দুর্যোধন, আছেন সত্যভামা-সুভদ্রা, কৃষ্ণ-অর্জুন ও ব্যাস আবার, কিন্তু এখানে-ওখানে উল্লেখ সত্ত্বেও একজন নেই, তিনি যুধিষ্ঠির। একসময়, কাব্যনাট্য পর্যায়ের আগে, তাঁর ভাবনায় কখনও কখনও উঁকি দিয়েছেন অর্জুন। ১৯৫০-এ 'অসম্ভবের গান' একদা তাঁর প্রিয় ছিল, কবিসভায় তাঁর মুখে দু-একবার শুনেছি বলেও মনে পড়ছে। অর্জুন তাতে এক অভিজ্ঞতাবিকাশী ভাবোদ্দীপক 'মুখোশ'। অবশ্য প্রতিতুলনায় যুধিষ্ঠিরও আছেন, কিন্তু ঈষৎ একমাত্রিক; অর্জুনেই সত্তা সমর্পিত : 'বৃথাই জপিয়েছি তোমারে মন,/থামাও অস্থির ট্যাঁচামেচি। /কোথায় অর্জুন! কোথায় কামরূপ!/এক বসন্তেই শূন্য তূণ।' এ যে 'দ্রৌপদীর শাড়ি'-র মতো এক নিতান্ত প্রতীক নয়, তা বলা বাহুল্য। ১৯৫৪-য় লেখা 'শিল্পীর উত্তর' আদ্যন্ত আর্জুনীয়। 'আমি কে তা মনে রেখো'-তে শুরু করে অর্জুন-কৃতি/অকৃতির সবকটি চিহ্ন ধারণ করে নিয়েছে কবিতাটি — বিষাদযোগ বাদ নয় ('শুনেছি অমৃতকণ্ঠে প্রতিপন্ন নিয়মের গান') — আর শেষ হচ্ছে এমন এক বোধে যা আর অর্জুনে পরে দেখতে পাবেন না বুদ্ধদেব বসু (সাযুজ্যের সংকট তাকে বলি বা না-ই বলি):

সব সত্য। — কিন্তু সেই প্রতারক, সমর্থ সজ্ঞান,
সাক্ষাৎ ঈশ্বর যদি বেছে নেন উত্তরচরিতে
তুচ্ছ ব্যাধের তীর, তবে আর কোন গুপ্ত ঋতে
গাণ্ডীবের অবিচ্ছেদ ব্যবসায়ে পূর্ণ থাকে ঋণ?
সারথি নিস্পৃহ যবে, সেইক্ষণে নিঃশেষ অর্জুন।

তাঁর কাব্যনাট্য-পর্যায়ে যুধিষ্ঠির নেই, কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর ভাবনা কি সেইদিকেই বইছে না! 'কালসন্ধ্যা'-য় কৃষ্ণের কথা কিছুই বুঝতে পারেননি অর্জুন, কিন্তু তা যখন যুধিষ্ঠিরকে এসে বলবেন, যুধিষ্ঠির সব বুঝবেন এবং মহাপ্রস্থানের আয়োজন করবেন। অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের এই বৈপরীত্য যে তাঁর মহাভারত ভাবনার এক মূল হতে যাচ্ছে তাতে বোধকরি সন্দেহ নেই। সুজিত মুখোপাধ্যায় 'মহাভারতের কথা'-র ইংরেজি অনুবাদের নাম রেখেছেন 'দি বুক অব যুধিষ্ঠির' — যা বুদ্ধদেব বসুর অভিপ্রায়-সংগত, কারণ শেষ বিচারে 'মহাভারতের কথা' যুধিষ্ঠির-পুঁথিই। কিন্তু তা আপ্ত নয়, আপন বিচারে তাতে পৌঁছেছেন তিনি। আমাদের মনে আছে তিনি বই শুরু করেছেন 'বনবাসের শেষ দিন'-এর কাহিনীতে, সেই অরণিকাষ্ঠ হরণ,

সেই অন্বেষণ, সেই পিপাসা, তন্‌নিবারণী উদকের খোঁজ, সেই সরোবর ও আজ্ঞালঙ্ঘনহেতু পরপর চার ভ্রাতার মৃত্যু, যুধিষ্ঠির কর্তৃক আজ্ঞাপালন ও যক্ষের সকল প্রশ্নের উত্তরদান। এই সরোবরপ্রান্তিক প্রশ্নোত্তরের তাৎপর্য বুঝতে বুঝতেই এগোবেন বুদ্ধদেব বসু। ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হবে যুধিষ্ঠিরের বৈশিষ্ট্য, তাঁর মানুষী লক্ষণাবলী ও সবলতা-দুর্বলতা, কেন তিনিই ভারতকথার মূল গ্রন্থি, অন্য কেউ নন, না অর্জুন, না কৃষ্ণ। বইটির কেন্দ্রে আছে পরপর দুটি অধ্যায়: 'অর্জুন ও যুধিষ্ঠির' আর 'যুধিষ্ঠির ও অর্জুন' — একই যুগলকে দু-দিক থেকে দেখা হয়েছে। এই মুহূর্তে তাঁরা বিসদৃশ, কিন্তু আশুবোধ্য বিপরীত নন। হয়তো অর্জুনকে নিয়ে তেমন সমস্যা হয় না, সমস্যা যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে, তিনি সরল নন — মাঝে মাঝে এমন সব কাজ করে ফেলেন যা অপ্রত্যাশিত। তাঁর দ্যূতাসক্তি তাঁর ক্রমোদ্‌ঘাটিত স্বভাবের সঙ্গে মেলে না, বিরাটপর্বে যে আপন অজ্ঞাতবাস তিনি যাপন করেন তাতে ধন্দ লাগে। এই রকম নানা অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে করতে, সকল দোলাচল অবলোকন করে, যুধিষ্ঠির বিষয়ে তাঁর মনস্থির করেন বুদ্ধদেব বসু। তবে একথাও বলতে ভোলেন না যে সমুদয় সারল্য সত্ত্বেও যুদ্ধপূর্ববর্তী বিষাদ তাঁরই হয়েছিল আর গীতা বলা হয়েছিল তাঁকেই। ইত্যাদি ইত্যাদি নানান তর্ক না পেরিয়ে পৌঁছোনো যায় না তাঁর সেই তুঙ্গ অধ্যায়ে যার নাম 'ঐশ্বর্যের দারিদ্র্য : দারিদ্র্যের ঐশ্বর্য'। কথাটা ব্যবহার করেছিলেন এক জার্মান ভাবুক, সফলতা-নিষ্ফলতার দুই প্রতিভূ গ্যেটে ও হোল্‌ডারলিন প্রসঙ্গে। যে-ঐশ্বর্য যুধিষ্ঠির শেষপর্যন্ত অর্জন করেছিলেন তা আদৌ দৈব নয়, অর্জুনের মতো কোনো দত্তাপহারক দেবতার কাছ থেকে পাননি। তা মানুষী। তাঁর দৈব পিতা তাঁকে খালি পরীক্ষাই করেছেন, সরোবরপ্রান্তিক প্রশ্নোত্তর যেমন তেমনি মহাপ্রস্থানিক সারমেয়সঙ্গ। বস্তুত, বুদ্ধদেব বসু তাঁর যুধিষ্ঠির-পাঠ বিন্যস্ত করেছেন এই দুই পরীক্ষার বন্ধনে, দেখিয়েছেন তিনি কীভাবে হয়ে উঠেছেন। এই হয়ে-ওঠার আখ্যানই তাঁর গ্রন্থ, *মহাভারতের কথা* তাঁর মহাকাব্য-ভাবনার সারাৎসার।

বার্তা কী — বনবাসের শেষদিন সরোবরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, 'সূর্যের আগুনে, দিন-রাত্রির ইন্ধনে, মাস ও ঋতুর হাতা দিয়ে নেড়ে নেড়ে, কাল এই মহামোহময় কটাহে প্রাণীবৃন্দকে রন্ধন করছে : এ-ই বার্তা।' আর যদুবংশধ্বংসের বার্তা শুনে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলেছিলেন, 'কালই বিনষ্ট করে সর্বপ্রাণীকুল, আমিও সেই কালের কবলে পতিত হবো। অর্জুন, তুমি যথাকর্তব্য স্থির করো।' এই বোধের জন্যই, তাঁর সব দুর্বলতা সত্ত্বেও, যুধিষ্ঠির মহাভারতের নায়ক। এবং এই বোধ আমরা আগেই বলেছি কোনো দেবতার দান নয়, মানুষী ঐশ্বর্য। আর বুদ্ধদেব বসুর কাছে এই মানুষী ঐশ্বর্যের চেয়ে বড়ো ঐশ্বর্য কিছু নেই। *মহাভারতের কথা*-র শেষ অধ্যায়ে এসে এই ঐশ্বর্য-কীর্তনে তিনি কিঞ্চিৎ মুখর। 'যুধিষ্ঠির কোনো মহাপুরুষ নন, আমাদের অনেক ভাগ্যে তিনি মানুষ, শুধুমাত্র মানুষ' — ইতিপূর্বে এ-রকম একটি কথা বলছেন বুদ্ধদেব বসু, 'আমি বলেছিলাম।' সেই সঙ্গে এ-কথাটিও এখন যোগ করা দরকার যে তিনি কোনো দেবতার দ্বারা বিশ্রুতভাবে বরপ্রাপ্ত বা অভিশপ্ত হননি (যেমন হয়েছিলেন অর্জুন ও কর্ণ); তাঁর সব বর এবং অভিশাপ তাঁর নিজেরই

মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিলো — সেগুলিকে তিনি কেমন ক'রে স্বীয় চেষ্টায় সমন্বিত ও বিকশিত ক'রে তুলেছিলেন, হ'য়ে উঠেছিলেন সর্বলক্ষণসম্পন্ন এক মর্ত্যমানুষ, তারই ইতিহাসের নাম মহাভারত। আমরা যদি ক্ষণকাল অপেক্ষা করি এখানে, তাঁর মহাপ্রস্থানের এই তুঙ্গ শিখরে যেখানে তিনি তাঁর মনুষ্যধর্ম নিয়ে দেবরাজের দেবত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান; যেখানে তিনি ইন্দ্রের প্ররোচনায় বধির, একটি কুকুরের জন্য স্বর্গবর্জনে বদ্ধপরিকর; যদি স্মরণে আনি অতীতের সব ঘটনাবিন্যাস — তাহ'লে আমাদের মনে হবে এই মহান ও মানবিক কাব্য যুধিষ্ঠিরেরই জীবনচরিত; তিনিই ধারণ ক'রে আছেন সব পল্লবীকরণ ও পার্শ্বকথন, মিলিয়ে দিচ্ছেন সব অসংগতি; তাঁরই চরিত্রবিভায় বীরশূন্য রণদীর্ণ পৃথিবী অকস্মাৎ স্বর্গের চেয়েও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।' তাঁর এই কথাটাই আরো একবার গ্রন্থশেষে এসে বললেন বুদ্ধদেব বসু, আরো আবেগ সহকারে: 'সব যুদ্ধ থেমে যাবার পর এবং সব আশ্রয় ভেঙে যাবার পর আমাদের জীবনে যা অবশিষ্ট থাকে, যা কেউ দান করেনি আমাদের কিন্তু আমরা নিঃসঙ্গভাবে নিভৃতচিত্তে উপার্জন করেছি — কোনো জ্ঞানের ক্ষীণ রশ্মিরেখা, অতি ধীরে গ'ড়ে-ওঠা কোনো উপলব্ধির হীরকবিন্দু, বেদনার অন্তর্নিহিত কোনো আনন্দবোধ, অবলুপ্ত প্রেম থেকে নিংড়ে-তোলা কোনো সৌন্দর্যের আভাস হয়তো — ভিন্ন-ভিন্ন মানুষের জীবনে ভিন্নরূপ নিয়ে তা দেখা দেয়।

'আমাদের সেই শেষ সম্পদের প্রতীকরূপে, কোনো দুর্লভ অথচ প্রাপণীয় সার্থকতার প্রতিভূরূপে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চিরকালের মতো বাসা বাঁধলেন যুধিষ্ঠির — ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন তাঁকে তুলে নিয়ে ইন্দ্রের রথ আমাদের পক্ষে অগম্য ধামে মিলিয়ে গেলো।' মহাপ্রস্থানেই বুদ্ধদেব বসুর মহাভারত সমাপ্ত, স্বর্গারোহণ তাঁর কাছে 'একটি প্রথাসিদ্ধ স্বস্তিবচন মাত্র'। এ-নিয়ে তর্ক তোলা যায়, কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর মহাভারত-ভাবনা তাতে বিঘ্নিত হবে না।*

* ৮ মার্চ ২০০৫, পুরাণ গবেষণা সংস্থার এক আলোচনাসভায় পঠিত।

বিভাব

পরবর্তী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

কবি **অরবিন্দ গুহ** রচিত দুটি সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ

দক্ষিণনায়ক

নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত

পাঠককে বাংলা কাব্যজগতের যে-দুটি বইতে বারবার ফিরে আসতে হবে

বিভাব-এর এই সংখ্যাটি সীমিত সংখ্যায় ছাপা হবে।
এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য অগ্রিম গ্রাহক নেওয়া হবে।

ঠিকানা
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা ৬৮
দূরভাষ ২৪৭৩ ৩৬০০
চলমান ৯৮৩১৩ ০৯৪০৯

প্রকাশিত হবে **জুলাই** মাসের শেষের দিকে।

কবিতাগুচ্ছ

শীতের মাধুর্য আমি কাউকে বলি না

মহাদেব সাহা

শীতের মাধুর্য আমি কাউকে বলি না, জানি এই শীতখণ্ড
চায় উষ্ণ নির্জন রুমাল, শীত এক নিঃশব্দ প্রেমিক,
আমিও দেখেছি তাকে হেঁটে যেতে বিষণ্ণ ফুটপাতে
বলেছি শীতের ক্লেশ ঝরে যাক অপ্রস্তুত হেমন্তের বনে।
শীত কি উলের জামা পরে যাবে অতিশয় দূরের পিকনিকে,
যায় যাক, আমি তাকে একখণ্ড শীতবস্ত্র ভালোবেসে উপহার দেবো
ফ্লানেলে-খদ্দরে দিব্যি মানিয়েছে শীতের পোশাক,
সেরকম একদিন আমিও হয়েছি এই নগ্ন দেবদারু;
শীতের মাধুর্য শুধু বোঝে এক শীতাচ্ছন্ন নদী
আমি কোনো পাহাড়ে উঠি না, করি পাদদেশে দাঁড়িয়ে প্রণাম।

একটি শিশুর জন্ম

সুব্রত রুদ্র

কোমর বেঁকিয়ে ধানের চারা বসাতে গিয়ে উঠে দাঁড়াবার
চেষ্টা করে পারে না ঠিক তখনই
তার ভূমিষ্ঠ শিশুর কান্না ধানখেতের মাঝখানে

নিমেষে তাকে চ্যাঙধরা করে তুলে ছুট্
ধানখেতে পড়ে রইল শিশুটি
তার বাবা মা দুজনে উগ্রপন্থার রাস্তা ধরেছে

পালাতে পালাতে ছেলেমেয়েদের কী হবে
বাবা মা তাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে
যে জন্মাল এক্ষুনি তার দলতুতো ছোটো বোন
গভীর জঙ্গলের ডেরায় এল, ভূতেরও ঢুকতে ভয় কখনো আলো-হাওয়া ঢোকেনি
ছোটো বোনের গলায় নাড়ি জড়ানো
খুব সাবধানে খরগোশের মা খুলেছে
তাদের এক দাদা নিঃশ্বাস নিতে দেরি করছিল বলে রামের বানরসেনার বউ এসে

পা দুটি ওপরে ধরে মাথাটাকে নীচে মাটির ওপর রেখে
পাছাটা চাপড়াতে নিঃশ্বাস ছেড়ে কেঁদেছিল ককিয়ে

মায়ের সঙ্গে যাচ্ছে জেল হেপাজতে তিনদিনের শিশু
লড়াইয়ের জীবন ছেলের কাছে ফিরে পাবার কামনায় মা
সদ্যোজাত শিশুর নাম রেখেছে মনে মনে আটেশ্বর
আট আস্তাকুঁড়ের জল খেতে খেতে আটেশ্বররা
এমনি এমনি বড়ো হয়ে যাবে
মাকে বাবাকে সবসময়ে কাছে পাবে
খিদে পেলে খেতে পাবে খাবারের জন্যে কাঁদতে হবে না
বাচ্চাদের কিছু প্রিয় খাবার খেতে পাবে
বাবা মায়ের মধ্যিখানে শুয়ে
নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পাবে
চেঁচিয়ে কাঁদবে যে, এদের অধিকারও নেই
ঠোঁটের মাঝখানে আঙুলে সবসময়ে বিধিনিষেধ
জীবন সারাক্ষণ বন্ধ দু-ঠোঁটের মাঝখানে আঙুল
এরা নিজেরাও দু-ঠোঁটের ওপর তর্জনী চেপে রাখে
পিছনের বোঝা বয়ে ছোটা যায় না —
আগে জেনেও এদের বাবা মায়েরা অজ্ঞাতবাসের জীবনে

জমিতে পাখি ডেকে আনার উপায় এরা?
এদের ভেবে এদের জন্ম হয় না

পঞ্চান্ন বছরে

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

শরীর অনেকদিন ভালো নেই,
মনও অনেকদিন ভালো নয়,
পঞ্চান্ন সম্পূর্ণ করে আজ তাই
আত্মাকে বড়ো বেশি চোখে পড়ে।
দেখি, তাতে গলন ধরেছে; এসে গেছে
পক্কতা যা বোঁটা ছিঁড়ে পতনে উন্মুখ;
পঁচিশ বছর
কেরানির — বাঙালির — চাকরির পর।

অর্থাৎ, কবিতার সম্ভাবনা এখনো রয়েছে;
কবিতামক্ষিকা
ফুলে বসে, পচা ফলেতেও।
দপ্তরে ঢুকলে কিন্তু এ মাছি তাড়াতে হয়
তাই মাঝে মাঝে
দপ্তরে না গিয়ে স্রেফ বাসাতেই থাকি;
মাছি কিন্তু তখন আসে না।

শরীর খারাপ হবে আরো,
মন তো নিঃসাড় হয়ে যাবে
হাত আর লিখতে চাইবে না
মাছিরা তখন এলে পরে
আর কোন প্রাণরেণু পাবে?

প্রাণকে এখনো চোখে পড়েনি আমার।

কালা হয়ে যাওয়া শব্দ

নবারুণ ভট্টাচার্য

কালা হয়ে যাওয়া শব্দরা এখানে থাকে
কালা হয়ে যাওয়া শব্দ

তারা কোনো কথা শুনতে পায় না
তাদেরও কেউ শুনতে পায় না
কালা হয়ে যাওয়া শব্দরা

কেউ তাদের বাড়ি ভাড়া দিচ্ছিল না
মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করছিল
সবার একই সন্দেহ
এরা কি ফেরার না ভবঘুরে
জড়বুদ্ধি না বেওয়ারিশ
এই শব্দরা যারা কালা হয়ে গেছে

আমি অগত্যা বললাম
এসো, আমার বুকের কন্দরে থাকো
ভাড়া লাগবে না
সিগারেটের খরচও বেঁচে যাবে

দুটি কবিতা

বীতশোক ভট্টাচার্য

উত্তরকাণ্ড

অমরা, গর্ভের ফুল। বিপরীত শব্দ তার : মরা।
রামের উদ্ভিন্ন হাত একরাত সীতার বালিশ।
সীতা পরদিন হৃতা। রামায়ণ এমন আমরা
সাতকাণ্ড ধরে পড়ি। অনুষ্টুপ, আরো অনুষ্টুপ :
ক্রমশ পুঞ্জিত হওয়া বল্মীকের একতম স্তূপ
এভাবে বিদীর্ণ হয়। রামধনু-রঙের নালিশ

জমা হয়ে মুছে যায়। মেঘদল আপতিক, কেবলই নতুন
সময়ের পিচ্ছিলতা। অরণ্যবাসের দিন, বন্যবাসে রাত
পোহালে সকাল হয়। সব ভোর নয় রামধুন।
কোনো ভোর রক্তপাত, কোনো ভোর রক্ত-অতিপাত;
কোনো ভোর উৎসারিত নিস্বনিত শোণিতপ্রপাতে
পম্পা সরোবর নয়। লবণাক্ত যে-সাগর পার হও প্রাতে,

পার হও রাত হলে। তারও পর লবণাম্বুবেলা,
তারও পরে প্রদোষের কলঙ্কিত দৈগন্তিক রেখা।
এখানেও একা নও। একাকিত্ব এখনো একেলা,
এ-পর্যন্ত সৃষ্টিহীন। শ্লোক-শ্লোক ঠেলায়-ঠেলায়
পৃষ্ঠচাপে ভাঙে গান, ভেঙে উঠে পড়ে ভেঙে যায়
দূরত্বের ফুল, ফেনা। এ-অবধি সন্ধিক্ষণ, একা

এই অব্দি পারে তুমি। বালিতে তক্ষণ করে ভাস্বর আঙুল।
ততক্ষণে মুছে যায় নখরের স্নিগ্ধ শিল্প, সজল শিল্পীর
যা সাক্ষ্য নিছিয়ে জ্বলে ভাস্কর্যের কিছুমিছু ভুল,
নেভে জৈবভাস্বরতা। সিদ্ধান্তের স্থগিত আদেশে
ধরণীর দ্বিধা থেকে সীতার জন্ম ও মৃত্যু। দেহলিতে মেশে
অন্ধকার, আর আলো। তমসায় বিম্ব তারাফুল।

জাতিস্মর

তরুণ সুধীন্দ্রনাথ গড়ছেন যখন সংরাগে
তিব্বতি হাওয়ার হাঁকে নাথু-সংকটের
প্রতিধ্বনি, আর কারো বৈঠা বেয়ে-যাওয়া

ছন্নু সায়রের শেষে শব্দময়, তাও
নিশ্চিত পিছনে থেকে কেউ তাঁকে উৎসাহ দিয়েছে :
প্রস্তুর প্রেরণা নয়, ছিল কেউ যে-নবায়মানা,
ভোরে ঘোর কাটতেই যে দেখাল সূর্যের আলোয়
আয়না ঠিকরে দিচ্ছে জমাট ঝঙ্গুর
যত দূরে রোদ যায়, রোদ ওঠে তুষারে যতটা :
সব কেলাসিত স্তব্ধ : শুধু কার মনের বিস্ফারে
অচিন নাথুলা-পথে অভিজ্ঞান ফুটে উঠছে রডোডেনড্রনের।

দুটি কবিতা

রণজিৎ দাশ

ঠাকুরদার জন্য পোস্টকার্ড

একটি সমুদ্রঝড় কলকাতা শহরে ঢুকে সহসা আমার
নাম ধরে বজ্রকণ্ঠে ডাকে।
এমনকী, সেই ঝড় শ্লেটবর্ণ মেঘে, তীব্র বিদ্যুৎরেখায়
আমার ফেরারি নাম লিখে নৈশবিজ্ঞপ্তি জ্বালায়।
দেশ-থেকে-ছুটে-আসা ক্রুদ্ধ ঠাকুরদার মতো সেই ঘূর্ণিঝড়
কেবলই আমার খোঁজে ধাক্কা মারে শহরের প্রতিটি দরজায়।
ঝড়ের তাণ্ডবে ভীত স্ত্রী ও পুত্রকে আমি বলি,
'ঠাকুরদা এসেছেন। আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।
তোমরা খুব সাবধানে থেকো।'
রাস্তায় বেরুনোমাত্র সেই ঝড় সপাটে আমার
দু-গালে থাপ্পড় মারে, শোঁ শোঁ শব্দে গালাগাল করে।
একটি বছর ধরে আমার সমস্ত ভুল, ভয় ও নীচতা
ক্ষমার অযোগ্য বলে ধিক্কার জানায়।
ফি-শ্রাবণে একবার এই ক্রুদ্ধ ঝড়ের প্রহারে
আমার শরীর থেকে মরা ডাল, চামচিকে, সাপের খোলস
ঝরে পড়ে যায়।

গেরিলা

যে-কলমে মৃত্যুদণ্ড লেখা হয়, সে-কলম ভেঙে ফেলে দিয়ে
বিষণ্ণ এজলাস ছেড়ে উঠে যায় স্তব্ধ বিচারক।

রাত্রির আকাশ থেকে অজস্র কলম ঝরে পড়ে।
কালো রঙ, ভাঙা নিব। কবিরা কুড়িয়ে নেয় সে-সব কলম।

দুটি কবিতা

অমিতাভ গুপ্ত

দ্বিতীয় সংস্করণ

কাল প্রকাশিত হল 'অন্তর্ধান'। তখনো প্রচ্ছদ
হয়নি যথেষ্ট আঁকা। বইটির ভূমিকা ও সূচির জটিল
কুয়াশা মথিত করে শীতের রাতের মতো ঘন আলিঙ্গন
মনেও পড়েনি
শুধু এক প্রস্তাবিত উৎসর্গপত্রের আগে নীল
আঁচলের কণার মতন
পৃষ্ঠাঙ্ক ছড়িয়ে আছে দেখলাম, রাতের আকাশে

যারা মৃত, তারা যদি 'অন্তর্ধান' গ্রন্থটির পূর্ণপাঠ করে?
তাদের প্রয়াত দেহ থেকে
অন্তর্বয়ানের মতো ইন্দ্রিয়বোধের যদি পাঠান্তর ঘটে?
আমি আছি অজস্র নির্জনে
তুলির উদ্দেশ্য নিয়ে, ক্যানভাসে, ব্লার্বের মর্মান্তিক
আত্মরতি নিয়ে

সতর্ক

যেসব অদৃশ্য রাত্রি আমার উদ্দেশে তুমি রচনা করেছ
তাদেরই নক্ষত্র থেকে ঝরে-পড়া সন্তর্পণ ক্রমশ আমার
অপূর্ণকে দীপ্ত করে। এই পরিত্যক্ত নদী, এখানে যে কেউ গড়ে চর
সমস্ত পাখির এই বধ্যভূমি, পশুর কঙ্কাল, সারাৎসার
মানুষেরও। এই সবকিছু নিয়ে যে নদীটি নদীর সাগর ভাঙে গড়ে
আমি যেন তার
রাত্রি নই দিন নই কেউ নই, স্রোতের ভাগ্যের কেউ নই

দুটি কবিতা

সব্যসাচী দেব

মৃত

গহ্বর থেকে ওই উঠে আসে মৃতের আলাপ

ফ্লাইওভারের নীচে আজ বুঝি কুসুমের মাস!
রাস্তায় রমণশিল্প, চেয়ে দ্যাখে ভিখারি বালক —
শহিদবেদির পাশে কথা বলে ফড়ে ও দালাল;
ফ্ল্যাশবাল্ব ঝলসে ওঠে, বিজ্ঞাপনে দেবতার মুখ।

এই তবে দিনরাত্রি! এই তবে স্বপ্নজাগরণ!

এই সব জেনেছিল মৃতও সেদিন, তাই
ভূতগ্রস্ত সংলাপে লেগেছিল বিদ্যুৎ-ঝলক।

মৃতকে চিনি না আমি, যদিও সে ছিল
বন্ধু, কোনোদিন, কোনো ক্ষতমুখ ছুঁয়ে...

প্রকাশ্য

তোমাকে বলব আমাদের গোপনতা
কীভাবে ভেঙেছে উপনিবেশের দায়,
কীভাবে পুরোনো সংস্কারের বই
ছিঁড়ে ফেলা হল সেদিনের সন্ধ্যায়।

গোপনতা তবু এখানেই সব শেষ।
পুরোনো চাঁদের শরীরে নতুন ক্ষত;
জ্যোৎস্নাও আজ বেঁকে গেছে কতখানি
মায়া ছিঁড়ে দ্যাখো, বমি উগরেছে কত।

তা হলে জেনেছ ততটা গোপন আর
কিছু নেই, শুধু উপনিবেশের ঠাট
স্বেচ্ছায় মেনে আমরা এখন দ্রুত
শিখে নিই আজ পোস্টমডার্নের পাঠ।

এখন সন্ধ্যা, পথের দু-ধারে ছায়া;
লেজাররশ্মি মুছেছে ব্যক্তিগত

যত বিস্ময়, মেট্রোপলিসে জাদু
প্লাস্টিক ফুলে লেগে থাকে আপাতত।

তা হলে এখন প্রকাশ্য সব কথা,
মোবাইল ফোনে এস.এম.এস. ফুটে ওঠে;
তা হলে এখন দাসজন্মের স্মৃতি
রক্তে মিশেছে, তার ভাষা ফোটে ঠোঁটে।

এমন একটা দিন আসবে

শ্যামলকান্তি দাশ

এমন একটা দিন আসবে
যেদিন আমরা কুকুরকে কুকুর বলতে ভুলে যাব।
তার গলার শিকল ঝুলবে কাঁটাগাছে,
আত্মহারা প্রভু গড়াগড়ি দেবেন রাস্তায় —
সেদিন আমরা ভাতের থালা ভুলে যাব,
মাংসের ছিবড়ে ভুলে যাব!

এমন একটা দিন আসবে
যেদিন মেনি বেড়ালকে মনে হবে অবিকল বাঙালি গৃহবধূ।
ঘোমটার ফাঁকে ঝিলিক দিয়ে উঠবে তার নতুন নাকছাবি —
আমরা তাকে বউদি বলতে বলতে হেদিয়ে পড়ব।
সেদিন আমরা সম্পর্ক ভুলে যাব,
সম্ভ্রম ভুলে যাব!

এমন একটা দিন আসবে
যেদিন বুড়ো গাধার সন্তাপ ছুঁয়ে যাবে
আমাদের হাড়ের কাঠামো।
ছেঁড়া বইয়ের কাছে থমকে থাকবে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ আবেগ,
তাল তাল দীর্ঘশ্বাস।
সেদিন আমরা চৈত্রমাস ভুলে যাব,
রোদনভরা বসন্ত ভুলে যাব।

এমন একটা দিন আসবে
যেদিন পুকুরের আধমরা শিঙিমাছকে

উপর্যুপরি বলাৎকার করবে একটা নীলকণ্ঠ পাখি।
মেঘে বাঁশপাতায় আবিল হয়ে উঠবে সূর্যাস্ত—
সেদিন আমরা বঁড়শি ভুলে যাব,
অভিনিবেশ ভুলে যাব!

এমন একটা দিন আসবে
যেদিন স্বপ্নের মতো ছায়াচ্ছন্ন গলায়
কয়েকটা কচি ঘোড়া হেসে উঠবে।
অশ্বশক্তির মহিমা বুঝতে বুঝতে অন্ধকার হয়ে উঠবে
দিকচক্রবাল —
সেদিন আমরা তেজ ভুলে যাব,
তর্জনী ভুলে যাব!

এমন একটা দিন আসবে
যেদিন প্রকৃতি ফুরোবে না প্রান্তর ফুরোবে না
জগৎসংসারের আলোছায়া ঠেলতে ঠেলতে
একটি ছায়া হেঁটে আসবে —
মুখ নিচু, হাতে ছাতা নেই, মাথা উলুঝুলু।
বাচ্চারা সোল্লাসে চিৎকার করে উঠবে: মাস্টারমশাই মাস্টারমশাই
সেদিন আমরা চকখড়ি ভুলে যাব, ব্ল্যাকবোর্ড ভুলে যাব,
আমাদের চোখের জল কিছুতেই বারণ মানবে না!

মৃত্যুঞ্জয়ের গান

(মনোরমাকে মনে রেখে)

পার্থ রাহা

এখন তোমার শরীর
তোমার রজনীগন্ধার মতো নরম শাদা শরীরে
কোনো আবরণ নেই
তোমার শরীর ওরা রক্তে রাঙালো
লাল গোলাপের রঙে রাঙালো রজনীগন্ধা
রক্ত রক্ত কুকুরের বকলসের মতো রক্ত
ভেলভেট রক্ত

একজন দু-জন নাম না-জানা অনেক অনেকজন

তোমার কোমর থেকে পায়ের পাতা
লাল
লাল আকাশের মতো লাল
ওরা
হিসহিস ফণার মানুষ
কালো রক্তের মানুষ
ওরা
বন্য পশুর চেয়েও বর্বর
নষ্ট নক্ষত্রের অভিশাপে ওদের জন্ম
হায়, জন্মভূমির স্বাধীনতা!
হায়, শাদা সাফারি চড়ানো
ঝকঝকে স্মার্ট
মানবাধিকারের মন্ত্র!
রাক্ষসের হাতে রক্তের দাগ
রক্তের দাগ গাছের শরীরে
মাটিতে রক্তছায়া
তোমার চোখের তারার আয়নায়
সান্তিয়াগোর মারিয়া কাস্ত্রোর মুখ
তোমার বুকের গহন গভীরে
বাগদাদের আনিশার বিধ্বস্ত শরীর
তোমার রক্তের নদীর ধারায়
বুরকিনা ফাসোর এলিজার নিথর শরীর

মনোরমা বোন আমার
আমি আর ডাক ছেড়ে কাঁদব না
আমরা গান গাইব
পশুদের সামনে আমাদের গান

মৃত্যুজয়ের গান।

সংযোজন : কান চলচ্চিত্র উৎসবে, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান পাওয়া, চিলির মারিয়া কাস্ত্রোকে পিনোচেত সরকারের সেনা-ক্যাম্পে গণধর্ষণ করা হয়। তারপর গুলি করে হত্যা করা হয়।

চিকিৎসক আনিশা সাদাতকে বাগদাদে সেনা-ক্যাম্পে মার্কিনি সেনারা গণধর্ষণ করে, তারপর গুলি করে হত্যা করে।

আফ্রিকার বুরকিনা ফাসোর কবি এলিজা সিমায়েকে ফরাসি সেনা-ক্যাম্পে গণধর্ষণ করা হয়। তারপর গুলি করে হত্যা করা হয়।

ঘোর বসন্তে চাঁদ পোহাচ্ছে ঘোড়া

অরুণকুমার চক্রবর্তী

ঘোর বসন্তে চাঁদ পোহাচ্ছে ঘোড়া;

কেশরে উড্ডীন গর্ব ঘাড়ের ভাস্কর্যে জ্বলে
ছিলাহীন ধনুকের টান;
পায়ের স্বাস্থ্যে বাঁধা থোকা-থোকা গতির নূপুর;
ল্যাজে গায়ে পিছল চাঁদের মায়া
আমূল বিদ্ধ আছে ঘাসের শেকড়ে

সবুজ পালঙ্কে পড়ে আছে ও-কার টুপি,
ছপ্‌টি, জুতোজোড়া, নষ্ট খুশিয়াল;
লাগামে শাসন নেই জিনে কারো পা নেই জ্যোৎস্না পাথর,
দুর্দান্ত গতির ঝড় থম মেরে পড়ে আছে ঘাসে

পৃথিবীর যুবকেরা হারালো কোথায়, খুঁজে আনো
ডেকে আনো ওদের

ঘোর বসন্তে চাঁদ পোহাচ্ছে ঘোড়া.....

তিনটি কবিতা

সাযযাদ কাদির

ঘুম

কতবার মনকে বলেছি, না —
সামনে আর এগিয়ো না,
একটু থামো।
একটু বসে থাকো।
বসে-বসে একটু ভাবো।
সারাজীবন লম্ফঝম্প করেছ অনেক —
কিছুই হয়নি; তবুও ভাবো,
তোমার নাম রিপ ভ্যান উইঙ্কল।

ঘুম — ঘুম — অজস্র ঘুমের সুখে —
অজস্র ঘুমের মধ্যে ডুবে আছ তুমি —

মাঝেমধ্যে ভুশ করে ভেসে উঠছ
'দেবদাস' বা 'চারুলতা' বা ওইরকম
কোনো ছবির লোকেশনে
চারপাশে তাকিয়ে দেখছ
তোমার কবিতার পঙ্‌ক্তি গায়ে-গতরে লিখে ছুটছে
অজস্র রিকশা ট্রাক বাস বেবি-ট্যাকসি
তুমি দেখতে পাচ্ছ
সবসময় কাঁচুমাচু তোমার ধনকুবের বন্ধুকে
দু-পাত্র গেলার পর যে খুব সহানুভূতিশীল হয়ে যায়
তোমার দুঃখকষ্টে
দেখতে পাচ্ছ
তোমার জীবনের প্রথম চুম্বনসঙ্গিনীকে
এখন দেখা হয়ে গেলে যে খুব 'আহা' হয়ে যায়
তোমার প্রতি

শোনো রিপ ভ্যান উইঙ্কল,
তুমি কিন্তু খুব হাবুডুবু খাও ঘুমের মধ্যে
তেমন সাঁতার জানো না
তবু অ্যাকোয়েরিয়ামের সোনালি-রূপালি মাছের
পিছু-পিছু সাঁতার কেটে
তুমি চলে যাও কত — কত দূরে —
সেখানে সারাজীবন দাদিমার কোলে চড়ে তুমি
চারান বিলের গল্প শোনো
বাবার হোস বুট জারসি নিয়ে চলে যাও ফুটবল মাঠে
ঘ্রাণ পাও মায়ের ইলিশ ভাজার...

তাই বলি, আর কেন এগোবে তুমি —
একটু থামো।
এইখানে বসে থাকো। ভাবো।

সুরসুন্দরী

মনে আছে, খুব মনে আছে তোমাকে।
তুমি খুব ভাল গাইতে
'শুকতারা আকাশের কোণেতে...'

আমাদের মহকুমা শহরের সেই
'কালী সিনেমা'র ভটভট ডায়নামোর সুবাদে
ঝলমলে বিজলি আলোয়
তোমাকে মনে হত কোনো সুরসুন্দরী —
মনে হত রুপালি পরদা থেকে
সেই করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের মঞ্চে উড়ে আসা
সুরাইয়া, নাসিম বানু বা নলিনী জয়ন্ত কেউ
বিরহ বিষাদে গাইছে
'সাথীহারা ব্যথা মোর প্রাণেতে...'

সেই তুমি, নানা 'সিন' দিয়ে সাজানো মঞ্চের মাঝখানে
হারমোনিয়ামের ওপর ঝুঁকে পড়া —
পরনে টাঙ্গাইলের রাজসিক লালপেড়ে শাদা শাড়ি
হাতে গলায় খোঁপায় বকুলমালা
চোখে কাজল টানা
ঠোঁটে গালে লালিমা
— সেই তুমি, তোমাকে মনে আছে, খুব মনে আছে।
তুমি যে আমাদের পাড়ার পুঁটি
সারাদিন সংসারের কাজ — বাসনকোসন — ঝাঁটাঝাড়ু —
তারপর নিরিবিলি সন্ধ্যায়
হারমোনিয়াম নিয়ে গলা সাধা —
সেই তুমি, আমাদের মহকুমা শহরের সম্রাজ্ঞী
স্বর্গ থেকে আসা কোনো স্বর্ণসুরময়ী —
তোমাকে মনে আছে, খুব মনে আছে।
তোমার লালপেড়ে শাদা শাড়ি,
বকুলমালা, চূড়া করে বাঁধা খোঁপা —
খুব মনে আছে।
তুমি খুব ভালো গাইতে
'এ মন কেমন করে ও জেনেছে..'

উত্তরসূরিকে

বাংলাভাষার ভিতরে তুমি বাংলাদেশকে খুঁজে নিয়ো।
খুঁজে-খুঁজে
কত লড়াই — কত রক্ত, কত অশ্রু খুঁজে পাবে —
তারপর তুমি আর কখনো পিছনে হাঁটবে না, কাঁদবে না

বাংলাভাষার ভিতরে তুমি
বাংলাদেশের ধ্বনি, রূপ, বর্ণকে খুঁজে নিয়ো
তখন দেখবে রাজপথে-রাজপথে মিছিল
শুনবে মিছিলে-মিছিলে আকাশ-কাঁপানো স্লোগান
দেখবে সভায়-সভায় শপথ, পথে-পথে মোকাবিলা —
তারপর তুমি আর কখনো আপস শিখবে না, ভাঙবে না

বাংলাভাষার ভিতরে তুমি বাংলাদেশকে কাছে পাবে।
তাই বাংলাভাষার এ-মাথা ও-মাথা যেখানেই রাখবে হাত
সেখানেই স্পর্শ পাবে
রফিক সালাম বরকত জব্বার অহিউল্লাহ-র অবিনাশী রক্তস্রোতের
তারপর ওই হাতে কি তুমি পরাজয় লিখবে?
লিখতে-লিখতে কি
কুৎসিত কদর্য বীভৎস অশ্লীলতায় ঢেকে দেবে ইতিহাস?
বেসাতি করবে কি মগজ বেচে?
খ্যাতির কাঙাল হয়ে, প্রচারপাগল হয়ে
লুটিয়ে-লুটিয়ে পড়বে নালা-নর্দমায়?

স্থান

গৌতম বসু

সমস্ত আড়াল ছিঁড়ে ফেলার পরেও
আমার পোড়া দেহের সন্ধান মেলেনি;
খাটের নীচে নেই, নেই আলমারিতে
তুমি ভাবলে আমি বুঝি রাজেনদের
পেয়ারাতলায় এসে ঘুমিয়ে পড়েছি।
একটিও পাঁজর পড়ে নেই ওখানে,
যেখানে আছি, কীভাবে বোঝাই তোমায়
সে-এক অতীব আশ্চর্যময় স্থান।

ইউনিভারসিটি বুলেভার্ড, ২০০৪

অভিরূপ সরকার

শীতের ছুটিতে শেষ পড়ুয়াটি বাড়ি চলে গেলে
আবার পাখিরা ফিরে আসে —
অমল ধবল মেঘ উড়ে যায় স্থির ছায়া ফেলে
নির্জন ক্যাম্পাসে।

দূরে আখরোট বন, শালবন, আরো আরো দূরে
আদিগন্ত ধবল পাহাড়।
ঈষৎ ঝলসে ওঠে অতর্কিত হাওয়ার মুকুরে
পউষের হাড়।

আকাশের মাঠ থেকে মেঘ নিয়ে ফিরে যায় গোঠে
হাওয়ার দুলালি।
ঘুমন্ত আখরোট পাতা অকস্মাৎ ফের জেগে ওঠে
দিয়ে করতালি।

ক্রমশ সূর্যের যাত্রা শেষ হয়, দিক্‌চক্রবাল
ক্ষীয়মাণ সোনা।
তুমিও হেঁটেছ ঢের ক্লান্তিহীন কত দীর্ঘকাল
এবার ফিরবে না?

বৃষ্টি, তোমার কথাই ভাবছি

মঞ্জুভাষ মিত্র

দুপুরবেলা বৃষ্টি পড়ে
অঝোরধারা বৃষ্টি পড়ে
আমার মুখে আমার চোখে
তাহার চোখের জল ঝরে
হারানো দিন সে কবেকার
কবেকার সে মৃত মেয়ে
জীবন হলুদ প্রজাপতি
সময় তাহার মুখে চেয়ে

মুঠিতে ধরা সময়, গোলাপ
আজ সারাদিন খারাপ গেল
বুকের ভিতর আজ অনুতাপ
কাজ করিনি বই পড়িনি
কোন সে নিঠুর, লোহার শিক
গরম করে বুকের ভিতর
ঢুকিয়ে দিল আজকে আমার
দুঃখ আমার মুখে চেয়ে
চোখের পাতা আর পড়ে না
এল বৃষ্টি, মৃত মেয়ে
বৃষ্টি যেন খোলা জানলা
সেই মেয়েটির শরীর বাগান
তাকালে স্বপ্ন দেখতে পারি
অতীত জীবন দেখতে পারি
কী চেয়েছি কী পেয়েছি
মনে ভাবছি বৃষ্টিকথাই

ভাষা

অজয় নাগ

ভূগোল গড়িয়ে যায়
হাওয়ার পাহাড় থেকে
ওই শোনো জ্যামিতির আর্তনাদ —
মেঘলা-মনস্কতা ...

কোমর ভেঙে নেমে আসছে অন্ধকার
এবড়োখেবড়ো রাত্রি — যা সবটা রাত্রির নয়
কিছুটা এগিয়ে অনেকটা ফাঁকা —
স্বস্তির নিশ্বাস
তারপর শুরু বর্ণমালার অজানা সফর

ঝুলন্ত ক্যামেরায় সঠিক উঠে আসে
মুখ ও মুখোশের কঠিন হিমায়ন

ইচ্ছের পেট থেকে বেরিয়ে আসে
দূর আশ্চর্য আলো
এঁটো মানচিত্র ফুঁড়ে
মাটির স্বাদ নিয়ে
ছড়িয়ে পড়ে উচ্চারণ

ব্রাত্য এই দিনগুলি

মৃত্যুঞ্জয় সেন

শেষে নেশা ধরে গেছিল, আঙুল ভাঙতে ভাঙতে দোল খেতে খেতে হলাহলের হদিশ নিচ্ছিলাম। ভাঙা ছাদের জবানবন্দি যেন। পাশেই ডোবাটি। ক-দিন আগে এই ডোবা নিয়েই থানা-পুলিশ। সেই বাবা গোপনে এই ডোবাতেই পুঁতে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর ঘনীভূত সন্দেহকে, রাতজোড়া ক্রোধকে। মেনে নিতে পারেননি পঞ্চায়েতের রায়, যে রায়ে আছে নির্বাসন ও নির্যাতনের উপচানো কান্না।

এভাবেই চাঁদ সওদাগরের ব্যবহৃত, বর্তমানে পোড়া চামড়ার মতো চেহারার, পেয়ারা-বাগানের পাড়বন্দি, আদিগঙ্গার জল দেখছিলাম। কোনো মন্দির শেষরক্ষা করার মতো বিষয় নয়-সেটি। দুটো পাখি জল ছুঁয়ে উড়ে গিয়েছে একটু আগে — উত্তর থেকে দখিনে, ওই শ্মশানের দিকে। পল্লির এক কবি বললেন, এই পাখি দুটোর নাম কি জানেন? নাম, গুয়ে-শালিখ। নিথর নিঃস্তব্ধ দুপুরে আমি আর কাউকে সিঁদ কাটতে দিতে চাই না বলে বললাম, ওরা তো খুব খুশি। ওদের মেরুদণ্ড ভাঙবেন না। আসলে সেটা ছিল আমার আঙুল-সংকেত।

কবি তখন সমতল খুঁজছিলেন। মাটি সরিয়ে সরিয়ে শূন্যতার রূপ খুঁজছিলেন। অনন্ত পরিচয় খুঁজছিলেন। বললেন, এই নদী অনেক সভ্যতা গড়েছে, ভেঙেছেও। কিন্তু আসল কথাটা তো আজও বলতে পারল না। কোনো প্রতিশ্রুতি তৈরি করেনি। দুধের বাটিকে রক্ষার জন্য কোনো বর্ম তৈরি করতে পারেনি। সারবস্তুহীন ব্রাত্য এই দিনগুলি শুধুই হট্টমেলা। নিঃসঙ্গ পথিকের শিরোপা নিয়ে থেকে গেলাম। আপনি কীসে খুশি হন মশাই?

হঠাৎ পেয়ারা-বাগান থেকে একটি সাপ বেরিয়ে এল। আমরা বলাবলি করলাম, ওটার কি বিষ আছে?

দুটি কবিতা

কমল চক্রবর্তী

চালাও যোগেন

চালাও যোগেন, তুকচা লাফে ধরে ফ্যালো সম্মুখম আর
সন্দীপন। দ্যাখো কেউ সালসা খেয়ে বাঁচে না, সিঙারায় বাঁচে।
ভোলো রান্নাঘরের এয়োতি আর সোরাবজি টাটা।
বাঁক নিলেই সাংগ্রিলা, নানুর পান্থনিবাস।

চালাও মদমাংস কোবরেজি হোমিওপ্যাথি-বিন্দু।
দ্যাখো নখে ঝুলছে গতরাতের শেষ-লুব্ধক
দ্যাখো পথে দ্রুমদল করুণা-কিরণ-টুসু!
সব যখন সুবারবন থেকেই আসছে আর তখন কীসের ইয়ে
মাল নামাও!

কিছুর মধ্যে কিছু নয়, দেখবে একদিন দুম করে
সব কোথায় কোন ঝরা-বকুলের পথে হাওয়া!

আজ রাত

আজকে কঠিন রাত।
মায়া-তরণীর অভিঘাত।
ভৃঙ্গরাজ, জটামাংসী, এমনকী চিরতা-কাননে অনুমতি
যে যেখানে শুতে বসতে চায়, বিয়ে করতে চায়, অভিপ্রেত

ল্যাম্পপোস্ট নুয়ে থাকছে, ডুম ঘিরে রানি-মৌমাছি
রাত ক্যাবারের আগে নক্ষত্রেরা ভোরের অতিথি
হয়ে রাত-গন্ধা হাজতে ঢুকেছে।

আটদিন দশদিন ধরে জাঁক দেওয়া রজনী-কুসুম, আজ ফুটল
যখন ব্যারাকে কোনো ফেউ নেই, ঘুমন্ত-পুলিশ!
আজ রাতে দুটিমাত্র ক্লাশ
এক দল সিনেমায় গেছে
অন্য দল ভুবনের ত্রাস।

দুটি কবিতা

প্রমোদ বসু

মুক্ত

আজ আমার জন্যে কেউ দাঁড়িয়ে নেই পথে;
তৃষ্ণা, হও শেষ।

মুহূর্তে বারুদ ওঠে ঝলমলে আলোর ভিতর,
শান্তি দাও, হে অন্ধকার!

এই তো শ্মশান-খেলা, পরমায়ু তোর;
দাউ দাউ ক্রোধে জ্বলে পাপ।

মাঝখানে শোক, অশ্রু, নিন্দা-মন্দ, তাপ
হাহাকার, মূর্ত বাচালতা!

অনন্তে দাঁড়াই তাই একা এসে, এই
দেহ খোলো প্রাণ।

ধুয়ে যাক তত্ত্ব সব, অভিজ্ঞ অধ্যায়, —
আমি আজ আমি নই আর।

শবরী

আমারই দুঃখগুলো অস্ত্র করে মেরেছ আমাকে।
নিপুণ শিল্পী হলে আজ।

কোমল শান্ত মুখে খেলা করে বিষ, অস্থিরতা,
নষ্ট কারুকাজ।

আমি তো বর্মহীন, পথে পথে উন্মাদ প্রায়,
অপমান মাখি।
আমাকে ভস্ম করে দিতে তবে জ্বালো
আগুন একাকী।

ছাই হই, ধুলো হই, মাটি হয়ে মিশে যাই তবে
মাটিতে তোমার।
যে-হাতে পাথর নিলে, সেই হাতে জানি
রেখেছ পাথার।

দুটি কবিতা

নমিতা চৌধুরী

তুলাবীজ

ঘোরতর রাস্তায় যাবার কথা বলে
মানুষটি হঠাৎ উধাও হয়ে গেল
ঘোরতর শব্দটি বিপদসংকেত এই বুঝে
আমি নড়বড়ে সাঁকোর দিকে আর তাকাই না

ভ্রমণবৃত্তান্ত এখানেই শেষ হতে পারত
কিন্তু তরজাগানের অখিলবাবু অথৈ নদীর গল্প
এমনভাবে শোনালেন যে ঘুমের মধ্যেই দরজা
খুলে আমি কখন যেন একটি নদীর খোঁজে
বেরিয়ে পড়েছি

শিকার

এই মুহূর্তে খেয়াঘাট থেকে উঠে এল
দুই শিকারি যুবক, হাতে বন্দুক
বাঘ খুঁজতে বেরিয়েছে —
লোকালয়ে বাঘ! আমি অবাক হই।

বিপন্ন সাজগোজ ঝাঁপি খুলে লিপস্টিকের
নতুন রঙ আবিষ্কারে মগ্ন

কিন্তু যুবকেরা নিশ্চিত, বাঘ আছে এখানেই কোথাও
আজ না হয় কাল দড়ি-বেঁধে খেলতে খেলতে
নিয়ে যাবে জঙ্গলে একদিন...

দুটি কবিতা

নির্মল বসাক

লবণ

প্রায় আলো, প্রায় অন্ধকার —
এই চন্দ্রমাখা ভোর,
তাদের কী ডেকে নিয়েছিল?
ঝিম কুয়াশারা কাকে ডাকে!
সব প্রস্তুতি ছাড়া
তারা গিয়েছিল নদীটির বাঁকে...

তখনো বসেনি হাট, বিকিকিনি শব্দহীন —
দু-মুখো শব্দের ঋণ শেষ করে
বাড়িতে কি ফিরেছিল তারা?
কী যে হয়, কী যে হয়েছিল —
রাত্রি জানে, দিন জানে না তো!
নদীচর জানে, নদীটি জানে না
অথচ তারই বুকে ওই কৌতূহলী ঝাঁপ...

মাঠে ধান লকলক, বালুচর চাঁদে ভেসে যায় —
তাদের হাওয়ার লবণে শুদ্ধ হবে বলে,
বলো, ফিরে আসছে কী — এই প্রায় আলো, প্রায় অন্ধকারে...

এপিসেন্টার

আমার বিপ্রতীপে পড়ে আছে অরুন্ধতী তারা।
কমলাকোয়ার জোড়া মুখ রসে টুপটুপ অথবা হাতে
গরম ফুলকপির সিঙ্গারা ত্রিকোণ —
যে নামেই ডাকো, তাকে ভুলে যাবে!

সে দিয়েছে ভূমণ্ডল-বিধৌত নয়ন, বাঁকা ভুরুর কথকতা —
চুনি, পান্না হার-মানা ওই কালো মার্বেলের ভিতর তাকালে
প্লাবিত ভুবনে প্রায়-আলো, প্রায়-অন্ধকারের রহস্য — কবিতা
ফুটে ওঠে সহাস্য ঠোঁটের টানে — কখনো শ্রাবণে,

দাঁতের ঝিলিক হঠাৎ বিদ্যুৎ হয়ে আকাশে মিলায়...
হে আকাশ! তুমি কী পুরুষ? দুরু দুরু বুকের ভিতর গুরু গুরু ডাক উঠছে কেন!

ওগো অরুন্ধতী — তোমারও কী হৃদয় কাঁপে না!
চূর্ণ চুলে পক্কবিম্ব-অধরোষ্ঠী — তোমার ঘরে কী আয়নার ব্যবহার নেই?
ওই যে চলছ তুমি — তোমার গমন আর হাতের দোলন
পরীদের পাখার গৌরবে প্রজাপতি হয়ে উড়ে, ওঠে-নামে, বিভঙ্গেরও ওই আকর্ষণ,
মাধ্যাকর্ষণকে তছনছ করে দিতে চায় — জানো!
এইসব পেয়েছ তুমি, লবঙ্গের কলি-সম গোপন সৌজন্যে —
যার দৌলতে করে খাচ্ছ, নাচছ ও নাচাচ্ছ, দেহলতাটি দোলাচ্ছ মৃদু পবনে...
টুপটুপু রসের না-টক, না-মিষ্টি ধারা, ধমনীর সৃষ্টিপ্রবাহে... মনে রেখো
এত যে পেয়েছ গৌরবগাথা, সৌরভ-মহিমা, স্তুতি, স্তব, পূজা ও প্রার্থনা —
কার জন্য, কোন প্রত্যঙ্গ সংস্থাপনের জন্য — ভুলে যেয়ো না, ভেবো,
সর্বদা গোপন রেখো না গোপনে, মেলে দিয়ো আলোকে, হাওয়ায় —
সকল সৌন্দর্যমূলে শিকড়ের অনুভব নিয়ো হে ললনা...
আমার উঠোনের কোণে, তুমি লক্ষ্মীর আলপনা, সরস্বতীর তুমি বীণার ঝংকার —
কার অহঙ্কারে তুমি এতটা পেয়েছ — হাঁটছ, নাচছ, নাচাচ্ছ, উড়ছ, ওড়াচ্ছও,
ভুলো না সে ভূমিকন্যা, যে আড়ালে গোপন থেকে তোমাকে সাজাচ্ছে, বাজাচ্ছেও...

ভূমিকম্পের এপিসেন্টারটিকে, পুরুষ, তুমিও কী ভুলে যেতে পারো কোনোদিন!

তারপর

সোমক দাস

পৃথিবীগ্রহের গায়ে অর্ধশতাব্দী ধরে হাঁটাচলা হল।
মাঝে মাঝে মনে পড়ে — এত যে সাহিত্য হল, এত যে
শিল্পকলা হল, চলচ্চিত্র ইত্যাদি হল, পুরস্কার —
অমরত্বের ইশারা দেখা গেল বার বার, তারপর?

কী যে হল? ধর্ষণ বন্ধ হল? ধর্মযুদ্ধ থেমে গেল
নাকি? এত যে ধর্ম হল, তারপর ঈশ্বর
কোথায় গেলেন?

এত যে কবিতা হল, তারপর কে কবি, কে কবি নয়
সে-কথা বোঝার জন্যে কে রয়েছে বেঁচে?

কয়েকশো বছর পরে — এত কবি, কোথায়
থাকবেন?

এত ধর্ম — এত ঈশ্বর — কোথায় থাকবেন?

শোনো বন্ধু

বাণী বসু

শোনো বন্ধু, তোমার জন্য অ.....নন্ত কাল
অপেক্ষা করতে রাজি। কিন্তু ইতিমধ্যে কিছু
খুচরো প্রেম, ফস্টিনস্টি বৈকালি কাফেতে,
ইঁদুরে মাদার গাছ। ছেঁড়াখোঁড়া কার্জন পার্ক
নতুন নকশা তুলে কৌণিক রুমালের পাড়ে
যা এখন বনবিভাগের তাঁবে।
রেড রোড-সংশ্লিষ্ট প্রেমিকের গলি
স্প্যানিশ গিটার হাতে রাতভর বাউল-বাউলি।

কিছুদিন মিনিস্টেপে কোনোমতে একটুখানি পা
রাখতে হচ্ছে। অভদ্র রোমশ আর্দ্র হাত
ঝেঁটিয়ে সরাতে হয়। ঘেমো টেরিকটের পকেটে
অমল কিশোর মুখে বন্ধ কারখানার অন্ধকার।
কচি গোঁফ, দোপাটির মতো সোঁদা রোগা গাল
আহা, কতদিন মাছে-ভাতে বাঙালির ছেলে
খায়নি যে পুকুরের টাটকা রুই!

চৌরঙ্গি রোড! তার রাজেন্দ্র ফুটেতে
যে কাঁচামাংসের দাবি শরীরে শরীরে
ছিপি খুলে ভরে দিলে বড়লোকি খেয়াল মেটাতে
সে-দাবিতে পেটে ভাত থাক বা না-থাক
দু-তিনটি কৃষ্ণ শিশু ভিখারিনি মার
ঘুমিয়ে ছিটিয়ে আছে, গালের জলের দাগ নিরুপায় খিদের কান্নার।

কে এক পাগল যেতে যেতে
ধাতুচক্র রেখে দিল সন্তর্পণে... অলৌকিক...

ও যেন অঞ্জলি দিল কাকে।
উদ্ধত প্রপাত ঝরে, ক্রুদ্ধ ধারাপাত...
জন্ম নিচ্ছে বধূসরা, নারী থেকে হয়ে যাচ্ছে নদী,
চক্রাকারে নিজ-অববাহিকা যে ঘোরে,
কোনোদিন যাবে না সে তোমার সাগরে।

চর

প্রদীপচন্দ্র বসু

এই সেই চর যেখানে মজেছে এসে নদী
জলের আয়না থেকে অগোছালো জেগে ওঠা মাটি
আর, মাটির সন্তান কিছু গাছপালা, কুঁড়েঘর, চাষ,
মানুষের ব্যবহৃত আবর্জনা, কূট ও কচালি...

এই সেই চর যেখানে নদীর ঢেউ স্তব্ধ, মাথা নত
তবু আসে, উড়ে যায় শাদা কালো মেঘ আকাশের।
ডাকে পাখি, বসে গাছে, ওড়ে প্রজাপতি,
ভুবনডাঙার থেকে নৌকো নিয়ে আসে পর্যটক।

বাতাসে কল্লোল নেই, চারপাশে শুধু ঘোলা জল
এখানেও দেখি আছে ভালো-লাগা, টান প্রকৃতির
এই অন্য আকর্ষণ ব্যতিক্রমে স্বাভাবিক খুব
যার উপলব্ধি ভিন্ন, অনুভব আড়ালে নীরব!

অথবা এমন বলি, ভালো-লাগা, অপছন্দ হওয়া
আমাদের কাছে যাওয়া, দূরে বসে থাকা উদাসীন,
জীবনের অলৌকিক সুন্দর খুঁজে নেওয়া ভাষা,
সব থাকে এই বুকে যেখানে মজেছে এসে নদী।

গভীর ইঁদারা তুমি

কৃষ্ণা বসু

গভীর ইঁদারা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ!
স্বচ্ছ জল, ছলোছল, তৃষার্তের শান্তি
হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ দূরে, কিছু দূরে,
আমার সমগ্র সত্তা ঘিরে তীব্র তৃষ্ণা,
আমি কি তোমার কাছে যাব, প্রিয়?
ইঁদারা আমার, হায়, সুপেয় পানীয়,
কতবার হাঃ জীবন, মরীচিকা জল
ছুটিয়েছে ঘাড় ধরে বালি ভেঙে ভেঙে,
ছুটে গিয়ে স্তব্ধ দেখি শুখা নাঙা বালি,
আজ বেলা পড়ে আসে, আজন্মের তৃষ্ণা
নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখি ইঁদারাকে; —
ঠাণ্ডা জল, কালো জল, স্নিগ্ধ জল নিয়ে
দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি, জীবন-শুশ্রূষা, —
ইঁদারার দিকে যাই খুব ধীর পায়,
সমস্ত জীবন ধরে তৃষ্ণা নিয়ে, হায়!

মঞ্জুষবাবুর ছায়াচিত্র

হাবীবুল্লাহ সিরাজী

মঞ্জুষবাবু, ভেজা চাঁদে কার পুরাণ-শর্তে নোখের আঁচড়
বেড়ি দিলে জল সেতুর কোমরে হাঁসফাঁস করে গঙ্গার স্বর;
নাভি ঠোকরায় কাঠ-পতঙ্গ, ঢোলে ঘুম দেহে কুয়াশার চর
ন্যাড়া মাথা খচে তল্পি-তালাশে, খালাসিরা ভাঙে বৈঠার জ্বর!
বুনো বায়ে সরে ঝুরো মাটি-বালি, তুলোধুনা হলে হাড়ের শহর
কাক-পিঁপড়ের ফালি আড়কাঠি খোঁজে ভুজঙ্গ কায়ার বহর;
শঙ্খ-সিঁদুরে ভাগাভাগি শেষে খেরো খরচায় ইতি, অবসর!
মঞ্জুষবাবু, কূল-প্রতিকূল দুই বন্দরে করে কে খবর?

চিত্র ১
মঞ্জুষবাবু তো এক মাটির ঈশ্বর।
তাঁর চাকে কাদা ও ঘামের গন্ধমিল,

কাঠামোর গায়ে আঙুলের ওঠানামা
রোদে ও আগুনে পোক্ত করে মহানাম।
মাতাল পাতাল খোঁজে চাঁদের কপালে...

চিত্র ২
মঞ্জুষ কবিতা লেখে, নুনে চাল ভাজে।
কাগজে দস্তুরি লিখে ইন্দু-বিন্দু জপে,
জোড়া সাপ সম্মুখ-সমরে বিষ দিলে
পেটো হাতে বল্লভীরা কোমর দোলায়,
জাফরি বাঁচিয়ে মুখে পড়ে ফালি আলো।

চিত্র ৩
মঞ্জুষের শখ ছবি তোলা। দ্রবীভূত
আগুনের কব্জা থেকে টেনে তোলে খুন,
বনে ও বন্দরে ফেরি হয় পোড়া রুটি
পাখিটি কি খুব পোষা? না এখনো খাঁচা
দেখে খড়কুটো মনে করে, উম খোঁজে!

ঘাটের পাথর ভুলে মঞ্জুষবাবুরা মন্দ হাঁটে। পালাক্রমে
মেঘ-সূর্য মুখ নাড়ে, মস্তি করে হাতি পোষে ফজুল-বখাটে।
ভাবুন তো, আলিবর্দি খাঁর নাতি জুতো ফেলে বুড়িগঙ্গা ছুঁলে
তবেই না লাটবাহাদুর বন্দুক ফাটিয়ে কেল্লা জেল্লা করে।
পাটিগণিতের যোগ বুকে চাপ দেয়। আলোহীন লণ্ঠনের
টুটা আংটা ছাদে ঝোলানোর মুহূর্তেই বিড়ালের চোখে পড়ে।

চিত্র ৪
চিত্তে তরল আনন্দ বহে
খণ্ড শোকের সভ্যতা কহে :
অথৈ দরিয়া নীল আসমানে
ফেনাটুকু দিয়ে হৃদয় তো টানে!

চিত্র ৫
কড়িবরগার নীচে বুকে কল
মুখে নল আর হাত টলমল,
অ্যাম্বুলেন্সে শালু মোড়া ছল
ধীরে-ধীরে কাটে। কী বিচিত্র ফল!

চিত্র ৬
নট ও নটীর খোলা ভূমি নয়
তুমি-আমি ছেড়ে আলো নয়-ছয়,
তুষ পোড়ানোর গন্ধেও ক্ষয়
সফল সন্ধি জানে পরাজয়!

মঞ্জুষবাবুর এ-বিলাসকাব্যে ক্যামেরায় কোনো খুঁত নেই,
শব্দে ভুল নেই, শূন্য নেই বামে। তবু বারবার কাট্ হয় :
নায়িকার ঠোঁট নড়ে — নায়কের জিহ্বা বসে, মলাটের ফাঁকে
আখ্যানের অর্থ আলো পর্যন্ত পৌঁছুতে দড় হয়ে টাল খায়।
আজ থাক, কাল সূর্য পেলে তোলা যাবে সার অংশ। প্যাক-আপ।

একগুচ্ছ রক্তকরবী : নন্দিনীকে

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

(রক্তকরবীর পঞ্চাশ বছর অভিনয় উপলক্ষে)

জীবনটা তোমার কাছে এক মস্ত উৎসব
ভোরে ঘুম ভেঙে উঠে তুমি জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাও
নীল আকাশে তখন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে ভোরের মায়াবী রং
হয়তো উড়ছে দু-চারটে বোহেমিয়ান চিল
তুমি লাফ দিয়ে উঠে পড়ো বিছানা থেকে
প্রতিদিনের মতো এক শরীর উল্লাস নিয়ে ভাবতে থাকো
এই দিনটা অন্য যে-কোনো দিনের থেকে হবে একেবারেই আলাদা
শাড়িটা বদলে নিয়ে তুমি বেরিয়ে পড়ো রাস্তায়,
সঙ্গে একমুখ হাসি আর বুকের মধ্যে চুবচুব ভালোবাসা
একটু পা চালিয়ে পথ চলতে থাকো নিজের মতো করে
ঘাস, গাছপালা কিংবা আকাশ যার সঙ্গেই চোখাচোখি হয় প্রত্যেককেই উইশ করো
বলো, 'কী খবর তোমাদের? আমি খুব ভালো আছি'
আবার এগোতে থাকো কেননা যেতে হবে আরো অনেকটা পথ
যেন কেউ তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে দূরে কোথাও
তুমি আরো একটু জোরে হাঁটো
চেনা কারো সঙ্গে দেখা হলে 'সুপ্রভাত, ভালো থাকবেন' বলে এগিয়ে যাও
চেনা না হলে মনে মনে বলো, 'তুমিও ভালো থাকার চেষ্টা করো'

পথের দু-পাশে ঝুঁকে থাকা কদম, শিউলি আর সোনাঝুরি
স্পর্শ করে তোমার উড়তে থাকা চুল
ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তোমার শাড়িতে চুমু খায় চোরকাঁটা
তোমার আঁচল ছুঁয়ে যায় তুমুল হাওয়ারা আর টেনে ধরে কী এক দুষ্টু ইচ্ছেয়
তুমি সবাইকে দু-হাত তুলে বলতে থাকো, 'দ্যাখো, আজ দিনটা কী ভালো তাই না?'
তারপর আবার পেরোতে থাকো পথ
তাকাতে থাকো এদিকে-ওদিকে
তোমার দু-চোখ ছুঁয়ে ইতিউতি স্পষ্ট চাউনি
যেন কাউকে খুঁজছ অথবা খুঁজছ না
অথবা অপেক্ষা করছ যেন কেউ এখনই আসবে
কিংবা দাঁড়িয়ে পড়ো একটু নির্জন হলে
শরীরে ছন্দ তোলো নাচের ভঙ্গিমায়
এভাবেই রক্ত সঞ্চালন করো শরীরে যাতে বাকি দিনটাও চনমনে থাকা যায়
এমন ভাবাভাবির মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছ তোমার গন্তব্যের দিকে
হঠাৎ আকাশে মেঘ করে এলে তুমি উল্লসিত হও
কালো মেঘ চোখ পাকিয়ে আসছে দেখে তুমি হেসে হাত নাড়ো
বলো, 'ও মেঘ তোমার সঙ্গে আমার তো কোনো হিংসে নেই'
তাতেও নিরস্ত হয় না মেঘ, হয়তো রেগে গিয়ে ঝরাতে শুরু করে ঝিরঝিরে বৃষ্টি
তুমি হাসিমুখে ভিজতে থাকো, ভিজতেই থাকো
বলতে থাকো, 'ও বৃষ্টি, তুমি তো আমার অনেকদিনের বন্ধু'
তোমার ফিকে ফিরোজা রঙের শাড়ি ভিজে চুপচুপ হয়,
তোমার ঘন চুল বেয়ে নামতে থাকে জলের ফোঁটা
তোমার কপাল, গাল ও থুতনি বেয়ে নামতে থাকে বৃষ্টির জল
তুমি আর একবার শরীরে ফুটিয়ে তোলো নৃত্যের ভঙ্গিমা
শরীরে ভরিয়ে তুলতে থাকো তুমুল আনন্দ
হঠাৎ হাওয়ায় শুনতে পেলে কী এক সুরের মূর্ছনা
যেন বেজে উঠল কারো মোবাইল ফোন
তুমি এদিক-ওদিক তাকালে, কিন্তু কেউ কোথাও নেই
তুমি হাওয়ায় শুনতে পেলে, 'সুপ্রভাত নন্দিনী, কেমন আছ?'
তুমি মিষ্টি করে হাসলে আর বললে, 'ভালো খুব ভালো, তুমি?'
ওদিক থেকে আর কোনো উত্তর এল না, শুধু এক ঝলক হেসে উঠল দুরন্ত হাওয়া
অথবা কেউ ফিসফিস করে বলল, 'ভালো, খুব ভালো,
তুমি সারাদিন আমার কথা ভাববে তো, নন্দিনী?'

তুমি এবার বাড়ি ফিরে চললে, যেন এই সংলাপটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিলে এতক্ষণ
বাড়ি ফিরে চললে, এবার একটু জোর পায়েই

কেননা তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে তোমার সংসার
তোমার এখন সারাদিন কত টুকিটাকি কাজ
এখনই চা করতে হবে দু-পেয়ালা
আরো কত ঘর-গেরস্থালি, রান্নাবান্না
কাউকে হয়তো ফোন করতে হবে
হয়তো কেউ আসবে বলেছে তোমার সঙ্গে কথা বলতে, কিংবা গল্পগুজব করবে একটু
হয়তো কেউ একটা বই দিয়েছে সেটা পড়ে শেষ করতে হবে
হয়তো কিছুক্ষণ আবৃত্তি করবে তোমার কোনো প্রিয় কবিতা
হয়তো কোথাও যাওয়ার কথা আছে সন্ধেয়
হয়তো কারো সঙ্গে দেখা করতে হবে, কারো জন্য কেনাকাটা করতে হবে কিছু
এমন ভাবতে ভাবতে তুমি পৌঁছে যাও তোমার বাড়ির কাছে
চাবি খুলে ঢুকে পড়ো তোমার প্রিয় ঘরটিতে
তোমার নিজের হাতে সাজানো ঘর তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে
তোমার বাড়ির কেউ তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি
তোমার ছবির মতো সাজানো ঘরগুলিতে ঘুরতে থাকো একা একা
এই ঘরগুলির প্রতিটি ইঞ্চিতে তোমার শিল্পের ছাপ
কত কিছু কেনো তুমি আর সাজিয়ে রাখো ঠিকঠাক জায়গায়
ততক্ষণে তোমার আর একটা জীবন শুরু হয়
প্রতিটি মুহূর্তই ব্যস্ততায় ভরা আর সেই ব্যস্ততার মধ্যেও তো এক আশ্চর্য আনন্দ
ব্যস্ততার মধ্যেও তো খুঁজে নিতে হয় শিল্প
যাতে নিখুঁতভাবে সমাপন করা যায় প্রতিটি দৈনন্দিন কাজ
সারাদিন এত সব ভাবো, আর হাত চালাতে থাকো গেরস্থালি শেষ করতে
তার মধ্যেই কারো ফোন বেজে ওঠে, তুমি দ্রুত গিয়ে রিসিভার তোলো
কিছুক্ষণ কথা বলো তোমার স্বাভাবিক প্রগল্‌ভতায়, তোমার স্বশাসিত উচ্ছ্বাসে
টেলিফোন শেষ হলে কিছুক্ষণ তার কথা ভাবো
সারাদিনে এমন কত ফোন
তুমি কাউকেও নিরাশ করো না
তুমি জানো তোমার সঙ্গে কথা বললে সবাই একটু খুশি হয়
তুমিও তো কম খুশি হও না এই সব তাৎক্ষণিক আলাপনে
এভাবেই নিজেকে একটু একটু করে ছড়িয়ে যাও অনেকের মধ্যে
তোমার কিছু টুকিটাকি দুঃখ আছে তা ভুলে থাকার চেষ্টা করো
বরং এমন কিছু ভাবতে থাকো
যা তোমার সারাজীবন ধরে একটু একটু করে সংগ্রহ করা ঐশ্বর্য
মনে মনে বলো, কিছু তো পেয়েছি জীবনে, যা পাইনি তা নিয়ে কেনই বা আক্ষেপ!

ছোটো ছোটো দুঃখগুলি কাছাকাছি ঘুরঘুর করলে
তাদের ছোট্ট একটা টোকা দিয়ে সরিয়ে দাও অনেক দূরে
তুমি তখন তোমার ডায়েরিটা খুলে বসো, লিখতে থাকো তোমার পাওয়ার কাহিনীগুলো
স্মৃতি তো সুখেরই হয় সব মানুষেরই তা হাজারবার জানা
তবু কখনো তো একটু মন খারাপ হতেই পারে
খুব মন খারাপ হলে
আবার কোনো প্রিয়জনকে একটু টেলিফোন করে নিজেকে জাগিয়ে তোলো
তোমার সারাটা দিন এভাবেই কাটে
এমনই উৎসব করে তোলো দিনের প্রতিটি মুহূর্ত
জীবনের হাজার দুঃখ থেকে একটি গরবিনী রাজহংসীর মতো ছেঁকে তুলে নাও
সুখের মুহূর্তগুলো
তুমি জানো কিছু পাওয়া আর কিছু না-পাওয়া নিয়েই তো জীবন
কোনো মানুষই তো জীবনের সব কাঙ্ক্ষিত বস্তু পায় না
কিছু না-পাওয়া নিয়েই তাকে বেঁচে থাকতে হয়
তা হলে শুধু শুধু মন খারাপ করে কী বা লাভ!
তবু কোনো বিষণ্ণ মুহূর্তে তুমি কেঁদেও ফেলো
তুমি জানো কিছুক্ষণ চোখের কোণে জমে থাকা জল ফেলে দিলে
তুমি বেঁচে উঠবে নতুন করে
তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ো পরবর্তী কোনো দরকারি কাজে
তুমি জানো জীবনটা একটা উৎসব ভেবে নেওয়াটাই প্রত্যেক মানুষের উচিত
আর তা খুব একটা কঠিন কাজ তাও নয়
তারপর তুমি স্নান করে প্রিয় শাড়িটিতে ওতপ্রোত হয়ে অপেক্ষা করো তার জন্যে
যে তোমাকে দেবে বলে বহুদূর থেকে নিয়ে আসছে একগুচ্ছ রক্তকরবী।

প্রতি মুহূর্তের মৃত্যু

সুজিত সরকার

হলুদ কাঁঠালপাতা খসে পড়ল সামান্য বাতাসে —
পাশের সবুজ পাতাদের কথা ভাবি।
যেটুকু সময় লাগল ঝরাপাতাটির মাটি ছুঁতে
তার মধ্যেই পাশের ওই সবুজ পাতারা
কিছুটা হলুদ হল ভিতরে ভিতরে,
যদিও বাইরে তারা তেমনই সবুজ।
প্রতি মুহূর্তের মৃত্যু আমরা কেউ দেখতে পাই না!

আবার নতুন করে

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

শুরু হয়েছে
আবার নতুন করে সব শুরু হয়ে গেছে
যেসব ব্যাপারে হৃৎপিণ্ড ধক ধক করে উঠত
তেমন বিষয়গুলি
ধীরে ধীরে অনন্ত সময়ে থেমেছে
সবাই নিজের মতো
পৃথিবীর কাজকর্মে আবার ফিরতে চায়
রাস্তা ধুয়ে চলে যায়
করপোরেশনের জলগাড়ি
ধোঁয়াগাড়ি ঢুকে যায় অলিতে-গলিতে
মশাদের কাজকর্ম বাড়ার আগেই
বুঝতে হবে হয়তো বা তাদের মৃত্যু হয়েছে

দুপুর রাস্তায় কে ডাকে
আতাফল আতাফল
কেলা সিঙ্গাপুর
চুল ছেঁটে কেউ স্নান করে রাস্তার কলে
সবই যেন নতুন করে
পালিয়ে দেখা ম্যাটিনির ছবি
রেফারির মতো সঠিক নির্দেশে চলেছে

এখন সমস্ত চলুক
চলতে চলতে গাঢ় জীবনের মধ্যে সবকিছু
ঢুকে যাক
চারপাশে যে শব্দ হচ্ছে সেই শব্দে
আবার কাজকর্ম শুরু হয়ে যাবে

জাহাজ দেখলেই

কল্যাণ মজুমদার

জাহাজ দেখলেই কেবলই মনে হয়
দূরের আহ্বান গভীর হাতছানি
জড়িয়ে রাখে শুধু বিমূঢ় পরাজয়।

নদীর ভাষা ভুলে সাগরে ঢেউ নীল
বিপুল সমারোহে বনানী ফুলে রাঙা
চেতনা চিরে চিরে একলা কাঁদে চিল।

জোছনা মুছে দেয় তামস উপচার
সোনালি দ্যুতি আনে অলীক প্রলোভন
আঁধারে কাঁপে শুধু মেধাবী হাহাকার।

যতই তুলি হাত ছাড়াতে দ্বিধা ভয়
অগাধ চোরাবালি কেবলই ডুবে যাই
অথচ মাস্তুল বেশি তো দূরে নয়!

নয়নে জ্বলে তবু অনল দিনরাত
দিনের গুণ টেনে প্রাণের অপচয়
হতাশে ভেঙে পড়ে অসাড় দুই হাত।

তবুও এই ঘর প্রাচীরে ঘেরা নয়
নিয়ত হানা দেয় কুটিল অজগর
কোথায় গরুড়ের নিহিত বরাভয়!

ঠিকানা কোথা খুঁজি? হাজারো সংশয় —
জাহাজ দেখলেই কেবলই মনে হয়
দূরের আহ্বান গভীর হাতছানি
জড়িয়ে রাখে শুধু বিমূঢ় পরাজয়

অথচ মাস্তুল বেশি তো দূরে নয়।

দুটি কবিতা

অজিত বাইরী

নিভিয়ে দাও প্রভু

সারারাত জ্বলে জ্বলে ক্লান্ত মোমবাতি
রাতের কিনারে পৌঁছে
স্বগতস্বরে বলল,
এবার নিভিয়ে দাও প্রভু।

তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে তারা।
তখন বিন্দু বিন্দু হিম জমেছে পাতায়।

স্তব বলো, মন্ত্র বলো, প্রার্থনা বলো
উইটিবির মতো নৈঃশব্দ্যের ভাষা।

সারারাত জ্বলে জ্বলে ক্লান্ত মোমবাতি
রাতের কিনারে পৌঁছে বলল,
রাত্রিযাপন শেষ হল
এবার নিভিয়ে দাও প্রভু।

নিজের ভেতরে যাও

মগ্ন হও, মগ্ন হও, মগ্ন হও —
যেমন জলের ভেতর মাছ, নীড়ের ভেতর পাখি
আর খোলসের ভেতর শামুক।
দ্যাখো, চরাচর কীভাবে গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে
তোমার ভেতরে।
শোনো, সমস্ত জগৎ উচ্চারণ করছে যে শব্দ
তোমার কানে কানে।
বাইরে বড়ো কোলাহল, নিঃস্ব হচ্ছে নৈঃশব্দ্য।
যাও, নিজের ভেতরে যাও —
তারপর ভাঙো,
বাদামের মতো ভাঙো 'আমি'র আবরণ।

অনুভব

ভক্তিব্রত চক্রবর্তী

কোন এক বৃদ্ধ জড়্‌গব মুরুব্বির মতো বলেছিল
'কিছুই সঙ্গে যাবে না হে' — এই আপ্তবাক্য শুনে
এক চতুর বায়স তার মুখের সঞ্চয়, আশ্চর্য পটুতার গুণে
উদরস্থ করে নিয়ে মনে বুঝি ভেবেছিল —
আমিও তো সঙ্গে যাব না অজানার অন্ধকারে।

কেউ কি কখনো নিজেকে সঙ্গে নিতে পারে —
কিছু ছাই ইতস্তত ওড়াউড়ি করে...আগুনের
কিংবা কবরের নির্মম শয্যায় শুয়ে থাকে, পুড়ে যায়
প্রখর গ্রীষ্মের তাপে ক্ষণস্থায়ী ধরাচূড়া সাজে —

সন্ধ্যায় যখন মঙ্গলশঙ্খ বাজে
সেই ধ্বনিময়তায় কোথাও সে বৃদ্ধ জড়দ্‌গব
অন্ধকারে কালের প্রতীক্ষায় বসে থাকে —
তাকে কেউ দ্যাখেনি কখনো।
আশ্চর্য অনুভব শুধু
কী এক অজানা ভয়ে কেঁপে ওঠে নিঃসঙ্গতা;
কে যাবে — কোথায় —
তার সঠিক উত্তর জানা নেই কোনো;
তবুও তো সব কিছু ধরণীর বুকের উপর
আরো বহুদিন জেনো
ফুল-পাখি-জোছনা রাত-হেমন্তের খড়
জেগে উঠে ঝরে যাবে কাল থেকে কালে —

তুমি বৃদ্ধ জড়দ্‌গব বসে থাকো
আপন খেয়ালে —

তিনটি কবিতা

অশোক রায়চৌধুরী

সেলুলয়েড

রঙিন ফিল্মে দুর্ভিক্ষ। মহামারী। অনাহারে মৃত মানুষ।
গবাদি পশু। পচা-গলা শবের ওপরে উদ্যত ও উদ্ধত শকুন।
মড়ি নিয়ে শেয়ালে-কুকুরে কাড়াকাড়ি। ছেঁড়াছিঁড়ি। মারামারি।
সবই দৃশ্যত ফুলের পাপড়ির মতো দৃষ্টিনন্দন, মনোরম মনে হয়।
এবং যেহেতু তা রঙিন সেলুলয়েড, বাতানুকূল, সুগন্ধি প্রেক্ষাগৃহে,
দুর্গন্ধ নেই কোনো, প্রশ্ন নেই নাকে রুমাল চেপে
ওয়াক... থু...

ডাক

কতদিন 'অশ্রু' শব্দটি রক্তের ভিতরে গূঢ় পরবাসী।
কতকাল 'বিরহ' এক বিস্মৃত নগরী,
'হাসি' এক শৈশবে ঘর ছেড়ে পলাতক
বালকের মতো।
'প্রেম' এক বিলুপ্ত নদীটি।
'মিতা' নামে কেউ ডাক দিলে
আমি সিঁড়ি ভেঙে উঠে যাই চিলেকোঠার
নগ্ন নির্জনে
বৃষ্টি-ভেজা মিষ্টি দুপুরে চিলের ডানায় উড়ে উড়ে
বসি ওই চেতনার চরে।
'বিরহ' শব্দটি শুনে আমি রোদ ফেলে
চলে যাই মেঘে —
হাসি ফেলে পাড়ি দিই অশ্রু নগরে।
কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাই দুঃখগন্ধ ভরা
স্মৃতির অঙ্গনে।
'প্রিয়' নামে কেউ ডাক দিলে
আমি বস্তি থেকে উঠে আসি হর্ম্যমিনারে।

আমিত্ব

সবাই বলেন, আমাকে দ্যাখো। আমাকে পড়ো।
আমাকে শোনো। আমাকে নির্বাচন করো।
আমিই সেই — 'সোহম্'। কাউকে কোথাও,
কখনোই বলতে শুনি না, আমি নই তুমি।
তুমিই সেই — 'স এব ত্বম।' এইসব দেখেশুনে
বাংলার এই সময়ের একজন প্রধান ও
শ্রেষ্ঠতম কবি বলেছেন — বাঙালির সব সর্বনাম
মুছে গিয়ে এখন শুধু একটি সর্বনামে
এসে দাঁড়িয়েছে, সেটি হল আমি, আমি এবং আমি।

একটি প্রেমের কবিতা

অমিতাভ চৌধুরী

জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে একটি হৃদয়,
আর আমি চেষ্টা করছি তাকে তুলে আনতে,
ভাগ্যিস জেলেরা মাছ ধরছিল দরিয়ায়।

বিকেল তখন —
রাত্রির আকাশে ফুটবে বলে তৈরি হচ্ছে দু-একটি ফুল।
আর আবিষ্কৃত হওয়ার বাসনায়
মনের আনাচে কানাচে উঁকি মারছে
কিছু নতুন শব্দ,
যদি সত্যিই হয়ে ওঠে প্রেমের কবিতা।

জলের মধ্যে ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে একটি হৃদয়।

তুমি জিজ্ঞাসা করো,
জানবে মনুষ্যহীন পৃথিবীর সে এক দ্বীপ,
প্রশ্নচিহ্নের মতো তার আকাশে ঝুলে আছে
একটি কবিতা —

হয়তো কথার কথা মাত্র।

সময় নয়, উড়ন্ত পাখির পাখনার সীমাহীন
আর একাকিত্ব, সময়-ঘড়ি ফিরিয়ে দিয়েছে
তট বয়ে ভেসে আসা বালির ধুলোয়।

ভালোবাসা, ক্রমশ পালটে যাওয়া একটি শব্দ
আকাশের সূর্যকিরণভরা মেঘের ছিদ্রে
যেমন কেবলই পালটে যায় শেষ বিকেল
আর তার রং।

লুসিফার, তোমার প্রলোভনে
একটি কিশোরী নিজেকে করেছে সমর্পণ —
তার দুটি হাত, মসৃণ উরু, শরীরের মাংস-হাড়,
গ্রীষ্মের ঝলসে যাওয়া রাত্রির মতো চোখ —

লুসিফার সাবধান হও।

জলের ভেতর ধীরে ডুবছে হৃদয়
দেখতে পাচ্ছি

দূর থেকে এগিয়ে আসছে ভাবনা,
বহু দূর থেকে
আমার পাশ থেকে উঠে
ব্রহ্মাণ্ড চলে গেছে যেখানে, সেখান থেকে।
অতি উজ্জ্বল নীল চোখের দ্যুতি আর ভারী পা —
এত ভারী
যেন পৃথিবীকে পেতে চাইছে স্মৃতি আর অনুভবে।

জলে ডুবে যাচ্ছে হৃদয়, আমি ছুঁতে চাইছি তাকে —
আর হাহাকারে সর্বস্বান্ত
একটি কবিতা
আপ্রাণ চেষ্টা করছে বেঁচে উঠবে বলে —

সময় ঘড়ি ভুলে গেছে জানাতে সময়।

দুটি কবিতা

বাঁধন সেনগুপ্ত

ভুলের আদলে তোলা

সব কিছু বুঝি অবশেষে ভুল হয়ে যায়
গোপনে সে চলাফেরা নির্জনে চেনা ইশারায়
এখনো যে পিছুটান —
ফেলে আসা মোহিনী-মায়ায়

চেনা সেই জলছবি কত কথা কত আলাপন
মধ্যরাতে প্রবাসে একদা কত-না কথন
আজ বুঝি একান্তই অর্থহীন সেইসব
ভুলে যাওয়া গানের মতন

থেকে গেল শুধু দগ্ধ-স্মৃতি আর রক্তপাত
তবু এখনো ভুল পথে রাতুলের অচেনা-প্রপাত
দেখা দেয় খেলা করে মনে পড়ে —
চেনা বা অচেনা ঘাত-প্রতিঘাত

ভুলের আদলে তোলা ছবিখানি
আজো পথ আটকায়।

অবয়ব

অর্ধ-শতক কেটে গেল এ-শহর এখনো অচেনা
সেই কবে বয়স বছর চারেক, সাতচল্লিশে পড়েছে পা
মুখগুলো কবে যে হারালো তা মনেও পড়ে না
প্রতিদিন মিছিলের পদধ্বনি, ছিল না হতাশার দেনা

নন্দিত জীবনের মোড়কে উঁকি দিত স্বপ্নের নবযুগ
সেদিনের শক্ত চোয়াল হেলে গেল কুর্নিশে-কুর্শিতে
নেভানো আগুনে নোয়ানো শব্দে বর্শার প্রতিমুখ
কথা বাড়ালেই কামঠ বা হায়নার দেখা মেলে রাতে

স্বপ্ন যদিও উধাও, ব্যস্ত শহর সওদাগরি ফিতে কাটে পার্বণে
বেকারি তালিকা শীর্ষে রেখেছে, পরিবেশ সুন্দর-নিশ্চুপ
এ-শহর যেন কয়েদি অর্ধ-শতক মাথা কোটে নির্জনে
এত প্রতিবাদ অনুগ্রহ গিলে খেল, তাতেই স্বস্তি-সুখ?

সেই ভালো, বয়স হলে তো অনেকের দ্রুত অবয়ব বদলায়
বাড়িটা তো লাল ছিল চিরকাল
তবু সাজেনি স্বপ্নের পতাকায়।

দুটি কবিতা

নাসির আহমেদ

ভালোবাসা দ্রোহী ও নির্ভয়

গোপন বর্ষণে যদি নিমগ্ন তোমার নির্জন পৃথিবী
তবে কেন প্রকাশ্যে খরার দগ্ধকথা! দাও স্নানযোগ্য তৃপ্তি সরোবর।
যদি প্রেম শুদ্ধতম সংগীতেরই কল্লোলিত অনন্ত মূর্ছনা
তবে কেন সময় কি অসময় — এই অনর্থক
প্রশ্নবিদ্ধ ভালোবাসা নিরাময়হীন এক যন্ত্রণার ক্ষত?
কেন বুকে তুলে নিলে সুরহীন স্তব্ধতার মতো নীরবতা?

যদি প্রেম শাশ্বতের ধারণাপ্রসূত নদী প্রতিমা গতিরই
যদি কাল-মহাকালে প্রবাহিত চিরন্তন স্রোত

তবে সব নীতিকথা সংশয়-পীড়িত। প্রাচীন বটের ঝরাপাতা
ঝরে যাক; আমরা এগিয়ে যাব শ্যামল নিসর্গ অভিমুখী
সীমাবদ্ধতার শর্ত নির্জনতার সব আচ্ছন্নতা ফেলে
গোপন এবং সব নিষিদ্ধ স্বপ্নের দিকে যাব।

সময়ের দুর্গম পথ পার হলে অমল বর্ষণস্নাত
হৃদয়ের স্বদেশ-সীমান্ত।
এই যে সংশয় এই দ্বান্দ্বিক সময় —
এই হিম বরফ পেরিয়ে গেলে তবে সূর্যোদয়
ভালোবাসা চিরকাল আলো-অভিসারী
সময়ের ঘড়ি ভাঙে দ্রোহী ও নির্ভয়।

কবির স্বপ্নের মধ্যে

এক অলৌকিক আলোর জগৎ আমি রচনা করেছি এই অন্ধকারে
তোমরা কেউ কোনোদিন দেখবে সে আলোক!
অনুভব করে তবে বুঝে নিতে পারো
সেই স্নিগ্ধ আলোর মহিমা আর সৌন্দর্যময়তা।

এক অদ্ভুত চেতনা দিয়ে আমি শুনি মানুষের
রক্তাক্ত লাশের মধ্যে বসে-থাকা ওই যে মাছিটি, তার
গুঞ্জনের সাংগীতিক তাৎপর্যটুকুকে। একদিন আর কোনো খুনি
অবশিষ্ট থাকবে না এই রক্তস্নাত পবিত্র মাটিতে।
আমি সেই ভবিতব্য পাঠ করি
সবুজ শ্যামল গাছের পাতায় আর রৌদ্রে ঝিকিয়ে ওঠা
নদীস্রোতে। আমি আশাবাদী।

সহস্র বছর পরে একটি জাতির অহংকারে
যে-মাটি জেগেছে দীপ্র আশার রোদ্দুরে
আমি তাতে বীজ বুনি ভবিষ্যতের —
স্বপ্নের সোনালি বীজ বুনি। যেহেতু দিনের পরে
রাত্রি আসে এবং নিদ্রাও। অতএব স্বপ্ন তো থাকবেই।

কবি তো স্বপ্ন দেখে আমরণ; তা না হলে কী দেখাবে
জাতিকে সে স্বপ্নহীনতার এমন দুর্দিনে!

দুটি কবিতা

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়

পটিয়ায় ঝড়

গাছের পাতায় যে রূপ দেখলে মন ভালো হয়ে যায়
সেই রকম একটা দিনের শুরু হল আজ।
পাহাড়ি চট্টলা ছাড়িয়ে দক্ষিণে কর্ণফুলী
বৈশাখের শেষ দুপুরে কাল দাবদাহে পুড়েছিল সব
নারকেল গাছগুলো থম-মারা আকাশের কাছে ঊর্ধ্বমুখী
ডোবার জলে বকের ঠোঁটই ডোবে না এমনই শূন্যতা
তবু ময়ূরপঙ্খি খাটে কাল রাতে ভীষণ ঝড় উঠেছিল।

সকালে দুটো পুরুষ্টু আম দেখি নিস্তেজ পড়ে আছে ঘাসে
শেষরাতে স্বস্তির বৃষ্টি ঝরেছে খানিক, তাতেই
কাদামাখা নরম নিদ্রা, নিদ্রার অধিক সুখ।
এখন আকাশের রং আর বাতাসের গন্ধে, বুকে
টের পাই নবীন ঝড়ের গোপন বার্তা
সমস্ত গুমোট সরে গিয়ে আবারো বৃষ্টি আসবে
তুমুল, দক্ষিণের খোলা জানালার পরদা উড়িয়ে
আবার একটা ঝড় আসবে, আসুক
আবার বৃষ্টিতে ভিজে যাবে প্রভাত-শয্যা
কপালের বর্ণিল টিপ, পায়ের ঘুঙুর, মসৃণ ত্বক
লাল তিল, অবারিত ধূসর শস্যখেত, উদ্‌ভ্রান্ত দূর্বাদল
সকল প্রস্তুতি নিয়ে প্রলয় নৃত্যের জন্যে অধীর প্রতীক্ষায়
রোদের ঝিকিমিকি-মাখা মায়াবি পাতারা কেঁপে উঠল আকাশে
দমকা বাতাসে অকস্মাৎ ঘর-ছাড়া পাখিদের ইতস্তত ওড়াউড়ি
পটিয়ার সকালে আগাম সংকেত ছাড়াই আবার ঝড় এল
অঝোর বৃষ্টিতে ভিজে একটা শোভন ঝকঝকে দিনের দেখা পেলাম।

অম্বিকাচরণের ভগবান দর্শন

অম্বিকাচরণের বুকে জল জমেছে
তিনি বাঁচবেন না, মারা যাবেন।

সারারাত বৃষ্টি ঝরে সকাল নাগাদ ধরে এসেছে
টগর যূথী স্থলপদ্মের শরীরে কাদা আর মৃত জল

অম্বিকাচরণের বুকে এখন তীব্র শীত, শতচ্ছিন্ন
কাঁথার নীচে একফালি উষ্ণতা ভাগাভাগি করে শুয়ে আছে
বাস্তুসাপ, উঠোনে সুবচনি হাঁস, শব্দাশ্রিত মনুষ্য চলাচল।
অশীতিপর অম্বিকাচরণ একদা পঁচিশে ছিলেন —
গালপাট্টা গোঁফ, মায়ার কোষানাও আর বাঁশের লগি,
শোলটাকির ঝাঁক, খালুই আর নীল হ্যারিকেন ছিল —
ভিনদেহে জল ভরে নতুন জীবন তৈরি করার
নিপুণ কারিগরের বুকে একটুও তাগদ নেই আর
কামারবাড়ির হাপরের শব্দ কেবল শোঁ শোঁ...

কানশায় ভর দিয়ে দিয়ে কইমাছগুলো
খুব ভোরে ডাঙায় উঠে আসে, চরে বেড়ায়
অম্বিকাচরণ ধরো, ধরতি পারো না আগের মতো
ভরতি পারো না হাতের খালুই — ধরো না হয় পথ ছাড়ো।
অম্বিকাচরণের বুকের কলসিতে খলখল জলের বলক
সেখানে সরপুঁটির রঙিন পাখনা, রুপোলি আঁশ, স্বপ্নিল ইশারা
তাদের পেটভরা ডিম কেবলই স্ফীত হয় —
মাছেরাও গাভীন হয় তবে, কী আশ্চর্য!
অম্বিকাচরণের চোখ অর্ধেক খোলা অথবা অর্ধেক বোজা
ওই চোখে তার আজ ভগবান দর্শন হবে।

নীলকণ্ঠ

শ্যামলেন্দু রায়

একরাশ ধুলোবালি বৈঠকখানা ঢেকে থাকে,
সময়ের ভ্রূ-ভঙ্গি ইতস্তত সম্ভারের গায়ে
উড়ে যায়,
ধু ধু বালিয়াড়ি, ঢেউ গেছে বহুদূরে সরে
এদিক ওদিক থেকে বাতাসেরা ডাকাডাকি করে
একদা গর্বিত নোঙর মাথা নিচু জপ করে যায়,
দিনান্তবেলায়।

কবেকার মাস্তুল, ঋজু যেন গাছের মতন
গাণ্ডীব তুলে ধরে সফল হনন

দাঁড়িয়েছে পাশে —
মুঠো হাতে তুলে দিয়ে কবচ-কুণ্ডল
মহাপ্রস্থানের পথে কেউ করেছে গমন।
সটান দাঁড়ানো গাছ সাক্ষী থাকে, সাক্ষী থাকে হিমবাহ,
তুষার যুগের শেষে যদি ফিরে আসে
সৃষ্টি-ঝরা জীবনের দাহ!
গাছেরাও নীলকণ্ঠ হয়, অঙ্গারাম্লজান
শুষে নিয়ে দিনভর, প্রাণীদের দেয় অম্লজান,
মায়া দেয়, ছায়া দেয়, রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে,
ফল দেয়, ফুল দেয় অযুত সম্ভারে।

দুটি কবিতা

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

জ্যোৎস্নার অক্ষরগুলি

জ্যোৎস্নার অক্ষরগুলি বড়ো বেশি ওড়াউড়ি করে
ছুঁয়ে যায় যুবতীর শাড়ি কানপাশা রমণীর চোখ মুখ
শ্রাবণী খোঁপায় বাঁধা ফুল
কারো কারো এলোমেলো শয্যায় ঘুম ভাঙায়
বুকের গোপন কাঁটা উপড়ে নিয়ে মজা করে
মুছে দেয় কাতর গোঙানি।

সন্ধ্যার পাঠশালায় স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ হাততালি দেয়।

আমি দেখি উন্মাদের পাঠক্রম। কামুক আকাশে
মাথা ঠোকে কঠিন পুরুষ।

জ্যোৎস্নার অক্ষরগুলি ভাষা বদলে ভাষা খুঁজে
পিঁপড়ের সারির মতো মিছিলে মিলায়
তারপর নদীর শান্ত স্রোতে ভেসে যায় উজানের দিকে
মাছের নরম আঁশে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা বা সাবিত্রী শুনতে চায়।

অথবা গায়ত্রী ছন্দে শুদ্ধ উপবীত ছুঁয়ে হতে চায় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ।

খরা

ধানবীজে গান নেই ঘুমিয়ে পড়েছে...

কৃষকের স্বপ্নে ঘুণপোকা পাঁজরা ফুটো করে
বেড়ে যায় রক্তের যন্ত্রণা।

কুমারী মাটির গর্ভে বোবা কান্না মেলছে শিকড়।

রাত পুড়ে দিন পুড়ে নষ্ট ভ্রূণ
বীজধান ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাত্রিকথা

সৈয়দ কওসর জামাল

বসে আছি অসমাপ্ত রাতের ভিতরে
কিছু রং তখনো লাগেনি গায়ে, উত্তেজক নেশা
তখনো নামেনি খাদে, চেতনার কাছে।

এই রাত ধরে আছে স্বপ্নের শেষ সম্বলটুকু এক হাতে
অন্য হাতে ছুরি, কাঁচি — কেটেছে দিনের
পুঁজরক্ত ঝরে-পড়া ক্ষতস্থানগুলো।

অবরুদ্ধ, চাপা কান্নাধ্বনি
অন্তর্বর্তী গোধূলির দীর্ঘশ্বাসমাখা ধুলো বাতাসে উড়েছে
স্বপ্নের ভিতর থেকে তখনো ঝরেছে মধু একটু একটু করে।

সার বেঁধে পিঁপড়েরা সেদিকে চলেছে
অন্ধকার তখনো যেটুকু ছিল উষার শরীরে
মুছে দিতে খাদের ভিতরে নামে দ্রুতগতি নক্ষত্রগঞ্জিকা।

নেশার স্পন্দন জাগে প্রতিটি আকাশে, কৃষ্ণগহ্বরের মুখে
এত প্রতিধ্বনি ওঠে, যেন দিন নয়
রাতের পাঁজর থেকে ঠিক বেড়ালের মতো লাফিয়ে নেমেছে

আরেকটা বিক্ষুব্ধ রাত, যে ছিল গভীরে
অনন্ত বিষের ভাণ্ড মুখে করে, দীর্ঘ অপেক্ষায়
জটিল, অবদমিত রাত্রিকথা আমাকে শোনাতে!

দুটি কবিতা

সুবোধ সরকার

অশোকবনে সীতা

কলঙ্কের ভয়ে অশোকবন ছেড়ে হয়েছ বন্দিনী দশতলায়
এখনো দিকে দিকে বকুল পড়ে থাকে রাস্তায়
দারুণ একখানা হলুদ শাড়ি পরে
গড়িয়াহাট রোডে দাঁড়ালে
পুলিশ সরে গেল আড়ালে।
আমি কী পাশে গিয়ে বলব এসো তুমি
আমার ট্যাক্সিতে ওঠো
কপালে যাই থাক, পুলিশ জেনে যাক,
কী থাকে জীবনের বিকেলটুকু আজ হারালে?

জেব্রা ক্রসিং

ষোলো বছর পরে পেলাম তোমার চিঠি ই-মেলে
যখন কোনো ফারাক নেই
হি-মেলে আর ফিমেলে।

ষোলো বছর পরে এখন
তা হলে আর কী করি?
তোমার স্বামীর, তোমার ছেলের
জেব্রা ক্রসিং-এ হাত ধরি।

নিরুদ্দেশ চাবি ও রুমাল

হাসান হাফিজ

রুমাল হারিয়ে যায়, চাবিও পকেট থেকে অলক্ষে নিখোঁজ
ওদের কি পাখা আছে, নেই যদি উড়াল কী করে দেয়?
রুমালের সঙ্গে আছে ব্যক্তিগত ঘামের বন্ধুতা কিংবা নির্ভরতা
চাবির শরীরে লগ্ন তালা খুলে প্রবেশের নিশ্চিত সুযোগ

ঘর বা ড্রয়ার তাতে উদোম করার স্বস্থ শান্ত অধিকার
কিন্তু কবিতার বীজ দুঃখকষ্ট চোরাগোপ্তা গ্লানি অপমান
শরীরে ও মনে ঠিকই জুলুনির নোনতা শর্তে বেঁচে থাকে
বহুগুণে লালিত বর্ধিত হয় উৎপাতের উৎকর্ষ বুনন মিহি
মগজে ও হৃৎপিণ্ডে, স্থির নম্র অধিষ্ঠান জ্বলে থাকে জেগে থাকে
এসবও হারিয়ে গেলে কিংবা গেলে অনন্তের অগস্ত্যযাত্রায়
হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম, কিন্তু তারও দরোজায় দেখতে পাই
ওত পেতে আছে এক স্থবিরতা মরচে পড়া হুহু দীর্ঘশ্বাস

অপরাধী কারা

সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের জীবনের অনেকটা কেটে যায় মিশ্র অপরাধে
যাদের ভক্তি দিয়েছি এতদিন তারা সব ভুল
আরো দশজন পৃথিবীতে শোয় স্বপ্ন দ্যাখে
মধু ও মরিচ এসে একদিন ভরে দেবে
ভাঙা বাড়ি সন্তানের মুখ পরকীয়া প্রেম।

সে-সব তো সবার যায়
প্রেমিকার গ্রীবা ঠোঁট টুকরো টুকরো স্মৃতি
সাবানের ফেনা হয়ে ভেসে যেতে যেতে
নিজেই নিজের কাছে একদিন অস্তিত্ববিহীন।
তবু কিছু বাকি থাকে
সমাজ সভ্যতা জড়াজড়ি করে
শ্বাসভুক আকাশের দিকে ফিরে যেতে চায়।
আমি টেবিলে টেবিলে ঘুরি
অন্ধকারে আয়নায় ছায়া দেখে অশ্রুপাত হয়
হয়তো ডাকে না কেউ
পদপল্লবের ছোঁয়া দু-চোখে জড়িয়ে দেয় অপরূপ ঘুম
আমি জেগে উঠি
শ্মশানে শবের পাশে কাঠ পোড়ে
মন্দিরের চূড়া দূরে বয় নদী।

মনে পড়ে যেতে হবে শচীনের বাড়ি
মনে পড়ে পৃথা আছে বোস্টন শহরে
অপরাধী কারা আমি জানি
মনে পড়ে কালো মানুষেরা সবাই ব্যথিত।
প্রসঙ্গ ও মানুষ দাহ্য
পাপ ও পাপীর সঙ্গে দগ্ধ হতে হবে
জানি আমিও পুড়ব ছাই হয়ে যাব
তা থেকে যে আলো হবে তাপ হবে অভিঘাত হবে
পুজো শেষে সে আমার ঋণ-শোধ নৈবেদ্যর ফুল।

দুটি কবিতা

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

স্থায়ী ঠিকানা

গাছ ডেকেছিল, যাই পাতার আদরে
পাতার সবুজ ঘ্রাণ চেনাল ইন্দ্রিয়...
আকাশের নীচে বসে থাকি... হোক নীল বৃষ্টি হোক
ফুলের রক্তিম আগ্রহের দিকে চোখ মেলে রাখি
গাছ বলেছিল থাকো, যদি ইচ্ছা হয়
আমি তো মানবী নই... হব অন্য কারো

গাছের কোটরে আমি বসতি পেতেছি

কিছুদিন অভিমানে

ভোর বারান্দায় অপলক তাকিয়ে রয়েছে চাঁদ
কার অপেক্ষায়... ভেবেছিল
হয়তো পালিয়ে যাবে রতিরঙ্গী মেয়েটিকে নিয়ে

দরজা এখনো বন্ধ... শব্দ নেই... জানালার ফাঁকে
নিবিড় বিশ্রম্ভালাপ... কুঙ্কুমে কাজলে ছয়লাপ
জন্মনিরোধকের পাশে আধপ্লাস ঠাণ্ডা দুধ
ব্যথিত দু-চোখে দ্যাখে চাঁদ শেষে নিয়েছে বিদায়... ...

জানি এরপর কিছুদিন অভিমানে সে মেঘাচ্ছন্ন থাকবে

স্তন — দগ্ধ পদাবলী

মলয় গোস্বামী

মৃত্যু নেওয়ার মুখে, সে ফিরে তাকাল আজ; আর
আকাশে করুণ আলো — বের হয় স্তনদীপিকার...

ঝাঁপি

আজ দুপুরে সাপের স্বপ্ন। ভয় করিনি স্বপ্নে আমি।
কেমন যেন ঘাম জমেছে গলায়।

সাপটা কেমন ফণা তুলে, জলের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল!
মাঝেমধ্যে জিভের ছলাকলা।

ওপরে আমি দাঁড়িয়ে আছি। স্নান করা তো দূরের কথা!
গোপনভাবে অল্প অল্প কাঁপি।

হঠাৎ, আধো — ঘুম ভেঙেছে। পাশে তুমি শুয়েই। ... আমার
দুই হাতে দুই সাপ রাখবার ঝাঁপি!

তোমার দ্বারে কেন আসি

জানলায় প্রতিমা-মুখ!
বিস্রস্ত ব্লাউজ ছিঁড়ে
বেরিয়ে এসেছে অগ্নিদল —

নীচের সড়ক-পথে, নির্জন, সু-সন্ধ্যাকালীন
যুবক আরোহী; তার বল
প্রায় লুপ্ত! গবাক্ষ থেকে
তখনই নামল অগ্নিদুধ...

ধীরে বল ফিরে পায় সাইকেল-আরোহী
ওপরে তাকায় আর দু-পায়ের মাঝে
অসহ্য জমল বুদ্‌বুদ...!

নীরবে চাহিয়া রবো

দু-দুটো বাটিতে দুধ
পাতলা বস্ত্র দিয়ে ঢেকে
সে কোন মার্জার থেকে আড়ালে রেখেছে প্রিয়তমা!

অগম্য গ্রীষ্মকাল!
যে-কোনো কণ্ঠনালী বালি...
মার্জার বসেছে স্থির, লোমের ভেতরে বিনবিন...

তাকিয়ে বাটির দিকে,
সবার আড়ালে কাঁপে ক্ষমা!

তোমায় কিছু দেবো বলে

একটা পিঁপড়ে — চলেছে মাস্তুলে...

তুমি তো খুব ব্যস্ত কাজে আমার কোনো নবীন সাজে
আমি তখন প্রশ্নহীন আর সবুজ আঁচল তুলে
পিঁপড়েটাকে ব্যর্থ-তাড়া করি!

তোমার তখন ভ্রূ-কুঞ্চিত, একটু যেন ভয়েও ভীত
তারপরে তো দিবসশর্বরী

একটা দুটো পিঁপড়ে ধরে মাঝে মাঝে আপন করে
ও-মাস্তুলে নিজের আঙুল রাখি।
তুমি তখন ধরবে কাকে! বুকের আঁচল ব্যস্ত রাখে।
সুকৌশলে তোমার বুকে থাকি।

নিঃশব্দ চরণে

ও কি একটা সোনার পয়সা?
উতল নীবিবন্ধ ছুঁয়ে!
যার পয়সা, ঘুমোচ্ছে অক্লেশে।

চৌর্যপ্রিয় উলঙ্গ চোর
ঘরের মধ্যে ঘুরে ফিরে
হঠাৎ কিনা মাৎসর্যের বেশে

পয়সাকে দুই ওষ্ঠ দিয়ে
তুলতে গিয়ে হঠাৎ দ্যাখে চড়াই-পথের প্রান্ত!

অগ্নিতে অগ্নিতে ছাওয়া
সেই আগুনেই সোনার পয়সা এমন সমুজ্জ্বল কি?

উলঙ্গ চোর পয়সা-ঠোঁটে
ফুটন্ত দিক্‌ভ্রান্ত!

দুটি কবিতা

আবদুস শুকুর খান

বোধ

কবি কোন অনুভবে দ্যাখে মেঘের পালক
কোন সংকেতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা
উপমায়, অনুপ্রাসে উহ্য রাখে জীবন
কার কথা লিখে লিখে বুড়ো হয়
বুড়ো হয় দেখার চোখ, বুড়ো হয় কলম!
কার চিহ্ন আঁকতে
কবি আজ চিহ্নহীন।

অনন্তের পথে পা রেখে কবি কাফনে ঢেকেছে দেহ
কী এমন বোধহীন সংকেতে ভরে গেছে সত্যের ভুবন।

কবির কবরে প্রথম সূর্যাস্ত।
অজস্র আলোর মথ ঠোঁট নামিয়েছে
শাদা পাতায় অক্ষরের আরক্ত শ্বাস।

কলম

সকালের সুবর্ণ আলোর গন্ধে কলম
কার দ্যোতনায় জেগে উঠে; জাগাল আমাকে।
কেন শ্রাবণধার স্তব্ধ বুকে বুনে দিল অক্ষরবীজ
কেন শূন্যে শূন্যে ভাসে তার অচিন স্বর!

ওই অনালব্ধ অনন্য চেতনা লিখতে লিখতে
কলমের বিরামচিহ্ন নেই; ক্লান্তি নেই।
প্রজ্ঞা ও মেধার অনুশাসন শুনতে শুনতে
ধুলোর চরণে ম্রিয়মাণ কবি আজো
হলুদ পাতার মতো খসে পড়ে ঘাস ও জ্যোৎস্নায়।

আজো সহস্র সহস্র নীরবতার স্রোত পেরিয়ে
কবি কার স্বরে জাগে, দ্যাখে —
টেবিল জুড়ে অপূর্ব আলো, ঘুমন্ত কলমের সম্মোহন

আজো লিখতে লিখতে অনুবাদ করে ভোর, জীবন
আজো মৃত্যুর কুসুমে ঘুমায়
অনাদির পথে হেঁটে হেঁটে কবি
কী ঘোরে লিখে যায় বিবর্তনের স্বর।

গর্হিত অনল

বিকাশ পাল

মায়াজল ভরা আছে প্রাঙ্গণের কোণে ওই ইঁদারায়
ভোরবেলা প্রত্যহ তা মাখি আমি ঘুম-চোখে, মুখে
রোদ্দুর ওঠার আগে খঞ্জনের সঙ্গে কিছু কথা হয়
দু-একটা ফিঙে আসে চন্দনা সাত-ভাই-চম্পার দল
ভীষণ জরুরি কাজে তারা উড়ে যায় কিছুক্ষণ পর
তারপর আমি একা, চোখে লেগে ইঁদারার স্পষ্ট মায়াজল
এই জল চোখে থাকে চোখের ভেতরে থাকে বুকের ভেতর
সারাদিন আরো গূঢ় লেপটে থাকে গর্হিত অনল

এই দুই বিপরীত বস্তু নিয়ে পৈঠার ওপরে বসে থাকি
খবর-কাগজ থেকে অক্ষরেরা উঠে আসে চেপে ধরে চোখে
বাবুরা কোথায় যেন হাট বসাবেন আর কোথায় জাঙাল
বড়ো মেজো ছোটোবাবু আদিবাসী কল্যাণে চক্ষু ভেজাবেন
গলায় গুঞ্জার মালা বিবিরাও রাঙা ঠোঁটে নখে
আলপনার সরা থেকে ঐতিহ্যের গাঢ়-রঙ আঁকে
তাদের সুখের মুখে ঢল নামে নবীন আমোদে
এইসব ভালো-লাগা মন্দ-লাগা থেকে যায়, থাকেই সমাজে
আমি শুধু বসে থাকি চোখে মুখে ইঁদারার স্পষ্ট মায়াজল
তবুও কোথায় যেন খোঁচা দেয় বৃথা সেই গর্হিত অনল

বুকের মধ্যে

প্রদীপ দাশগুপ্ত

বুকের মধ্যে রোদ পড়েছে, স্বপ্ন বিকোয় হাটে
সাগর নদী পেরিয়ে এসে পা থামবে ক্রুশকাঠে
ধানের খেতে জীবন পুঁতে পেরিয়ে সাগর নদী
আমায় তুমি থামতে বললে দুয়ার থেকে যদি,
বাসকলতা ফুল যেখানে ডালে তেঁতুলপাতা
স্টেশন ছেড়ে এগোয় গাড়ি উড়ছে ছেঁড়াখাতা,
একাকী হাঁস সাঁতার কাটে এইখানে ওইখানে
বাজল বাঁশি দিন ফুরাবে ধ্বনির শিহরনে
সমস্ত দিন সমস্ত রাত বৃষ্টি পড়ুক ঝরে
পাশটি ঘেঁষে বাংলাভাষা জলের গল্প করে।

দুঃখ সূচিব্যথা

সুবীর ঘোষ

ধরো আমি রাস্তায় নেমে দেখতে পেলাম তুমি নেই
রাস্তার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে জলদূত পিঁপড়ের সারি,
হাতির পায়ের চাপে পিঁপড়েরা মরে না তুমি জানো।

তুমি কি বৃহৎ কোনো গোপনের আস্তানা জেনেছ?
সে কোন বিশাল পাখি ছায়াতীর ধরে উড়ে যায় বাষ্পীয় ডানায়;
আমার কথা না ফুরাতে দরজার হাতল ধরে তুমি টানো,
হাতল তোমার স্পর্শে দর্শনযোগ্য কোনো স্বপ্নে জেগে ওঠে।
রাস্তায় তখন আর কেউ নেই
খুব কাছে চেনা নদী দিক ভুল করে।

অফুরন্ত মানুষের কথা লেখে আনত কলম —
কলম কী মনে রাখে আঁচড়ের দুঃখ সূচিব্যথা?
মানুষ আরাম পায় ভুলে যেতে,
না ভুললে অকালমরণ।
নদী তার উদ্দেশ্য না চিনতে পেরে
রাস্তার ওপর এসে দেখে তুমি নেই —
আমি বা কোথায়?

তুমি জানো, চাঁদ জানে

দীপক কর

চাঁদের কাছে বিছিয়ে রেখেছ হাত
কী চাও তার কাছে?
তোমার লাবণ্য জড়িয়ে আছে
জ্যোৎস্নার ধবল প্রশান্তি
পাইনের ঝিরঝির লুকোচুরি খেলা
রোম্যান্টিক চাঁদ কী ভীষণ মেতেছে!

কী চাও তার কাছে
এমন বিছিয়ে রেখেছ হাত?
শিল্প জড়িয়ে আছে
কোজাগরী মসলিন
সুদূর কী ভীষণ স্পর্শময়
তুমি জানো, চাঁদ জানে।

নতুন ঘরের কাছে

শংকর চক্রবর্তী

এতদিন অন্যভাবে ছিলাম এখানে, আজ ঘরবাড়ি পালটে নিতে হল
ট্রাকভরতি মালপত্র নিয়ে
পোষা বেড়ালের রোমে কিছুক্ষণ হাত রেখে পাশের বাড়ির ওই নবজাতকের
লুপ্ত-প্রায় কান্না পিয়ানোতে...
এখানেই থামো তুমি অতীতের ভাষা।
আমাদের শেষবেলা ক্লাসরুম থেকে মাঠে ফুটবল পায়ে দিন শেষ হয়ে যায়
আমাদের কবিতায় কৃষ্ণচূড়া ঘিরে থাকে মেঘের সঙ্গীত
গাড়ি স্টার্ট হলে আর পেছনে তাকিয়ে কোনো লাভ নেই, অর্ধদিন শনিবার যেন
যেতে যেতে ঈর্ষাগুলি ফেলে দিই জানালার বাইরে রোদ্দুরে
তাই হয়, ঘরবাড়ি সাজানো গোছানো কিছু সুন্দরে হারিয়ে যায় শুধু —
শিথিল জীবনে কিছু থাকে না তেমন, কেউ ক্ষমা করো, ছিল মাত্র দৈবের কবিতা
দুলে দুলে বহুদূর থেকে দেখা যায় যাকে — বিন্দু হয়ে ক্রমশ বিলীন
ওইখানে যেতে হবে, আর প্রতিদিন
নতুন ঘরের কাছে যথেচ্ছ সুখের ভাণ্ড দেখে দুঃখী চোখ মুদে আসে।

জেগে উঠি চুম্বনের শব্দে

পঙ্কজ সাহা

রোজ রাতে চাঁদের ওপিঠে কারা কথা বলে!
আমি রাতের সন্ধিতে।

চাঁদের উলটোপিঠে কোন কথা কানাকানি!

চাঁদ-পলাতক রাতে
কেবল মেঘ ওড়াওড়ি
কেবল স্মৃতি কাটাকাটি

সময়কে চৌখুপিতে ধরতে রাত
খুঁটে খুঁটে স্বপ্নকে ঠোঁটে আনে,
আকাশে আকাশে
আলো অন্ধকারের চুম্বনের শব্দে
আমি চকিতে জেগে উঠি।

ছোঁয়া

দীপক লাহিড়ী

মনখারাপের অসহ্য বিকেল
কাউকে বোঝাতে পারি না
সূর্যাস্তের নত আলোয়
তোমার ভেসে থাকা গোধূলির আবাসন
উত্তর ব্যালকনি
সময় পেরোচ্ছে ট্রাফিক সিগন্যালের আলোয়
তুমি শালজঙ্গলের ছায়ায় তখন
প্রান্তিকা হয়ে আছ
বলো সমস্ত দিনের মধ্যেই কেন মা-র
চোখ ভেসে থাকে
হরিণের হাড় নিয়ে কবিতা লিখেছেন শামসুর
আমি ত্রিমাত্রিক ঘনত্বের মধ্যে ছবি বুঝতে গিয়ে

দেখি চিত্রকর বন্দী হয়ে আছে রঙের ঘেরাটোপে
বিনোদবিহারী আসুন কলাভবনের ব্ল্যাক হাউসে বসি
আপনার অন্ধতা থেকে আঁকুন সেই মেয়েটিকে
যে চিরকাল গুহার আঁধারে আটকে রয়েছে
রোদ কিংবা বৃষ্টি তাকে কোনোদিন তেমন করে
স্পর্শ করেনি

মনের নির্জনে

নীলাচার্য

অনেকদিন যাবৎ দেখছি
আকাশটাকে
পুরোনো করার আশায়
রোজই দেখি
তবু পুরোনো হয় না।

নতুন করে কে যেন
প্রতিদিন প্রতিক্ষণে
একের পর এক রং লেপে
তুলি চালিয়ে চলেছে
অদৃশ্য হাতে।

আমি দর্শকমাত্র
নীরব নিরন্তর নির্লিপ্ত নিরলস
মনের নির্জনে
বাস করা ছাড়া
আমার আর কোনো ভূমিকাই নেই।

এই পৃথিবীতে আমি আগন্তুক
বইয়ের ছেঁড়া পাতায়
আমার জন্মান্তরের ইতিহাস
জয় পরাজয়ের কাহিনী
ফসিল হয়ে থাকলে
অস্তিত্বটুকু খুঁজে পাওয়া যেত।

আকাশে বাতাসে কান্নার রব
সেদিনও কি ছিল?
ছিল কি আমার বেদনা মেশানো
অপ্রাপ্তির কর্কশ
নির্মম করুণ চেহারা?

জোনাকির মিছিলে
অন্ধকার পথ চলার
দু-চোখের আগুন
আজ হারিয়ে গেছে
কালের অন্ধকারে।

পঙ্গপাল তাড়িয়ে
দুরন্ত ক্রোধে
অনিশ্চিতের দুয়ার আগলে
বসে আছি।

ফুরফুরে আকাশছোঁয়া
হাসি
মেলে দিতে পারত
আরেক দিগন্তে
পাকা ফসলের সোনালি
আঘ্রাণ।

আলো আঁধারের হাতছানি
অনিশ্চিতের গহ্বরকে
গভীরতার আরো গভীরে
ঠেলে দেয়
আমি নীরব দর্শক হয়ে থাকি।

নির্লিপ্ত নিরলস
কাঁটাতারে ঘেরা
রং-চটা ঘরের কোণে
বাস করা ছাড়া
আমার যে আর কোনো
ভূমিকাই নেই।

শান্তিনিকেতন — কবিতা উৎসব ২০০৫

চন্দনা খান

চেয়ারে বসেছিলেন খ্যাতিমান প্রৌঢ় কবি
চেয়ারটা আসলে সিংহাসন আর তিনি সম্রাট
ছোটো ছোটো শাদা নোটবুক চারপাশ থেকে
তাকে তীরবিদ্ধ করছিল।
শাদা, কালো, বাদামি হাতে বাড়ানো ব্যগ্র অস্থিরতায়,
অটোগ্রাফের জন্য।
কবির কবিতা শোনা বিঘ্নিত হচ্ছিল।
সংগঠকরা তাড়া করে এল উঠতি যুবক-যুবতীদের।
— এখন নয়, এখন নয়, কবি-লেখককে বিরক্ত কোরো না।
কবির মনে হল এই ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিব্যি একটা
পলাশের মালা গেঁথে ফেলা যায়।
এ-ফুল সহজে শুকোবে না।

তাড়া খেয়ে তারা পিছনের অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল।
সংগঠকদের নজর এড়িয়ে তারা আবার পায়ে পায়ে এগিয়ে এল,
কবির ঘাড়ের পিছন থেকে একটা হাত এগিয়ে এল — অটোগ্রাফ।
কবি হেসে বললেন — বকুনি খেতে পারবে তো?
— পারব। সামনে এসে আপনাকে একটা প্রণাম করি?
— তার জন্য উদ্যোক্তাদের লাঠি-তাড়াতে আপত্তি নেই তো?
— না।

কবির পায়ে কয়েকখানা নরম হাত পড়ল।
বই ধরে নরম।
হারমোনিয়াম বাজিয়ে নরম।
কড়া অধিকারে এসব হাত
কবে কে টেনে নিয়ে যাবে কে জানে?
মনে মনে কবি ওদের হাতে তার
সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার সমর্পণ করলেন।

অনুবাদ কবিতা

ইরাক

ফ্রান্স

পর্তুগাল

বদ্‌র্ শাকির আল-সায়য়াব-এর কবিতা

অনুবাদ : **অভী সেনগুপ্ত**

(১৯২৬-১৯৬৪)

মূলত দুটি ধারায় পরিবৃত হয়ে রয়েছে বদ্‌র্ শাকির আল-সায়য়াব-এর কবিতা। দক্ষিণ ইরাকের বসরার কাছে এক ছোটো গ্রাম গ্যেকুর-এ ছয় বছরের শিশুটি মরিয়া হয়ে তার মা-কে খুঁজে চলেছে। মা যে মৃত, সেই সত্য শিশুটির কাছে অজ্ঞাত। আর আরব উপসাগরের বিভিন্ন উপকূলের প্রবাসে, রাজনৈতিক, বলা যায় কম্যুনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসের কারণে বারবার নির্বাসিত এক পূর্ণবয়স্ক পুরুষ তার স্বদেশের জন্য আকুল হয়ে রয়েছেন। প্রবাসে যে-কোনো দূরত্বের তুলনায় তার কাছে অনেক সুদূর তার স্বদেশ। কবির জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসেছে এই দুই ধারা। মেষপালক আর খেজুর-উৎপাদক পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান আল-সায়য়াব শৈশবেই তার মাকে হারান। খুব দ্রুত তার পিতা একই সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ আর অন্যত্র বসবাস শুরু করেন। রিক্ত, বৃদ্ধ, ঠাকুরদা-ঠাকুমার সান্নিধ্যে শিশুটি বাঁচতে শুরু করে। আবার পরবর্তীকালে কুয়েত, ইরান প্রভৃতি নানান প্রবাসে, বিভিন্ন সময়ে তার রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে মানসিক ও শারীরিক দুর্দশাপূর্ণ নির্বাসিত অবস্থায় তাকে পড়তে হয়েছে। জননী আর স্বদেশ প্রায়শই তার রচনায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কবির নিরাপত্তাবোধের অভাবে কোনোভাবে একের থেকে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায়নি। আল-সায়য়াবকে নিয়ে সিরিয়ার এবং আরব জগতের অপর এক খ্যাতনামা কবি মহম্মদ আল-মাঘুতের লেখা পরবর্তীকালের শোকগাথায় এই যৌথ বৈশিষ্ট্যের সঠিক উল্লেখ রয়েছে।

আল-সায়য়াবকে নিঃসন্দেহে একালের আরবি কবিতার কিংবদন্তি বলা যায়। মাত্র আটটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা আল-সায়য়াব মুক্তছন্দের কবিতা আন্দোলনে, দেশে-বিদেশে সর্বজনস্বীকৃত অন্যতম পথ-প্রদর্শক। একই সঙ্গে তাকে ঐতিহ্যের প্রতি অনুভূতিশীল ক্ষমতাবান স্রষ্টারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আরবি কবিতার রীতিনীতি, ছন্দের মাপ, মাত্রার নিয়ম ইত্যাদি প্রকরণগত শৈলিতে তার প্রগাঢ় দখল ছিল। এমনকী ক্লাসিকাল আরবি ভাষার দুরূহ নিজস্বতাও তিনি তার কবিতায় স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে প্রয়োগ করতেন। অনেকটা সময় ধরে তিনি কবিতাকে জাতির মুক্তি আন্দোলনের এক প্রখর অস্ত্র হিসেবে লালন করেছেন। চেয়েছেন, প্রত্যেক মানুষের মুক্ত পরিচয়ের সন্ধানকে আশ্রয় দেবে সমাজের ভেদাভেদশূন্যতা, সমদর্শিতা। তার রচনার প্রকৃত উৎস হচ্ছে লোকগীতি আর রূপকথার জগৎ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার অভিনব কণ্ঠস্বর আর ইরাকের মুক্তি আন্দোলনের বিদ্রোহী ধ্যানধারণা। সুনির্বাচিত শব্দালংকার, অসামান্য চিত্রকল্পের প্রয়োগ আর ভাবাবেগের জুতসই অভিব্যক্তির কারণে বিশ্বব্যাপী কবিতার প্রথম

সারিতে তার স্থান; সাহিত্যের বিশেষজ্ঞদের এমন ধারণায় যুক্তি রয়েছে যথেষ্ট। নানাভাবে আক্রান্ত হবার ট্র্যাজেডি তার জীবনে বহু ঘটেছে, স্বল্প জীবনে প্রতিকূল পরিবেশ যখন-তখন তার কবিতার ধারাবাহিকতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

শৈশবে প্রতিবেশী গ্রামের স্কুলে ভরতি হন আল-সায়য়াব। উঁচু ক্লাসের বছরগুলোতে তিনি দীক্ষিত হন তাঁর জীবনসর্বস্ব দুই বিষয় — কবিতা ও রাজনীতিতে। ১৯৩৮-এ তার মধ্যে কবি-প্রতিভার উন্মেষ দেখা দেয়। সমমনস্ক বন্ধুদের সঙ্গে প্রকাশিত একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। এই পর্বেই তিনি লেখেন অসামান্য প্রেমের কবিতা — 'শানাশিল ইব্নাত আল-ছালাবি' (জাফরি-কাটা জানলায় আল ছালাবির মেয়ে)। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি এই সময়ে তার রাজনৈতিক সত্তাও প্রকাশ পেতে শুরু করে। পরিবারের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার উপস্থিতি ছিল। কাকা আবদেল কাদের ইরাকে কম্যুনিস্ট পার্টির একেবারে আগমন সময়কার সক্রিয় বার্তাবাহক ছিলেন। হিজ্‌ব্ আল-লাদিনি (ধর্মহীন দল) নামে গুপ্তসংস্থার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। পিতামহর ঘরের দেয়ালে মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক, সাদ্ জাঘলুল-এর মতন বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি রাখা থাকত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষাশেষি ভাবাবেগ, তার সঙ্গে অস্তিত্বের রাজনৈতিক সক্রিয়তা আল-সায়য়াবের কবিতাকে পরিণত করে তোলে, জগতের কাছে ব্যক্তিমানুষের দায়বদ্ধতার প্রকাশ হিসেবে। সাহিত্যের পরিমণ্ডলে তিনি খ্যাতনামা হয়ে ওঠেন অচিরেই।

১৯৪৩-এ উচ্চশিক্ষার কারণে বাগদাদে আসেন আল-সায়য়াব। সাহিত্য আর রাজনীতিতে এই তরুণ প্রতিভা সম্পূর্ণ ডুবে যান। ১৯৪৬-এ তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পেলেন। পুরো বাগদাদে তিনি মাত্র তিনজনের একজন অর্থাৎ একেবারে শুরুর দিকের পার্টি-সদস্য। সেই বছরেই প্রথমবার ইরাক সরকার তাকে আটক করল বিনা-বিচারে। স্নাতক হলেন ১৯৪৮-এ, প্রকাশিত হল প্রথম কাব্যগ্রন্থ *আঝার ধাবিলা* (বিনষ্ট ফুল)। একটি স্কুলে ইংরেজি শিক্ষকের চাকরি পেলেন। কিন্তু অচিরেই দেশের নতুন সরকার, এসেই বন্দী করল তাকে। কম্যুনিস্ট মতাদর্শের কারণে তাকে শিক্ষকতা থেকে দশ বছরের জন্য নির্বাসিত করা হল। মুক্ত হওয়ার পরে ছোটো-বড়ো নানান কাজে যুক্ত রাখলেন নিজেকে। একই সঙ্গে সমগ্র আরব দুনিয়ায় ইতিমধ্যে কবিতা এবং অন্যান্য রচনায় তার পরিচয় আরো বিস্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। ১৯৫২-তে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করল, নতুন করে রাজনৈতিক ধরপাকড় শুরু হল। আল-সায়য়াব, ইরান ও পরে কুয়েত-এ আশ্রয় নিলেন। দেশে ফিরলেন একেবারে রাজা ফয়জলের রাজত্বকালে।

১৯৫৫-তে বিবাহ করলেন আল-সায়য়াব। একটি কন্যাসন্তানের পিতা হলেন। অল্প কিছুদিনের স্থিত জীবন। এই পর্বেও কারাবরণ করতে হয়েছে তাকে, চলে যেতে হয়েছে দেশ ছেড়ে, যার একটাই কারণ — রাজনৈতিক মতাদর্শ। নির্বাসিত অবস্থাতে দামাস্কাসে আরব লেখকদের সম্মেলনে ইরাকের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'আনসাউদাত আল-মটর' (বৃষ্টিগাথা) লেখা হয় ১৯৫৮-তে বিপ্লবের কাছাকাছি সময়ে। দেশে ফেরা হয় এই

পর্বে। স্বাস্থ্যের অবনতি শুরু হয়েছিল বেশ কিছু আগেই। এর মধ্যেই রোম আর বেইরুটে সাহিত্য-সম্মেলনে যোগ দিলেন। তারপর শৈশবের গ্রাম গ্যেকুরে কিছুদিন কাটিয়ে কুয়েতে গেলেন পক্ষাঘাতের চিকিৎসার জন্য। ১৯৬৪-তে আটত্রিশ বছর বয়সে কুয়েতেই মারা গেলেন আল সায়য়াব। তার মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় বসরাতে। সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয় পুরোনো কয়েকজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে।

১৯৭১ সালে আল-সায়য়াবের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তরমূর্তি বসরার প্রধান জনবহুল এলাকায় স্থাপন করা হয়। উল্লেখ করা যায়, ইদানীংকালের ইরাকে এই ধ্বংসোন্মুক, টালমাটাল পরিবেশেও সম্পূর্ণ অক্ষত রাখা হয়েছে কবির প্রতিমূর্তিটি। আর তারই সঙ্গে প্রস্তরফলকে হুবহু খোদিত রয়েছে তার এলিজি :

আমার দেশের সূর্য অন্য যে-কোনো জায়গা থেকে
আরো বেশি রূপবান
এমনকী অন্ধকার, সে-ও সুন্দর অনেক বেশি
দুঃখ এটা, ঘুমাবো কখন আমি আর কখন যে
অনুভব করে নেব
— ইরাক, গ্রীষ্মকালীন সুগন্ধ তোমার
ফোঁটা-ফোঁটা শিশিরের রূপে ঝরে যাচ্ছে
যেখানে বিশ্রাম নিতে চায় এই শরীর আমার...
বিদেশি শহর আর গ্রামে তাড়া-করা-ভয়ে
চলে যেতে যেতে অহর্নিশ
আমি গান গাইতাম কত যে তোমার
মাটিকে ভালোবাসার...
সহ্য করেছি নীরবে, নির্বাসনে যিশু
চলেছিলেন বহন করে নিজেই নিজের ক্রুশ।

বৃষ্টিগাথা

তোমার দু-চোখ গোধূলির সারি-সারি ঝাউগাছ
চাঁদ ডুবে যাচ্ছে তার ঠিক আগের অলিন্দ যেন
তোমার চোখের হাসি আঙুরখেতে নতুন পাতা নিয়ে আসে
আর নেচে চলে আলো যেন নদীর শরীরে চাঁদ
বেলাশেষে দাঁড়ের অতলে কী কোমল সেই কেঁপে-ওঠা
দূরত্বের অন্তরালে যেন ঝিকমিক করছে নক্ষত্র যত...

অতঃপর ডুবে যাবে স্বচ্ছ বিষাদের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে ওরা
রাতের অবগুণ্ঠনে থাকা মুক্তহস্ত সমুদ্র যেমন
শীতের উত্তাপ আর সঙ্গে নিয়ে কম্পমান হেমন্তের দিন;
যেন জন্ম আর মৃত্যু, যেন অন্ধকার আর আলো।
কান্নার গমকে আত্মা জাগ্রত আমার
এক আদিম উল্লাস আলিঙ্গন করে আকাশকে
যেন চাঁদ দেখে ভয়-পাওয়া জড়সড় এক শিশু,
মেঘের তোরণ একা পান করে যেভাবে কুয়াশা
আর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গলে যায়।
শিশুরা আঙুরবাগিচায় কলকল করে ওঠে
তখন চড়াইপাখিদের অচঞ্চলতায় আলতো বুলোয় হাত
বৃষ্টিগাথা...
বৃষ্টি
বৃষ্টি
বৃষ্টি।
অশ্রুবর্ষণ মেঘেরা একটানা করে চলে, তখন সন্ধ্যাকে
আলসেমি পেয়ে বসে
যেন ঘুমিয়ে পড়ার আগে সেই শিশু
যে প্রায়ই ফিসফিস করে কথা বলে
কথা বলে তার মায়ের সঙ্গে, যেই মা-কে
সে একবছর আগে পাশে জেগে থাকতে দেখেছে,
আর কোথাও পায়নি খুঁজে, শুনেছে জিজ্ঞেস করে
— 'তোমার মা কাল আসবেন, খুব বেশি হলে পরশুর পরেই'
অবশ্যই আসবেন
তার বন্ধুরা আড়ালে বলাবলি করে
— কবরের শান্তিতে মা ওর ঘুমোচ্ছেন পাহাড়ের কোল-ঘেঁষে

ধুলোবালি যেখানকার খাদ্য, বৃষ্টি পানীয় যেখানে।
এসব এমন, যেন এক বিষাদমলিন জেলে তার জাল গুটিয়ে নিচ্ছে
অভিশাপ দিয়ে চলে সে জলকে, নিজের ভাগ্যকে
চাঁদ অস্তাচলে যাচ্ছে যখন, সে করে চলেছে মৃদু বিলাপ
বৃষ্টি
বৃষ্টি।
তুমি জানো বৃষ্টি কোন দুঃখ নিয়ে আসে?
বৃষ্টি ঝরে পড়ে একটানা আর কী কান্না যে কাঁদে নালাগুলো —
একাকী মানুষ অনুভব করে নেয় হারিয়ে যাচ্ছে সে
অনিঃশেষ — যেন রক্ত চলকানো, যেন ক্ষুধার্তরা
যেন ভালোবাসা, যেন শৈশব, যেন মৃত্যু — এরকমই
বৃষ্টি।
বৃষ্টির ভেতর দিয়ে তোমার দু-চোখ দৃষ্টি পাঠায় আমাকে
আর উপসাগরের আড়াআড়ি অজস্র বিদ্যুৎ
ইরাকের তীরভূমি পালটে দেয় ঝিনুকে, নক্ষত্রে
যেন দাঁড়িয়ে উঠবে ওরা এইমাত্র
আর রাত্রি, এক পাত্র রক্তের ওপর দিয়ে কাছে চলে আসে
আর আমি চিৎকার করে ডেকে বলি
'ও উপসাগর,
ঝিনুক, রত্ন আর মৃত্যুদাতা।'
অস্ফুট কান্নার চেহারায় প্রতিধ্বনি ফিরে-ফিরে উঠে আসে
'ও উপসাগর,
... রত্ন আর মৃত্যুদাতা।'
আমি প্রায় শুনতে পাই বজ্রে ভরে উঠেছে ইরাক
উপত্যকায়, পাহাড়ে জমা করেছে বিদ্যুৎ
যতক্ষণ না মানুষই সে ঢাকনা ভাঙচুর করে...

ঝাউগাছ, বৃষ্টি পান করছে শুনতে পাচ্ছি আমি
গুমরে উঠছে সব গ্রাম, উদ্বাস্তুরা
উপসাগরের ঝড় ও বিদ্যুৎ সামলাতে যত
দাঁড় আর পাল নিয়ে করে চলেছে লড়াই, গান
গাইছে; ওদের গান
বৃষ্টি
বৃষ্টি
বৃষ্টি।

আর ইরাকে এখন দুর্ভিক্ষের দিন
যত সংগৃহীত ফসল ছড়িয়ে যাচ্ছে
কাক আর পঙ্গপাল খাওয়ানোর জন্য।
কেবলমাত্র পাথর আর পাথুরে জমি এক নাগাড়ে পেষাই হচ্ছে
বৃষ্টি
বৃষ্টি
বৃষ্টি।
বিদায়ের দিনে কোন অশ্রু আমরা মোচন করি
আর দোষ ঢাকতে বৃষ্টির অজুহাত দিয়ে চলি
শীতে ভরাট আকাশ ছিল শৈশবে আমাদের
আর বৃষ্টি ঝরে পড়েছিল।
প্রতি বছর যখন পৃথিবী সবুজ, আমরা উপোস করি
এমন বছর সেই একটাও, যখন ইরাকে দুর্ভিক্ষ নেই।
বৃষ্টি
বৃষ্টি
বৃষ্টি।
প্রত্যেক বৃষ্টিফোঁটার মধ্যে থেকে যায়
লাল অথবা হলুদ ফুটে-ওঠা ফুল
ক্ষুধার্ত উলঙ্গ মানুষের সব অশ্রুর বিন্দুতে
ক্রীতদাসদের প্রতি বিন্দু ঘাম, রক্তের গভীরে
এক নবীন মুখের হাসি জেগে আছে অপেক্ষায়
অথবা সদ্যোজাত-র অধরে গোলাপি স্তন যেন
জীবনদাত্রী, আগামীদিনের তরুণ পৃথিবীর
বৃষ্টি
বৃষ্টি
বৃষ্টি
বৃষ্টিতে সবুজ হয়ে উঠুক ইরাক।

আমি চিৎকার করে উপসাগরকে বলি — 'ও উপসাগর,
ঝিনুক, রত্ন আর মৃত্যুদাতা'
অস্ফুট কান্নার চেহারায় প্রতিধ্বনি ফিরে-ফিরে উঠে আসে
'ও উপসাগর
... রত্ন আর মৃত্যুদাতা।'
উপসাগর বাইরে আরো জড়ো করতে থাকে — বালুর ওপর

তার যত আশীর্বাদ, ঝিনুক ঢেউয়ের ফেনা
আর জড়ো হতে থাকে যেসব উদ্বাস্তু উপসাগরের তলা থেকে
শুষে নিতে চেয়েছিল মৃত্যু, তাদের একজন হতভাগ্য
... ডুবে-যাওয়া কোনো মানুষের অবশিষ্ট হাড় কিছু
আর ইরাকে হাজার রক্তচোষা পান করে চলে
ইউফ্রেটিসের শিশিরস্নাত
ফুলমধু।
আর আমি উপসাগরের মধ্য থেকে
রিনরিন প্রতিধ্বনি শুনতে থাকি :
'বৃষ্টি
বৃষ্টি
বৃষ্টি।
প্রত্যেক বৃষ্টিফোঁটার মধ্যে থেকে যায়
লাল অথবা হলুদ ফুটে-ওঠা ফুল
ক্ষুধার্ত উলঙ্গ মানুষের সব অশ্রুর বিন্দুতে
ক্রীতদাসদের প্রতি বিন্দু ঘাম, রক্তের গভীরে
এক নবীন মুখের হাসি জেগে আছে অপেক্ষায়
অথবা সদ্যোজাত-র মুখে গোলাপি স্তন যেন
জীবনদাত্রী, আগামী দিনের তরুণ পৃথিবীর।'

আর অঝোরে পড়তে থাকে বৃষ্টি...

সমকালীন ফরাসি কবিতা

অঁদ্রে ভেলতের-এর কবিতা

অনুবাদ : সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়

অঁদ্রে ভেলতের-এর জন্ম ১৯৪৫ সালে। ১৯৬৬ সালে যখন তাঁর প্রথম কবিতার বই *আয়েশা* প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর বয়স একুশ বছর। এ-পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চোদ্দো। তার মধ্যে কয়েকটির নাম *নিঃসঙ্গ পাদপ* (*L'arbre-seul*), *গঙ্গা থেকে জাঞ্জিবার* (*Du Gange à Zanzibar*) ও *নৃত্যপর জীবন* (*La Vie en dansant*)। এ-ছাড়া তিনি কয়েকটি প্রবন্ধের বইও লিখেছেন। কবিতার জন্য ভেলতের অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৯৬ সালে পাওয়া 'গঁকুর পুরস্কার' (*Prix Goncourt*)। দূর প্রাচ্যের অনেক জায়গায় তিনি পর্যটন করেছেন, তার মধ্যে আছে লাদাখ, আফগানিস্তান প্রভৃতি। এখন তিনি কবিতাগ্রন্থ সম্পাদনার কাজে নিয়োজিত আছেন ফ্রান্সের প্রখ্যাত 'গালিমার' (Gallimar) প্রকাশনা সংস্থায়।

যে শব্দ অপরটির থেকে মহৎ (Un mot plus haut que l'autre)

কেমন করে একটি কবিতা দিন ও রাত্রি, প্রতিবাদ, দাঙ্গা, ভালোবাসা, দুঃখকষ্ট অথবা স্বজনবিয়োগের খুব কাছাকাছি আসে? কেমন করে তাদের কাছে আসে — যাদের কাছে গান স্বপ্নের মতো নয় অথবা নিঃশ্বাস দীর্ঘশ্বাসের মতো নয়? কেমন করেই বা আসে তাদের কাছে — যারা উদ্দীপনা, উত্তেজনা বা ঝুঁকির বহুলতা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে চায় না?

শব্দগুলো হল মুখের রসদ — যারা যাত্রাপথে উপোস করে, বিরক্ত করে, উদ্‌গিরণ করে। যেন দুষ্পাচ্য খাবার। কখনো তারা খুব শক্তিশালী হয় — যেন পেটের মধ্যে আটকে থাকা কম্পাস। যতক্ষণ না তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় জিভের পেশিতে। যতক্ষণ না তারা ইঙ্গিত বা রহস্যের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয়। যতক্ষণ না তাদের ঠেলে দেওয়া হয় পবিত্রতম সংকটের দিকে?

কথায়, বক্তৃতায় বা লেখায় কী আসে যায়, যদি না সেখানে থাকে কোনো মূর্তিমান বিস্ময়, শব্দ ও অনুভূতির কোনো আবেশ, এক আনন্দোচ্ছ্বাস — যা সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তাকে নিয়ে যৌথভাবে উৎসব করে? পরিপূর্ণতা হল এক বিদ্রোহ — যা তার বিস্ময়কর নিদর্শনদের কখনো অস্বীকার করে না। অনন্ত হল ত্বকের ওপর বিদ্যুৎগতির চুম্বন।

আছে সেতুস্তম্ভের মতো বাক্য, চুম্বকায়িত বিশেষ্য, আর আছে সঙ্গীত — যা আগে থেকেই আমাদের নোঙর খুলে দেয়।

কেমন করে এই সৌভাগ্যকে না এড়িয়ে থাকব — যা আমাদের ঠেলে দেয় ধ্বংসের দিকে আর পরিণত করে হিংস্র উত্তরজীবীতে? প্রথমত নিজেই নিজের অনুকারক হতে অস্বীকার করে। কর্মোদ্যম ও গতিবেগ পরিবর্তন করে। নির্দিষ্ট, প্রতিশ্রুত, চিহ্নিত পাতাগুলির ওপর থেকে পরিকল্পিতভাবে নিজেদের সরিয়ে না এনে।

প্রমাণ বা নিদর্শনের ওপারে কবি চাহিদামাফিক সরবরাহ করতে বাধ্য নন, এমনকী নিজেকেও নয়, কিন্তু শব্দের ভিতরে দেহমন নিয়ে আত্মসমর্পণ করতেই হয়, শব্দের বাইরেও। একটি বিদ্যুৎঝলক থেকে সে শক্তি অর্জন করে। তার চেতনা এক উন্মত্ত বিবরকে আলোকিত করে। সে হল করাল বর্তমান, নতুন নির্লিপ্তি, বিয়োগান্ত উৎফুল্লতা। অন্যথায় সে তা নয়।

তার দিগন্তরেখা তার পলায়নের রেখা নয়। তা শুধু ছাদের সমতলে একটি ফাটল। নাচের জন্য একটি ফাঁকা চত্বর। এবং আমি চেঁচিয়ে বলি যে আমি ওই ওপরতলায় ঘুরপাক খেতে চাই এক 'দরবেশ'-এর মতো — যে, পৃথিবীকে খনন করে তার কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত। এবং আমি ব্যাপৃত হয়ে থাকি এক অন্তহীন দেশের মতো একটি কবিতাকে আলোকিত করার কাজে।

আমি স্বীকার করছি যে, আমি শুধু ততটাই — যতদূর আমি পালিয়ে যেতে পারি।

সীমান্ত (Frontiers)

সব পেয়েছি-র দেশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কে? ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্‌বাণীর থলিতে ছিল একাধিক নীতিকথা আর মধু ও দুধের দেশের একাধিক রক্তিম স্বপ্ন।

এ-এক আধুনিক অভিশাপ — যা সীমারেখার বাধা চাপিয়ে দিয়েছে ভবঘুরে দিগন্তগুলির ওপর, যে-দিগন্ত ধরে তীর্থযাত্রীরা পথ চলত তাদের নিজেদের খুশিতে, নিজেদের ছন্দে আর নিশ্চিত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, কিন্তু স্বাধীনভাবে, স্বাধীনভাবে।

সেই প্রান্তরেখা, সেই সীমানাগুলিতে ছিল দূরন্ত আহ্বানের স্বাদ, অজানা স্মৃতির স্বাদ।

তারা চলে গেল অনিশ্চিত মানচিত্র নিয়ে — যেখানে কিছুই অসম্ভব ছিল না। মরুভূমি ও আশ্রয়। গুপ্তবাহিনী ও তৃণপ্রান্তর। উচ্চতা ও তৃষ্ণা। উচ্চতার ভীতি ও সমতলভূমি।

প্রহরা ও শৃঙ্খলবিহীন এলাকা, তীর্থযাত্রী, পর্যটক ও বিপ্লবীদের স্বাধীন যাত্রাপথ, এক অস্বচ্ছ ভূখণ্ড — সে-যেন স্পর্শ করেছিল স্বপ্ন ও আকাশকে। হৃদয়ের সমস্ত আবেগ প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল প্রান্তদেশে।

এখন থেকে সীমান্ত অঞ্চলগুলি ধরে রাখে কেন্দ্র ও বেলাভূমিগুলিকে, ধ্বংসাবশেষের প্রাচুর্যের মধ্যে খুঁজে পায় সাক্ষাৎস্থল।

তারা চারদিক থেকে বেরিয়ে আসে বিলেতি দড়ির ফাঁসের মতন — যতক্ষণ না তারা পরিসরের ন্যূনতম কামনাকে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলে,

নিঃশ্বাসের মৃদুতম বিস্ফোরণ
আর সমস্ত অন্তর্জীবন।

যে মহা আশঙ্কায় নিষ্ক্রিয় মানুষেরা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে — রাষ্ট্রের আইনকানুনগুলি যেন তাদের আতঙ্কিত প্রতিক্রিয়া।

চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হয়ে আছে তালাবদ্ধ দেশগুলি। এবং তারা আঁকড়ে ধরে রাখে স্বীয় সীমারেখাগুলিকে। তারা শাসন করে। দমন করে। এবং তারা হনন করে।

রাষ্ট্রের আইনকানুনগুলি হল নিকৃষ্টতম ভণ্ডামি।

বিস্মৃত দেশগুলি ধ্বংস হয়ে যায় নির্বাসনের ধূলার ভিতর, কর্দমাক্ত ছাউনির ভিতর, পুরোনো ক্ষতস্থানের ক্ষরণের ভিতর।

প্রতিহিংসার পরিবর্তে আসে অনুশোচনা, কর্মসূচির পরিবর্তে কিংবদন্তি। দাসত্বের বদলে দাসত্ব,

বালিঘড়ির মধ্যে আশার সমপরিমাণ বিষ,
কারণ সীমান্ত অঞ্চলগুলি রয়েছে ভিতরে ও বাইরে।

সীমান্ত অঞ্চলগুলি কদাচিৎ মাটির ওপর ও মাথার ভিতর থাকে। তাদের শ্বাসরোধী শক্তি কখনো এত ক্ষতিকর ছিল না। এত অন্ধ। এত রক্তাক্ত।

তাদের জাল কখনো এত ঘননিবদ্ধ ছিল না। এত চটচটে। এত উন্মত্ত।

কারণ সীমান্তগুলি বেঁচে আছে এবং তাদের পুনর্জন্ম হয় রক্ষীবাহিনী, যাজক ও গোষ্ঠীবর্গকে তাদের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে।

একটি ভগ্ন প্রাচীরের জন্য কতগুলি একাকিত্বকে কাঁটাতার দিয়ে বাঁধতে হয়? কতগুলি জাতি সাঁড়াশির টানে পুনরুজ্জীবিত হয় আর তক্ষুনি রূপান্তরিত হয় সমসংখ্যক এজমালি কবরখানায়?

এটাই নতুন ও অন্তিম যুদ্ধ।

সকলের বিরুদ্ধে সকলে। ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই। প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে প্রতিবেশী। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঈশ্বর।

সব পেয়েছি-র দেশের প্রতিশ্রুতি দিল কে?

পর্তুগিজ কবিতা

ফার্নান্দো পেসোয়ার কবিতা

অনুবাদঃ প্রীতি সান্যাল

ফার্নান্দো পেসোয়ার জন্ম ১৮৮৮ সালে লিসবনে। মৃত্যু ১৯৩৫ সালে। পেসোয়া একাধারে ছিলেন বিশ্ব-নাগরিক, জাতীয়তাবাদী, আবেগধর্মী, চিরবিষণ্ণ, যুক্তিবাদী ও অতীন্দ্রিয়বাদী কবি। এইসব আপাত-বিরোধিতাই তাঁর কবিতার মূল বিষয়।

কানসিয়োনেইরো

বৃষ্টি পড়ছে। চারদিক শুনশান। ওই বৃষ্টিপাতে
শান্তির ধারাপাত বাজে।
বৃষ্টি পড়ে। আকাশ ঘুমায়। আত্মা বৈধব্যের মতো একা।
তাই হেলাফেলা অন্ধ আবেগ। বৃষ্টি পড়ে যায়।
আমি নিজেকে অস্বীকার করি।
শান্ত বৃষ্টি বাতাসে ভেসে যায়
মনেই হয় না ওই মেঘের ভেলায় সে এল
এই বৃষ্টি বৃষ্টি নয় বুঝি!
মৃদু গুনগুন গুঞ্জরনে নিজেকেই ভোলে।
বৃষ্টি পড়ে যায়। কোনো কিছু ভালোই লাগে না।

হাওয়ার ছোটাছুটি নেই
মাথার ওপর মেঘ নেই
যেন সুদূরের বৃষ্টি না-দেখা বর্ষণ।
এইসব এত সত্যি-মিথ্যে মনে হয়
একটা তীব্র মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা যেমন।
বৃষ্টি পড়ে যায়। অনুভবে কিছুই থাকে না।

২

আমার জীবনে যাপিত সহস্র জীবন, আমি ক্লান্ত
আলো নিভুনিভু, অনুগ্রহ করে চশমাটা দেবেন।
লন্ডভন্ড রাত্রি আমার মধ্যে
মহাবিশ্বের প্রারম্ভে উদ্ভূত এক কারণ ফলিত আমাতে।
নিজেকে পেতে খুঁজি ফুলের মধ্যে, পাখির ঝাঁকে, প্রান্তরে নগরে
মানুষের ভাবনাচিন্তা কার্যকলাপে, সূর্যের রশ্মিতে
অবলুপ্ত জগতের ধ্বংসস্তূপে।
আমার ভেতরে রেখেছি অতীত সময়,
পৃথিবীর থেকেও পুরোনো আদিমকাল
বিশ্ব সৃজিত হওয়ার আগে মহাব্যোম কালগর্ভ।

যে তারারা জন্মাল আমিও তাদের সঙ্গে পুঞ্জিভূত একত্র।
দূরে যে নক্ষত্র জ্বলছে তারও এমন একটি অণু নেই
যা আমার অস্তিত্বের অংশীদার নয়।
যদি ভাস্কো-দা-গামা ভারত আবিষ্কার না করতেন
অ্যারিস্টটল চিন্তায় ডুব না দিতেন
হোমার গান না গাইতেন, তবে আমারও অস্তিত্ব থাকত না।
ক্রুশে-বেঁধা যে মৃত্যু খ্রিস্টের, সেও আমারই জন্য।
হাজার হাজার বছর আগে ভারতীয় ঋষিদের
বিদ্যমানতা আমার অগোচর
তবু তারা আমার অংশভাক্।
যে আদি মানুষ জ্বালালো আগুন, ঘোরাল চাকা,
সৃষ্টি করল ধনুর্বাণ
তারা ছিল, তাই আজ আমি আছি।
আমার আত্মা ঘনকৃষ্ণ ঘূর্ণাবর্ত, বিপুল শূন্য ঘিরে ঘূর্ণমান
অকূল সাগরে অনস্তিত্বের গহ্বরের দিকে আকর্ষিত
সেই জলে সেই ঘূর্ণিতে ভাসে
সব ছবি, যা-কিছু দেখেছি জীবনে।

সংযোজন : কবি কবিতার নামকরণ করেননি।

কবিতাগুচ্ছ

রেজাউদ্দিন স্টালিন

এক মুক্তিযোদ্ধার মহত্তম ক্ষমা

কোনো ক্ষমা নেই — ইউসুফের স্বগতোক্তি শুনেছিলাম
১৯৭১ সালে।
ইউসুফ সেই সন্তান যে মায়ের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিল,
বাংলাদেশ তার মায়ের নাম।

একদিন অন্ধকারে তুমুল বৃষ্টির করতালি কুড়িয়ে
ইউসুফ আমাদের ঘরের দাওয়ায় এসে
ডাক দিয়েছিল মা...
আর খোলা দরোজার মতো কী অনায়াসে
আমার মা ইউসুফের জননী হয়ে গেল
ইউসুফ এমন আবেগে মাকে জড়িয়ে ধরল
যেন সমগ্র বাংলাদেশ তার বুকের মধ্যে এসে গেছে
মা আমি এসেছি
এই দ্যাখো আমার অস্ত্র
এবার জয় হবে আমাদের
ইউসুফের চোখকে তখন আমার জ্যোৎস্না-ধোয়া
আকাশ মনে হয়েছিল আর কথাগুলোকে অনির্বাণ নক্ষত্র,
যেন এখনি আমরা বিজয়ের আলোয়
প্রান্তরের দিকে ভেসে যাব

সেই রাতে ইউসুফ আমার কাছে শুনেছিল
নির্যাতন আর হত্যার কাহিনী;
কীভাবে আমরা শহর থেকে প্রাণভয়ে
নিঃসঙ্গ ইঁদুরের মতো পালিয়ে এসেছি
আমি দেয়ালের কোনায় লুকিয়ে রাখা
মানচিত্র-খচিত বাংলাদেশের প্রথম পতাকাটি
তাকে দেখাতেই সে ডুকরে কেঁদে উঠল
— কোনো ক্ষমা নেই
তার কণ্ঠ থেকে স্বগতোক্তির মতো বেরিয়ে এল
ক্ষমাহীন সেই ইউসুফ
ঈশা খাঁর তরবারির মতো তীক্ষ্ণ আর
তিতুমিরের কেল্লার মতো দৃঢ় সেই ইউসুফ

একদিন ঘৃণাভরে সমস্ত শত্রুকে ক্ষমা করে দিয়েছিল
ক্ষমাসুন্দর শেষবার তাকে দেখেছিলাম
নাভারনের এক কবরগাহের শয্যায়

কিন্তু তার এই ক্ষমার অর্থ
আজো আমার কাছে বিস্ময়
মায়ের কপাল ছোঁয়ার ইচ্ছায় সে যখন
গেরিলার গৌরবে নাভারনের মাটিতে বুক রেখেছিল
তখনই ক্ষমাহীন তার করোটির মধ্যে
ঢুকে গিয়েছিল অনভিপ্রেত স্তব্ধতা

আর সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই স্তব্ধতার প্রতিবাদে
বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ইউসুফ উঁচিয়ে ধরেছিল
তাদের হৃদয়ের মতো মারাত্মক সঙ্গিন, শত অত্যাচারে যা উদ্যত

শুনেছি ইউসুফের স্ত্রী নিখোঁজ
চোদ্দো বছরের ছেলেটি এক সরাইখানার আদেশের অধীন
এর জন্য বাংলাদেশের কোনো ইউসুফের কোনো
সঙ্গিন আজ আর উত্তোলিত হয় না
হায় মাতৃত্ব হায় বাংলাদেশ
তাহলে ইউসুফের নীরবতাকে আমরা কী বলব
এক মুক্তিযোদ্ধার মহত্তম ক্ষমা
যার ভালোবাসার বিনিময়ে তার মায়ের কোনো
প্রতিদান নেই

অনাদৃত কবিতার জন্য

আমার অনাদৃত ছেঁড়া কবিতাটি
কত বিচ্ছিন্ন বেদনা দিয়ে সাজানো শব্দাবলী
ছিন্নভিন্ন শুয়ে আছে, মুক্তিযুদ্ধে দগ্ধ বাংলাদেশ
যেন অপ্রেমের অন্ধকারে আবার দাঁড়াতে চায় মল্ল মেঘনাদে
ঠাঁই নেই, ভারত সমুদ্রভূমে সন্দেহের চোরাস্রোতে ঘোরে
চোরাবালি চক্ষু ঘষে স্বপ্নের ডানায়
ভূমিহীন বেদনার বিষে নীল শব্দরাজি
আক্রোশের তীক্ষ্ণ দাঁতে কামড়ে দেয় আকাঙ্ক্ষার হাত
অবিরল রক্ত ঝরে বিচূর্ণ দোয়াত

ইতিহাস ছাড়া আর কে সহ্য করে রক্তপাত
এবং কে রাত্রি জেগে অভিমান অধ্যয়ন করে

ছেঁড়া কবিতার প্রতি তীব্র মমতায়
প্রভু পিতা এই আমাকেই অস্বীকার করে ইতিহাস
হা হতোস্মি
আমি প্রভু পিতা
অন্যের ইচ্ছেমতো সৃষ্টিকে ছিঁড়েছি তীব্র উৎসবের মোরগের মতো
কিন্তু কেন এই ভূমিকা-গ্রহণ, এই নির্মম হৃদয়-হনন
ওই সৌন্দর্য শাসকবৃন্দ জানে ওই মধ্যবিত্ত দেয়ালের জিহ্বা
শুধু আত্মসম্মানের ভয়
কবি ও অমরত্বের লোভে জিরাফ হয়েছি, দীর্ঘ করেছি গ্রীবা
চাঁদমুখে চুমু খাব বলে ওই
কালো কবিতা হত্যার প্রলোভন এড়াতে পারিনি

একবার পেরেছিল কপোতাক্ষের কবি শ্রী মধুসূদন
দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়ে নিজের পুত্রের
পরিচয় করিয়েছিল পথিকের সঙ্গে গর্বভরে
আমি ভীরু কিছুটা সুযোগসন্ধানী বলে
স্বার্থপরতার সিঁড়ি ডিঙোতে পারিনি
ছিঁড়েছি বাষ্পরুদ্ধ নিজের নিষ্পাপ সৃষ্টি কুশলী ভঙ্গিতে
যেন কেউ বুঝতে না পারে
ভেতরে বেদনা আছে, পক্ষপাত আছে

জন্মের স্বাদ

বারবার জন্মের স্বাদ পেতে
মাতৃগর্ভে যাই, পিতা হই;
ধনুর্বাণের ছিলা টান টান স্বপ্ন ধরে রাখি।
যদিও নিষাদ নই, ক্রৌঞ্চ হত্যা করিনি কখনো,
তবু অভিশাপ অনন্তর অন্ধ করে দেয়।
ইদিপাস, আত্মদগ্ধ অরব অন্ধকার দেখি;
মাতৃতুল্য সময়ের গর্ভে ঢুকে বারবার বোধ জন্ম দিই।
এই পাপে শাস্তি রহিত হল — আকাঙ্ক্ষার গ্রীবায় শিকল;
পায়ে পায়ে যন্ত্রণা, কণ্ঠে বিষ-সমুদ্র মন্থন।
হোক এই শাস্তি হোক রৌরবের অগ্নি প্রাপ্য হোক,
তবু বারবার জন্মের স্বাদ নিতে মাতৃগর্ভে যাব, পিতা হব।

গীতবিতান

গৌতম ঘোষদস্তিদার

৩

নীল দিগন্তে যখন ফুলের আগুন লেগেই গেল
তখন তোমার সাজানো বাগানের আর কোনো
মানেই থাকল না আমার কাছে...
তুমি আমাকে আপাতত যতটা নীচ ভাবতে পারো
আমি যে একদা তারও চেয়ে বেশি নিচু হয়ে
তোমার পায়ের কাছে বসেছি একেবারে ভিখিরিরই মতো
সে-কথা তোমাকে নতুন করে মনে করানোর
কোনো কারণই রইল না চলন্ত ট্রেনের কামরায়
আমার নিজের কাছেও তখন সবটাই খুব ধূসর হয়ে এল
আর তখনই আমি অন্ধ গায়কের ভাঙা হারমোনিয়ামের উপর
হলুদ প্রজাপতিটিকে একেবারে ভূমিকাহীন বসে পড়তে দেখলাম
একটু একটু করে সে গানের পরাগগুলি মেখে নিল ডানায়
দেখতে দেখতে আতঙ্কে নীল হয়ে গেলাম আমি —
ট্রেনের জানলা পেরিয়ে সে যদি এবার এই আকুল হাওয়ায়
ভাসতে ভাসতে তোমার অবশিষ্ট বাগানের দিকে চলে যায়!

৪

সেই তো বসন্ত ফিরে এল আমাদের মেলা-মাঠে
মেলার অনন্ত থেকে বাংলোয় ফেরার পথে
তোমার কপালের টিপটি খসে পড়ল জ্যোৎস্নায়
কানের ঝুমকোও হঠাৎই হারাল নির্জন বালিয়াড়িতে
তোমার সবুজ আঁচল উড়ে গেল বাতাসের দিকে
দোলের চাঁদ ঢেকে নিল মুখ মেঘের আড়ালে
তোমার ঠোঁট থেকে অবশেষে মুছে গেল সবটুকু রং...
আজ সেই পরিত্যক্ত মেলা-মাঠে দাঁড়িয়ে বেশ বুঝতে পারি
সে-ই ছিল আমাদের প্রকৃত খেলা ভাঙার খেলা!

'গীতবিতান' সিরিজের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব।

কবি

দেবাঞ্জন চক্রবর্তী

আপনি জানতেন পথে কত কাঁটা, বেদনার ভার
হাড়িকাঠ আর খুনি ক্রশ। নিয়তিনির্দিষ্টভাবে
আপনাকেই নিতে হবে, বধ্যভূমিতে আজ কোনো সহযাত্রী নেই
ভাবনার অবকাশ নেই, পারছি না, খুব কষ্ট বলে কেঁদে কোনো লাভ নেই
কবির মলাটে করুণা, অনন্ত ললাট
হচ্ছে না ভেবে লিখব না — তাও চলবে না
ভাষার নির্মাণকর্মী, কেউ আপনাকে কোনো দিব্যি দেয়নি
নিজেই নিজেকে দিয়েছেন স্বেচ্ছাশ্রম আর ভালোবাসা
আত্মজনেদের কোনো বারণ শোনেননি
স্বনিযুক্ত আপনাকে খুব করে কিলিয়েছে সুখের ভূতেরা
অতীত ব্রহ্মের থেকে ভাষার ভবিষ্যতে আপনি ভাসমান

আপনার শব্দকর্ষে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে আগামী মানুষ
ধ্যান বস্তুরূপ পাবে, ধ্বনি পাবে প্রাণ
চারিদিক হতে থাকবে সম্ভাবনাময়
মস্তিষ্কে আকাশ নিয়ে, গঙ্গা নিয়ে আপনি হাঁটছেন
আর একটু একটু করে ভেঙে যেতে যেতে বিমূর্ত গমনে
হয়ে উঠছেন সময়

একান্ত সংলাপ

প্রীতি সান্যাল

কার সঙ্গে কথা বলে চলে রোগা কালো মেয়ে?
সামনে কফির কাপ, আইসক্রিমের বাটিতে সে চামচ ঘোরায়
ওই মেয়ে একা, পারি শহরের ব্যস্ত কফিশপে।
একা! মনেই হয় না। ওকে ঘিরে আছে যেন টেবিলভরতি
লোকজন। একবার এদিকে তাকায়, অমনি কাকে দেখে হেসে
ওঠে। হাত নেড়ে চোখে বিদ্যুত ঝলসিয়ে প্রশ্ন করে। হাতের
ইঙ্গিত বাঁ-দিকের অচেনা বন্ধুকে দেয় সস্নেহ প্রশ্রয়। ঘাড়ের

ঝাঁকুনিতে তীব্র প্রতিবাদ ডানপাশে রাখে। একা একা গল্প
করে, নিজেই প্রশ্ন করে, উত্তরও সেই দেয়। আমরা
ও অন্য সবাই নিজেদের মধ্যে কথা বলি, অনর্গল কথা
বলি, কিন্তু তার সঙ্গে নয়।
ওর সামনে বসে আছে অদৃশ্য
জনতা, শহরের ভালোবাসা কৃষ্ণকলি মেয়েটিকে যারা বর্জন
করেছে। তাই সে গড়ে নিল আপন জগৎ, কিন্তু সেইখানে
কারা বাস করে। আমারও ইচ্ছে হয় ওর মতো মাথার ভেতর
একটা 'অন্য কোথাও' গড়ে নিই।
ভালোবাসা আমার বন্ধু হোক,
গোপন প্রেমিক। কথা বলি, হেসে উঠি, তার সঙ্গে পাশাপাশি
বসবাস হোক। সূর্যমুখী ফুলের মতো তাকালেই দেখে নেব
আমার সুখদুঃখ কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।
বাস্তব তুচ্ছ করে
কথা বলব চোখের তারায়। কফিশপে, ভিড়ে, গোলমালে
আমাদের নিভৃত সংলাপ কে বুঝবে!

ভালোবাসা, তোর হাত ধরে, রোগা কালো মেয়েটির মতো
সকলের মাঝখানে একেবারে একা হতে চাই।

পৃথিবীর শেষ স্টেশন

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ট্রেন ছাড়তে দেরি আর মিনিট কয়েক
আমি এর মধ্যেই একটা স্বপ্নিল চোখ এঁকে দিয়েছি
পৃথিবীর শেষ স্টেশনে দাঁড়িয়ে।

সেই নিখিল ক্যানভাস
যেখানে তুমি আর আমি শুধুই একটি প্রতিকৃতি
বাকি সব কিছুই ধূসর
মাধ্যাকর্ষণহীন ব্রহ্মাণ্ড... রুক্ষ মরুভূমি।

ঈশ্বর ও বিধাতা

শেখর আহমেদ

ঈশ্বর বসেছিলেন তাঁর শুভঙ্কর সিংহাসনে
প্রসারিত সম্মুখভাগে সমুদ্রের ঢেউ
দৈত্যের বাহু মেলে ছুটেছিল পল্লির দিকে
ঈশ্বর বললেন — 'থামো!' নতশির হল সে।
দুরন্ত বালক এক তীব্রগামী বাসের চাকায়
পিষ্ট হতে হতে বেঁচে গেল অবিশ্বাস্য,
কপালে আঙুল রেখে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল চালক —
বালক নয়, গণ-প্রহারে অবধারিত
মৃত্যুর হাত থেকে নিজেই পরিত্রাণ পেল বলে।

ঈশ্বরের চিত্ত চঞ্চল হল ব্যাকুল ক্রন্দনে
মুমূর্ষু সন্তান বুকে হাহাকার করে এক নারী
করুণা-কেতন তাঁর অভয়হস্ত উত্তোলন করতে যাচ্ছিলেন —
পশ্চাদ্দিকে আর এক কাতর মাতা, মৃতপ্রায়
শিশু নিয়ে জানাল সুতীব্র আকুতি;
ঈশ্বর স্বগতোক্তি করলেন — 'যেদিকে ঘোরাই মুখ
ঠিক তার বিপরীতে বাসা বাঁধে শয়তান,
হে বিধাতা, কোন দিকে যাব?'
আর তখনই চেতনে এল, বিধাতা তো তাঁরই এক নাম!...

দুই ক্রন্দসী জননীর সঙ্গে মিশে গেল ঈশ্বরের কান্নার শব্দ।

কথা

কানাইলাল জানা

থেকে থেকে আমার হাত কিছু কথা বলে। পা কিছু কথা বলে। অনেক বেশি বলে চোখ ও চোখের পাতা। মাথার চুলও ভিন্ন কিছু বলে। নানা ভঙ্গিমায় বলে নাক কান ঠোঁট ও গ্রীবা। আবার কিছু না কিছু বলার জন্য উদ্‌গ্রীব প্রতিটি রোমকূপ, হাতের তালু পায়ের পাতা। তবে এ-তো গেল নিজের দিক। রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে যত চাল ডাল গমে হাত বোলাই, তারাও বলে নানান কথা। বাজারে যখন দর-কষাকষি করি আনাজপাতি শোনায় আর এক রকম।

পথের ধুলোবালি শুকনো পাতা এমন কথার ফোয়ারা ছোটায় যে হুমড়ি খেয়ে পড়ি বাড়ির উঠোনে। তারপর বসার ঘর, শোওয়ার ঘর, রান্নাঘর, প্রত্যেকে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বোনে কথার মিহি জাল। তখন একটা ঝারি নিয়ে দৌড়োই বাগানে। প্রতিটি টবের প্রতিটি ফুলগাছ ফলগাছ ঝরায় কত রকমের যে বাহারি কথা! এমনকী ঝারি এবং ঝারির জলও। কিন্তু বুক তো একটাই। তবুও খুব যত্নে সমস্ত কথাকে তুলে রাখি আমার খালি বুকে।

রাতে ঘুমিয়ে পড়ার পর তারা নানা রকমের স্বপ্ন রচনা করে। হয়তো মিষ্টি মিষ্টি কথা মিলে জন্ম দেয় একটি দোয়েলের। লম্বা লম্বা কথা জুড়ে দূর-ভ্রমণের ট্রেন। দড় কথারা যোগ হয়ে একটি জমাটি নৌ-বাইচ। কিন্তু জেগে ওঠার আগেই শিস দিতে দিতে পাখি উড়ে যায়। হুইস্‌ল বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দেয়। হঠাৎই পাল তুলে নৌকো উধাও। প্রকাণ্ড একটা সুনসান প্ল্যাটফর্মে আমি একা দাঁড়িয়ে। আমি কারু জন্য নই, কেউ আমার জন্য অপেক্ষা করে নেই। শূন্য বুক হাহাকার করে ওঠে আবার ভরাট হওয়ার নেশায়...

দুটি কবিতা

কাজল চক্রবর্তী

বিলয়নকাল : ৪

বারোমাস কর্মময় নয় যাদের জীবন,
যারা শুধু কুরে কুরে খায় পৃথিবীর মিঠে স্বাদ,
সেইসব পিঁপড়েদের গল্প এখন থাক।

এখন গল্পের সময় কোথায়!
মেঘহীন আকাশে যে-সব চিলেরা বাস করছে,
আসুন তাদের লক্ষ করি। ওদের লক্ষ্য শিকার।
এক আকাশে ওরা উড়বে সূর্যাস্ত অবধি।
অন্ধকার হলে উড়ে এসে বসবে উঁচু কোনো আশ্রয়ে।
সকালে আবার শিকারের খোঁজে যাবে আকাশে
ওই আকাশে একটুও মেঘ নেই, কোনো আড়াল নেই
খাদ্যও নেই। সব কিছু মাটিতে। মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ।

আমি জানি
সূর্যের ক্রমবর্ধমান তেজে ওদের ঘিলুও শুকিয়ে যাবে।

প্রজননক্ষমতা শেষ হবে। নিঃসঙ্গ চিলেরা
বিশ্ববাজারের মেঘহীন আকাশের মোহ থেকে মুক্ত হবে
তারপর শুধু নেমে আসা,
মাটির কাছে নেমে আসা, নেমে আসা মানুষের কাছে।

বিলয়নকাল : ৭

গাছটিতে উত্তেজক লিপস্টিক দেখে একবার ঘুরে দাঁড়ালাম
খসে পড়ল একটা পাতা।
সে-পাতাটা তখনো হলুদ হয়নি।
পাতার রান্নাঘরের চিমনি দিয়ে উঠে আসছে ফোড়নের ঝাঁঝ।
অথচ পাতাটি খসে পড়ল!
নাকি খসিয়ে দিল গাছ নিজেই।

আমি মাটির দিকে তাকালাম
মাটিই ধারণ করে আছে গাছ
হয়তো মাটির গভীর গভীরতর প্রদেশে ছড়িয়ে আছে শেকড়
উত্তেজক লিপস্টিকের ভেতরে জেগে থাকা বিষণ্ণতা ছুঁয়ে
আমি আকাশের দিকে তাকালাম।
ওপরে আকাশ নীচে মাটি, মাঝে ওই গাছ
তারও মাঝে ওই উত্তেজক লিপস্টিক।

গাছটির আলো আলো রঙের স্কার্টে লেগে আছে
ঋতুময় অন্ধকার। এই গাছ ভারতের প্রায় সব বাড়িতেই
কেউ বা বনসাই রেখেছে নাগালে
কারোর বৈঠকখানায় এই গাছের ছবি।

গাছেদের লিপস্টিক ব্যবহারের দিকটি
আজ ভারতের সব আকাশে দৃশ্যমান।
ভারতের সৌন্দর্য বেড়েছে, লিপস্টিকের বিক্রি বেড়েছে
বিলয়িত তালে কাঁপছে মাটি, আমরা দেখছি আকাশ।

দুটি কবিতা

নাসের হোসেন

গুপ্ত, বিরল

এসো হে বন্ধুবর্গ একসঙ্গে বসে আকাশের নীল রঙ দেখি,
দেখতে দেখতে বুঝতে চেষ্টা করি তার নানান গভীর পরত,
পুকুরের জল, টুকরো টুকরো ছবি, মৃদু গুঞ্জন, গুপ্ত, বিরল,
অতিরিক্ত বেগ নিয়ে কয়েকটা জেটবিমান পরস্পরকে কাটাকুটি
করতে করতে অদৃশ্য, এসো হে বন্ধুবর্গ পায়ে পায়ে সবুজ ঘাসের
শিশির মাড়িয়ে এসে দাঁড়াই কাঁটাফলের গাছটির পাশে, এখানে
এখন যত খুশি প্রলাপ বকা যেতে পারে, যত খুশি নাচা যায়
হাত-ধরাধরি করে, গল্পের মধ্যে কোথাও থেকে উঠে আসতে পারে
একটি সুবর্ণ ফিতে, প্রত্যেককে জড়ায় পাকে পাকে, উচ্চারণ
করো 'ভালোবাসা', সকলে উচ্চারণ করে 'ভালোবাসা', গোলাপি
একটা আভা থিরথির করে কাঁপতে থাকে মুখের উপর, উচ্চারণ
করো 'আলিঙ্গন', সকলে আপ্লুত কণ্ঠে বলে 'আলিঙ্গন',
ঘাসের উপরে ছড়ানো ছায়ারা একতাবদ্ধ হয়, তারপর দীর্ঘক্ষণ
পর 'এসো হে বন্ধুবর্গ' বলতে গিয়ে চোখে পড়ে প্রত্যেকেই মুগ্ধ,
প্রণয়তাড়িত, একে অপরের কাছ থেকে সরে আসতে পারছে না
গাছে গাছে পাখি ওড়ে, তাদের ডাক শোনা যায়, চাঁদের আলোয়
বাকি সব শব্দহীন, কাঁটাফলের থেকে আঠা, জিউলিগাছের থেকে আঠা
বাচ্চা ছেলেমেয়েরা হাসতে হাসতে হারিয়ে যাচ্ছে দূরের অরণ্যে, অদূরে

শাবল, উৎক্ষেপ

মাটি উঠে আসছে, জানি না আর কতদূর খোঁড়া হবে, খুঁড়তে খুঁড়তে
কি তবে আগুন উঠে আসবে, যদি আসে যদি আসে, আচ্ছা যদি
খুঁড়তে খুঁড়তে অপরপ্রান্তে চলে যাওয়া যায়, খুব সরু একটা গর্ত
মানে সুরঙ্গ, একটা মানুষ কোনোক্রমে গলে যেতে পারে, মাঝপর্যন্ত
নামতে খুব একটা কষ্ট হবে না, বাকি অর্ধেক ওঠাটাই বেশ কঠিন
হবে, মাঝখানে পুরোপুরি ঝলসে যেতে হবে, হয়তো-বা কঙ্কালটাই
বের হয়ে আসবে অপর পিঠে, তারপরেও যদি বেঁচে থাকে, তবে তো
হুলুস্থুল, শহরে শহরে চিৎকার চেঁচামেচি, গ্রামে গ্রামে তাড়া-খাওয়া
মনুষ্যসম্প্রদায়, অথচ তোমাকে ভয়ের কিছু নেই, তুমি কখনোই কারো
খারাপ চাওনি, ঘটনাক্রমে চেহারাই ওরকম হয়ে গেছে, কঙ্কালসার

যখন চাঁদ উঠেছিল

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

'আকাশে নখ বিঁধিয়েছি, বজ্র চমকালো...'
এই তো তোমার প্রেম, ওগো, মতিভ্রমের আলো!

'ঠাট্টা? আজ অপমানও বাজে না তত বুকে...'
চেতনা ফেরে আলাপে নয়, অদৃশ্য চাবুকে!

'দিনান্তে ওই পুরুষ — আমার শরীর গেছে খুলে...'
সময়ে, নেবে সে-ই শিবস্পর্শটুকু তুলে!

'নিক না, তাপ মরুক, তবু মুহূর্তটি ধ্রুব...'
হ্যাঁ, প্রথামতো প্রতারণার সামাজিক ও শুভ।

দুটি কবিতা

চিত্রা লাহিড়ী

মানানসই

তা বলে দুয়ো প্রেমিকার সঙ্গে বেসমেন্ট-এ
এতক্ষণ... হাউ ফানি
তোমার মুখের একপাশে তখন মুঘল পিরিয়ড
অন্যপাশে শান্তির শান্তিনিকেতন... বসন্ত উৎসব

উৎসবগুলোতে তুমি কিন্তু বেশ মানানসই
বেসমেন্ট থেকে ছাদের বাগান হয়ে আলো-আঁধারি লনে সর্বত্র
গোলাপি সন্ধ্যার পাশে তোমার জাদু। ঘন ঘাম
জমে নাকের পাটায়। বন্ধ চোখ

আজ অন্য কেউ তোমার পাঞ্জাবির বোতাম ছেঁড়ার
আগেই আমি বোধহয় ফুসলে যাব
অন্য ফ্যাব ইন্ডিয়ার সঙ্গে
বেসমেন্ট থেকে ছাদের বাগান হয়ে আলো-আঁধারি
লনে দুয়ো প্রেমিকের বুকে

ভালো-ই-তো বাসা

আজকাল নির্জন পাহাড়ে কিংবা গভীর সমুদ্রে গেলেও
তুমি ঠিক টেলিফোনে ধরে ফ্যালো, এমনকী
কোনো নগরের ব্যস্ততম রাস্তাতেও
এমনিতে সামনে থাকলে রাঙা চিবুক ঝুঁকে থাকে বুকে
তবে টেলিফোনে চুমুটুমু চলে প্রকাশ্যে অথবা
গোপনে যেখানেই থাকি

টেলিফোনেই শুনতে পাই — তুমি বলছ
ভালো-ই-তো বাসি তোমাকে

টেলিফোনের তার থেকে প্রত্যাশা ঝরে বৃষ্টির মতো
টেলিফোনের তার থেকে ভালো-ই-তো বাসা ঝরে রক্তের মতো
ভালো-ই-তো
ভালোবাসা নিকট অস্তিত্ব। ছুঁয়ে আছে রঙ

চাতক পাখিটা ডেকে ডেকে উড়ে গেছে কখন
ভালোবাসা টেলিফোন থেকে ছড়িয়ে যাচ্ছে
নির্জন পাহাড়ে কিংবা গভীর সমুদ্রে
এমনকী কোনো নগরের ব্যস্ততম রাস্তাতেও

তিনটি কবিতা

রাজকুমার রায়চৌধুরী

গোপন কথা

খুঁজে পেলে সহসা হাত ফসকে পড়া সন্ধে
রঙিন কথার গুঞ্জন পড়ে আছে তার ফাঁকে,
এইভাবেই শুরু হল প্রতীক্ষার দিন আমাদের
কাঁপে কলমের নীচে ছবির মতন সবুজ শহর,
কাকে খুঁড়ে কে, মনে মনে ফুঁপিয়ে ওঠে অশ্রুজলে!

২

ওগো চঞ্চল বাতাস মনে আছে কবে শেষ দেখা?
চোখ খুলতে ভয় হয়, চারপাশ ওঠে কেঁপে।
রঙে রঙে পালটায় শিরীষের ডালে সবুজ পাতা
লিখি সময় আমাদের চলেছ কোন দিকে,
মেঘ ভেসে ওঠে আকাশ চিরে বজ্রপাতে।

৩

পড়ে আছে লেখা চিঠি বনেদি শহরের আঁধারে,
প্রবল জ্বরের মাঝে একটি চাঁদ ওঠে ধীরে ধীরে ভেসে
নিজের স্বপ্নের মাঝে কে লুকিয়ে কেঁদেছে নীরবে!

বৃষ্টি এসে দু-চোখে লেগে থাকে অপূর্ব অন্ধকারে।

রোমান্স

ছুটে চলেছি বনেদি শহরের দিকে গোপনে, ঢেউভরতি কথার সঙ্গে
সামান্য বসতবাটি ভাসিতেছে চন্দ্রের আলোয়, এসো প্রেম এসো
প্রেমোজ্জ্বল সাজে আয়নার সামনে সাজো, বাঁধো চুল, শিউরে ওঠে মুহূর্ত
কী রূপ! নাকছাবির ঠিকরে ওঠা আলোয়, মুগ্ধ চাউনিতে, চিনলে না আমায়?
কে আনল আমায় এই রূপের সম্মুখে? মর্মে বিঁধল আঁখি
বলি সখি করজোড়ে, কীসের ঢেউ ওঠে ওই দেহে গভীর প্রত্যয়ে?
তোমার মায়াবী আলোয় উঠছে জেগে ওই দূরে শতবর্ষের ভোর।
বিদ্যাধরীর জলে পা ডুবিয়ে প্রেম গাইছেন আঙুরবালা,
চমকায় মেঘ ওপাশে
আবদার যদি কিছু করি — ধ্যুৎ বলবে না তো কিশোরী আলেয়া?

ওই রূপের কঙ্কণে বাজে আমার জীবন, বাজে হাহাকার ব্যতীত কিছু
ছায়ায় আড়ালে বসি শরীরে শরীর যায় ভেসে, বলি হে প্রেম —
এসো স্বপ্নের প্রান্তে, তাকাও দু-চোখে এদিকে, ভালোবেসে।

সম্পর্ক

ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের নীচে আজও দেখা যায় সন্ধ্যার আকাশ
ভুলিনি কিছুই, সরলতার পাশে রেখে যাও যাবতীয় বিশ্বাস।
সুরের গুঞ্জন ওড়ে, ওড়ে — কিছুটা প্রেম, নানা বিতর্ক শুধু খামচায়

রটল কেচ্ছা খুব, যায় যতোদূর শহরব্যাপী দু-চোখ,
সমূহ বিপদ, অষ্টপ্রহর আমাদের, অজানা কণ্ঠস্বর ভাসে একই বৃন্তে।

যায় না শোনা কোনোভাবেই নিঃসঙ্গতার দূরত্বের শব্দটুকু
শরীর জুড়ে ঘুমের মধ্যে স্থাপিত করো তোমার ভিতর আমার বিকেল
লেখার ভেতরে আধো ঘুমের ভেতরে লাফিয়ে ওঠো, ওঠো জেগে
ধাবমান প্রেম নির্জন দুপুরে লেখে মৌসুমি বাতাসের শিহরন।

যাচ্ছেতাই করে যাও সন্দেহতাড়িত ঘুমের মধ্যে, ডানার গুঞ্জনে —
ধবধবে শাদা পোশাক ওড়ে, দু-পায়ের নীচে, পূর্ণ রাত্রি ওঠে জেগে।
দুরন্ত ফষ্টিনষ্টি করো শরীরের ভাষায় কার সঙ্গে ওগো প্রেম?

বিপন্ন পদাবলী দিগ্‌ভ্রষ্ট তুমি, উল্কাপাতে পাও টের —
ভেসে যাওয়া আধখানা রাত্রি, রাত্রির তরঙ্গমালার পূর্ণ আবেগ।

তিনটি কবিতা

অনিতা অগ্নিহোত্রী

অবিদ্ধ মরাল

আমি তো রেখেছি চিত্ত পাদপদ্মে পদ্ম যদি
আঘাটায় মৃণাল-বিচ্ছিন্ন উন্মূলিত নিথর
চিত্তের তবে গতি কি গোসাঁই তার ঘরে ফেরা
পথ নাই দিক্‌শূন্য মজা পুষ্করিণী অবরুদ্ধ
জল পাকশালা দেওয়ালেতে কালি ফাটা
মালসায় নিরন্ন বৈকাল : ঘু ঘু ডাকে বৃহৎ
পৃথিবী ফাঁকা হরিনামে আচ্ছন্ন বিষাদ
আমি তো রেখেছি চিত্ত ওই পায়ে যদি
নূপুরের শব্দ স্তব্ধ রুদ্ধ ঘরে আড়ায় ঝোলানো
দড়ি আর হলুদ আলোক পায়ের নীচের
থেকে সরে গেলে মৃত্যু সুনিশ্চিত গোসাঁই
আমার তবে গতি কোথা অবিদ্ধ মরাল

অসম্ভব

অসম্ভব আমার পক্ষে সারাদিন এইভাবে রৌদ্রে
বসে নিষ্প্রাণ নীলের মধ্যে অনন্ত রহস্যে
কাটা-ঘুড়ি পতনের শেষপ্রান্তে চিত্ত ঠিক রাখা
অসম্ভব বড়ির বুকের মধ্যে খেসারির অন্ধতা মাইলের পর
মাইল শিলালিপি নির্বোধকে পড়াবার আয়োজন
অসম্ভব জ্বলতে জ্বলতে রাত্রিদিন ধ্বংসের বদলে
শান্ত ক্ষয় উইপোকা ঘুণেদের সম্মিলিত ঐকমত্য
অসম্ভব মৃত্যুযজ্ঞ পক্ষাঘাত ডান অঙ্গে বাম দিয়ে
লিখে যাচ্ছি দানপত্রে শিশির আত্মমুগ্ধতার অসম্ভব

আমি তো মানুষ, বাংলার ধানজমি দু-ফসলি অনুরক্ত
মুগ্ধচিত্ত কাতর অশ্রুভরা মুখ কণ্ঠহীন অসম্ভব
দিনরাত্রি এই বুকে ইট-ভাঁটা মাটিতে পুড়িয়ে রাঙা
ফাটা আর ছন্নছাড়া নিষ্প্রাণ ধর্ষণজনিত অসম্ভব।

ঠিক জানো

ঠিক জানো ভালোবাসা কম পড়েনি তো গামলায়
টোপরের মুকুটের ছেঁড়া শোলা কে কাহার আগে যায়
ঘুরন্ত জলের মধ্যে ওইভাবে আগে পরে হাঁটা সে-তো
সত্যি নয় — রাস্তায় অসংখ্য পাথর অন্ধকার গাঢ় হলে
তবেই জোনাকি ঠিক জানো হাত ধরে সানকিভাঙার
গ্রাম পঞ্চায়েত রাস্তা পেরোবার স্মৃতিতে কোথাও
দর্পণ উথলোনো দুধ মুঠোবন্দী ল্যাটা মাছে
আঁষটে ঘ্রাণ বেড়ালেরা খুশি নয় বউ এল
রান্নাঘরে এইভাবে ঢাকা-চাপা আড়াল-আবডাল
ভালো নয় ঠিক জানো যা দিয়েছি তাতে পান-
মারা বাদ দিলে যা থাকে তা বদলাতে নারাজ
দোকান : সোনাও সেকেলে যদি হিরে প্ল্যাটিনাম
সত্যি হয় ঠিক জানো মৃত্যুকালে কষ বেয়ে
রক্ত গড়ানোর সঙ্গে কার নাম উঠে এসেছিল
কণ্ঠা বেয়ে ঠোঁটের শাদায় যারই হোক জিয়ন্তে
ডালে ঝোলে অম্বলে গামছায় ভালোবাসা কম পড়েনি তো

পান মারা — ধাতুতে কাঠিন্য সঞ্চার (to temper)।

উৎসব

দীপ সাউ

শান্তিনিকেতনে সেদিন রাত উৎসব বাজি পোড়ে
মদনভস্মের পর যেমন চিল ওড়ে আকাশে,
তোমার কালো রঙ আঁধারময় — কাক ডাকে জোরে,
শ্মশান-কাক, নদীর চর বরাবর শাদা কাশে

অজস্র মুনিয়া কি মন্ত্রণা সারে? শুনি বসে বসে
খাঁচায় পুষেছ পাখি — ছায়া-হারা, ছুঁড়েছ বল্লম;
উপন্যাসের পাতা খুলে বারান্দায় যাও চোখ ঘষে
ঘষে, পরিখা জুড়ে স্মৃতির কুমির। কতটা ওম

চাও? কারা দিয়েছিল আগুন? দমকল ঘুরে যায়
দিগন্ত ঘেঁষে, জলদস্যুবাহিত রোগে ভয় পাও;
বারান্দা ঘর ঝেঁটিয়ে আঁধি-ধুলো ওড়ে, রাঙা ছাতা,
শাড়ি ওড়ে, যুবকের কাছে যাও কোন পিপাসায়?
বাইরে আঁধারে প্রকৃত নিরাময় নেই কোথাও।
পরদিন পড়ে থাকে ছাই অশেষ বাদামপাতা।

সুন্দর-প্যারোডি

মল্লিকা সেনগুপ্ত

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি, তারায় তারায় খচিত
মোনাপালি নাকি ঋতু কুমারের জরদৌসিতে রচিত!

রক্তবর্ণে রুপোলি ডানার পাখিরা
গায়ে ফেললেই স্বপ্ন-মাখানো সাকিনা

কাকপাখিটিকে ময়ূর বানাবে ওড়না
কালো মেয়েদের করবেই মধুবর্ণা

তখন তোমার চাইতে তোমার অঙ্গদ
বড়ো হয়ে ওঠে, তুমি চাও তার সঙ্গ

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি, তারায় তারায় খচিত
একবার গায়ে ফেলতে পারলে এ-চিৎ এবং ও-চিৎও।

হুমায়ুন আজাদ মঞ্চের মোমগুলো

(উৎসর্গ: অদিতি ফাল্গুনী)

মুহাম্মদ সামাদ

কুয়াশার ধূসর চাদরে মোড়া করুণ সন্ধ্যায়
কাঁচা-কাঁচা মেয়েগুলো
কাঁচা-কাঁচা ছেলেগুলো
রক্তের কিনার ঘিরে জ্বালায় মোমের আলো

অতঃপর
ছেলেগুলো দেয় স্লোগান — আজাদ স্যারের রক্ত...
মেয়েগুলোর কণ্ঠে জ্বলে ওঠে — *রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি...*

ছেলেগুলো দেয় স্লোগান — আমাদের সংগ্রাম চলবেই
মেয়েগুলো গায় গান — *ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো...*

ছেলেদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় — *আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো...*
মেয়েগুলো গায় গান — *এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে...*

ছেলেগুলো দেয় স্লোগান — পরাভব মানব না
মেয়েগুলো গায় গান — *আগুনের পরশমণি...*

হঠাৎ, কোত্থেকে ছুটে আসে কনভয়-ত্রাস!
অন্ধ অমানিশার আর্ত চিৎকারে
সুকান্তের দেশলাইকাঠির মতো হুমায়ুন আজাদ মঞ্চের মোমগুলো
মুহূর্তে আলোর বর্শা হাতে বলে ওঠে — আর এক পা এগোলে...

কাঁচা-কাঁচা মেয়েগুলো ছেলেগুলো সমকণ্ঠে জ্বলে ওঠে —
এ আলো ছড়িয়ে দেব সবখানে... আমরা করব জয়...

চিহ্ন

দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়

রাতের ছায়ার পাশে বসে থাকি
ভোরের প্রতীক্ষায় পাতাটিও প্রকাশ্যে নিঝুম
প্রতিবিম্বে নিশ্চলতা ফোটে

একা একা কত কথা বলা যায়! স্বপ্ন গিলে খায়
সম্পূর্ণ শরীর

সূর্যোদয়, সে কোন মুহূর্তে ঘটে যাবে?
তেমনই জীবন; বারবার পূর্ণ হবে, বারবার ফুরোবে

যেই আমি আবিষ্কার করি আমার মতন ছবি
অদ্ভুত ঘূর্ণি এসে ভেঙে দেয় তৎপরতা
আঙুল বাড়িয়ে ধরি রক্তশূন্য স্মৃতিগুচ্ছ —
কেউ কোথাও নেই, আবার সকলের মধ্যে সবাই
দেখি ফুরিয়ে যাওয়া সাঁকো, নিঃস্ব তাঁবুর স্বপ্ন
দেখি নামহীন নদীটির অশেষ উপেক্ষা

আমি কি বসেই থাকব নক্ষত্রের নিয়তিরেখায়! ...

স্নায়ুযুদ্ধের অ্যালবাম

শ্যামলবরণ সাহা

১

অ্যালার্ম বাজার আগে, পাখি ডাকার অনেক অনেক আগে বিছানায় উঠে বসে আছি। ভেন্টিলেটারের মুখে আলোর ইশারা নেই। স্পষ্ট বুঝতে পারছি — এখনো বাইরে এক আকাশ নক্ষত্র বাগুইহাটিতে কেবলই প্রসব করছে অন্ধকার!... একটা নিঃসঙ্গ কুকুর ক্রমাগত চিৎকার করে অন্ধকার তাড়িয়ে ভোর আনার চেষ্টা করছে। ভোর। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভোর! পাখিসব কলরবের মধ্যে আমরা ছুটে যাব — ই.এম.বাইপাস। অপারেশন থিয়েটারের দিকে। অচিনপাখির খাঁচা আজ মেরামত হবে। আজ তুমি কোথাও যেও না, — ওগো, বাউলরঙের পাখি!

২

কলকাতা, বন্ধুর খবর জানো? সে কেমন আছে! উঠতে-বসতে কোথায় কষ্ট তার? ম্যানহোল থেকে উঠে আসা মহানগর বন্ধুর খবর রাখে না। যেটুকু খবর রেখেছে — শুকনো ডাব, কষা পেয়ারা, টক আঙুর...

৩

আগুনকে ঘুম পাড়াবে বলে কবিরাজ তুমি আস্তিনে গুটিয়ে রেখেছিলে সাতসমুদ্র। সুরের আগুন ছড়িয়ে দিতে কবিরাজ তুমি আস্তিনে গুটিয়ে রেখেছিলে তেরো নদী। অনেক ধুলো উড়িয়ে তোমার কাছে এসেছি আজ। কুশল সংবাদে শান্ত করো লবণপীড়িত আঁখিস্রোত।

একটু দেরি হলেই নাকি পুড়ে যেত সব কিছু? যার দশ আঙুলে জেগে থাকে দশটি ঈশ্বর, — সংসার তাকে কি নামে ডাকবে প্রভু!

আমার ভিতরে কাঁপে আমলকী বন। সেখানে পাতা ঝরে সারাক্ষণ। ঝরাপাতা গো ঝরাপাতা, আমি তোমারি দলে... সব কচি পাতা তোলা থাক বন্ধুর জন্য। আমি তোমার শ্যামল বন্ধু!...

৪

শয্যাবন্দী আয়তক্ষেত্র ঝেড়ে ফেলে ফ্রেমবন্দী বর্গক্ষেত্রের সামনে দাঁড়িয়েছ। কৃষ্ণের মুখোমুখি। রাধা নেই। রাধাকে ডাকার জন্য কি সহজেই কৃষ্ণের হাতে তুমি ধরিয়ে দিয়েছ — হরিপ্রসাদের বাঁশি। সেই থেকে সাতশো স্কোয়ার ফুটে জেগে ওঠে ডোভার লেন ... চৌরাশিয়ার নিশি-কাতরতা! হরিপ্রসাদের বাঁশি শুনতে শুনতে একজোড়া ওষ্ঠ-অধরের কথা মনে পড়ে। তোমার ওষ্ঠ-অধরে আমি হিমোগ্লোবিন খুঁজতে থাকি। ঘুম পায়। ঘুমের ভিতরে স্বপ্নে লতিয়ে ওঠে কুলেখাড়া, থানকুনি...

৫

শোক পেতে পেতে তুমি শ্লোক হয়ে গেছ। চোখের জলে মানুষ নিজেকে যতখানি ধুতে পারে, অন্য কিছুতে নয় — এসব জেনেও তুমি কখনো হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদোনি। তার ছিঁড়ে গেলে কীভাবে তার বাঁধতে হয় তোমার কাছে শিখেছি। শিখেছি জন্মশত্রু আবেগের মুখে ছাই দিতে। তবু আমি মফস্বলের মরচে-ধরা মানুষ। পারদ-ওঠা আয়নায় রোজ নিজেকে আবিষ্কার করি। এখনো তোমার ফোন নাম্বার আমার মুখস্থ হয়নি। যতবার ফোন করি শুধু রং নাম্বার হয়ে যায়। এটা-সেটা দিয়ে অসহ্য স্নায়ুযুদ্ধ আড়াল করি। বিপদে পড়েছি দেখে নক্ষত্রের কুকুর এসে আমাকে সারারাত পাহারা দেয়।

অন্ধত্ব

সঞ্জীব প্রামাণিক

পৃথিবীতে ফুল ফোটে, অন্ধের কী-ই বা আসে যায় —
কেবল মালীর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয় উদ্যান-চর্চায়।

আমি এক অন্ধ যুবা স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছি, যদি দেখা পাই
ঘুমের অতলে নেমে ফুলের বাগানখানি দৃশ্যের মুদ্রায়।

আঁধারেই স্বপ্ন থাকে, আলো বেশি প্রতারণাময়
এই ক্রোধে আমি ফুটি, ফোটে জবা, পলাশনিচয়।

কৃষ্ণপক্ষের সামনে

রামকিশোর ভট্টাচার্য

চোখের ওপর জমে থাকে কত অনুপ্রাসময় দিন।
প্রতিচ্ছায়া গড়িয়ে নামে গাল বেয়ে। যেসব বন্ধুরা
পূর্ণিমা এনে বসিয়েছিল নিসর্গখাঁচায়, তাদের
সবুজ নৌকাটি কাতর প্রার্থনা নিয়ে দাঁড়িয়েছে
কৃষ্ণপক্ষের সামনে। রূপচাকায় ঘুরে যাচ্ছে বালিয়াড়ি দিন।
বৃষ্টিরঙের জামা দেখে থমকে দাঁড়ায় আমার
সাতচল্লিশ বছর। বছর মানে এনসাইক্লোপিডিয়া।
আমি দেখি নোলক-পরা একটি মেঘ দাঁড়িয়েছে
ভুল নকশায়। তার শরীরময় ভ্রূণহত্যার ছাপ। ব্রহ্মময়ী
প্রোটনকণা নাচছে ছাদে। দুলে উঠছে আলোরঙের সঙ্কেতগুলি...

স্মরণিকা

অনীক রুদ্র

তীরভূমিতে দাঁড়ানো আমি
রচনা করছি নদীটির বিয়োগপঞ্জি
এই নদী বা এই জলধারা একদা এরকম ছিল না
চিরকাল একরকম থাকেও না
কিন্তু আমরা কীভাবে ঘুচিয়ে দিলাম তার এগিয়ে-চলা পথ
এখন লম্বা একটি ধূমসো সেতু আর বড়ো বড়ো স্তম্ভ
পেটে ধারণ করে
যে হারিয়েছে তার বহতা
এখন যে সেতুর কোনো মানেই হয় না বরং
মানে হয় অন্যরকম, হঠাৎ বন্যার —
কলসি-দড়ি নিয়ে কোনো গেরস্ত বউ যেখানে
ডুবতে আসার কথাও ভাবতে পারে না
যার সারা বছরের জল বালির নীচে থাকার জন্যই যেন-বা
চাষের কোনো কাজে লাগে না
যদিও প্রকৃতির মানচিত্রে সে এখনো নদী, পাহাড় যার উৎস

আর সমুদ্রে পড়ার আগেই মিলিয়ে যায় শূন্যে —
শূন্যতার এই নদী
তার তীরভূমির নড়বড়ে জমিতে আমি রচনা করি
পর্যটকের কুঁড়েঘর তথা কটেজ
নদী-বাঁকে রচনা করি, দূর গ্রামগঞ্জ থেকে আসা
একটি চড়ুইভাতির ঠিকানা
সেতুর আশপাশে নির্মাণ করি হোটেল ও খানকি-মহল
শীতে নদী উৎসবে মেলা বসাই, যখন সেই নদী নেই
কেবল নদীটির বিয়োগপঞ্জি —
এতগুলি কালো অক্ষরে
যা প্রত্নবিদ্যা বা ইতিহাসচর্চার সুযোগ হয়ে থাকবে

দুটি কবিতা

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

মৃত্যু

১৪৪ ধারা
তারপর খতম
একটু উষ্ণতার জন্য
শেষ হল ভালোবাসা
মাঝরাত্তিরে

সশ্রদ্ধ নমস্কার
কলকাতার শান্তিরক্ষীদের
দুয়োরে খিল
১৪৪
তারপর খতম

স্তব্ধতা
পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্ধকার
পেটে শেকল পায়ে বেড়ি

১৪৪ ধারা
তারপর খতম

জ্যোৎস্নায় খোলামেলা চাঁদ
তারপর আঁধার
তারপর আই.পি.সি.১৪৪
তারপর? তারপর...

সময়

সময়ের ছুরিটা বিঁধেছে বুকের ওপর এমন সময় বসন্ত শুরু হল।
স্তব্ধতার পাঁকে পাঁকে নিঃসঙ্গতাকে পুঁতে ঝলসে উঠল সময়ের ছুরি।
গাছের পাতায় সূর্যের আলো নিবে আসছে এমন সময় শিশির ঝরে পড়ল
ঘাসে ঘাসে। পায়ের পাতায় শিশির লেগেছে এমন সময় বসন্ত শুরু হল,
সময়ের ছুরিটা ঝলসে উঠল বুকের ওপর।

সু, আপনাকে

সুতপা সেনগুপ্ত

১
নিজেকে পুঁটলি করে তাবিজ বানিয়ে দিই
বালিশের তলায় রাখবেন?
হ্যান্ডিক্যাম মনিটরে একে ওকে তাকে দেখে
আর জাগতে হবে না সারারাত

ধোঁয়া ধোঁয়া বেঁচে থাকা এরকম
ভালো নয়,
অনেকদিন হল —
এবার প্লিজ বাইরে আসুন

দেখুন, জাহান-আরা কত কিছু দেবে বলে
হাঁটু দুটো মুড়ে বসে আছে

মুখ তুলুন

২
হইহই রোদের মধ্যে, শাদা-শার্ট আপনাকে
আপনার ঘরে দেখে
ভাবলাম, ঈশ্বর নাকি?

হাসছেন তো? হাসুন

যদি জানতেন ঈশ্বর বলতে কী বোঝাচ্ছি

এক জীবন খুঁজে মরছি খুঁজে ফিরছি
জানতেই পারছি না
খুঁজছি কাকে

বাঙালিক্ষণ

আসলাম সানী

সেদিন সবাই জেগেছিল,
ঘুমন্ত মাটি-পাহাড়-ঝরনা-নদী
ম্রিয়মাণ চাঁদ আর জ্বলজ্বলে সূর্য;
কী প্রখর দাবদাহে উষ্ণতায়
উদ্দীপ্ত করেছিল সব কিছুকে একটি সূর্য।

এক মহান নেতার আদলে,
নীরব থাকতে দেয়নি সে কাউকেই
ওই স্নিগ্ধ সবুজ-শ্যামল বৃক্ষরাজি, বনানী
এমনকী আকাশের শুভ্র-সৌম্য মেঘদল;
যেন এক ঝাঁকুনিতে জাগিয়ে তুলেছিল
সমগ্র জগৎ-সংসার-মানবতা-বিবেক।

মনুষ্যত্ব, চেতনা আর প্রাকৃতিক অমোঘ
নিয়মের অন্ধ দুয়ারের বদ্ধ কপাটে
কড়া নেড়ে ভীষণ ধাক্কায় দারুণ ক্রোধে
বাতাসের সাঁই সাঁই দ্রোহে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মিশে
জ্বলে উঠেছিল, জেগে উঠেছিল সব।

ভাঙা-গড়ার কোথায় যেন নিয়তির লিখনের মতো
একান্তর নির্ধারিত ছিল।
শাশ্বত, চিরন্তন মহাকালের বেদিতে
সেই সত্য, সেই সুন্দর, সেই স্বাধীনতা
ললাটে রাজটিকা হয়ে
অমরত্বে অম্লান ফুটে উঠেছিল সেই জাগরণ।

দুটি কবিতা

ঈশিতা ভাদুড়ী

ভাষার বাইরে গোপন যারা

ভাষার বাইরে গোপন শব্দ রয়ে যায় যারা
তাহাদের পাঠ সহজ কি তত?

হে ঈশ্বরী, হে দেবী,
তুমিও কি পারো
চিনে নিতে ওইসব
টুকরো টুকরো মেঘ
কঠিন ও ভারী
ওইসব পাথরের স্তূপ
যমুনার নীচে যারা?

তুমিও কি পারো
ভাষার বাইরে যে সব গোপন শব্দ
চিনে নিতে আগাগোড়া?

এক দুই

এক দুই গুনছে মানুষ, এক দুই
মেঘ থেকে জল আর জল থেকে মাটি
পায়ের আঙুলে যদি বেজে ওঠে ওই
অবাক ঝরনার জলে পালকপাতাটি

পুড়ে যাবে তখন বিবর্ণ ক্যানভাস
আর হেসে উঠবে অক্ষর বর্ণমালা
সেইদিন ভালোবেসে অঝোর আকাশ
সেইদিন হয়তো বা লাল নীল খেলা।
এরপর দশ চার সাত পাঁচ যদি
ভুল গণনায় জেগে ওঠে চারপাশ
জলের বাহার থেকে আকাশ অবধি
ঢেউ থেকে শুরু হয়ে শেষ তবে ঘাস?

দুটি কবিতা

সুনীল করণ

ঝরনা

সারা দেহে, তিল তিল জমা জল
বাষ্পীভূত হয়ে
হল মেঘ
এবার বৃষ্টি নামার পালা।

তুমি ঝরনা হতে পারবে তো?

সীমারেখা

এক-একটা বৃত্তের মধ্যে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে।
ঘুরছি ফিরছি হাসছি কাঁদছি... রিমোট কন্ট্রোলে
নিয়ন্ত্রিত অস্তিত্বে ঘরের মধ্যে ঘর বাঁধছি,
ভাঙছি ঘর
সকলেই আগলে রাখে নিজস্ব বিবর।

এক-একটা বৃত্তের মধ্যে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে

শিল্পকর্ম

সুশান্ত রায়

জানা ছিল
তবু পিছন থেকে কেউ বলে দিল
রঙ্গমঞ্চে কোন কথাটুকু আমার বরাদ্দ
এবং কাকে সেটা বলতে হবে

কথার মেয়াদ এবং বলার ধরন
যদিও মহড়ায় নির্ধারিত আছে
তবুও নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষায়
অনেক অদল-বদল আদব-কায়দায়

কথা নিয়ে আদান-প্রদানে
একটি চরিত্র অন্য মানুষ হয়ে ওঠে

মঞ্চে দাঁড়াতেই
পিছন থেকে কেউ বলে দেয়
কী বলতে হবে
কী আছে সেই চরিত্রে বলার

আশ্চর্য, রঙ্গমঞ্চ বড়ো হতে থাকে যত
নেপথ্যে বলে দেওয়ার লোক সরে যায়
শূন্যতা ভরে দেয় তাকে — নিঃশব্দে

তখন যা বলার
তা শুধু বলার থাকে না
বোধ ও চেতনা মিশ্রণে
এক মহড়াহীন নাটকের চরিত্রে
সংলাপ মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য
কেউ আর থাকে না পশ্চাতে

নাটক তবুও চলে
এক চরিত্র থেকে অন্য চরিত্রে
নিয়মিত...

দুটি কবিতা

টোকন ঠাকুর

পুঁজিবাদী দিনের প্রেমিক

কেবল একটি ছাড়া
মুছে গেছে আর নয়টা দিক!
নামহীন গোত্রহীন — সে শুধু প্রেমিক

দোকানে আপেল আছে
আছে আঙুরের থোকা!
কিন্তু তার যথেষ্ট পছন্দ পোকা —

যে-পোকা আগুনের অত্যন্ত নিকটে গিয়ে নাচে
কিংবা টিকটিকিদের খাদ্য হয়ে বাঁচে

মেয়র ও মন্ত্রীদের শহরে, ব্যস্ত-ব্যস্ত
ভিক্ষুকেরাও মহানাগরিক!
সে এই সময়েরই কেউ না, সে শুধু প্রেমিক

এবং অবশ্যই সে ভোটার!
তার ভোট কে পাবে, কে প্রতিক্ষণ পায়
তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আছে? পরাজয়ও নেই

কারণ সে গায়ত্রী, সে চাকা
তার নামে নদীগুলো
পাহাড়ের পথগুলো বাঁকা

আর গন্তব্যে বিস্তর রহস্য, এমন দিনে
তর্কাতীত মেঘ ও কুয়াশা!
পুঁজিবাদে পুঁজি তার পুঞ্জ পুঞ্জ প্রেমলগ্নি আশা...

আমন্ত্রণলিপি

ভুবনডাঙা আনলিমিটেড!
ভুবনডাঙা তোমার দেখা সচরাচর ল্যান্ডস্কেপ নয় —
বড়োজোর, বেসিনের কাচের উপরে, শীতার্ত নিঃশ্বাস ফেলে

অনচ্ছপটে আঙুল দিয়ে লেখা নাম, আঁকা ছবি
যার মধ্যে নিজেকে দেখা যায়...

একটি কোলবালিশের কাছে সমর্পিত বিছানার নামান্তরই
হয়তো ভুবনডাঙা... হয়তো তাহিতি! তাই
দ্বীপান্তরের দিন এসে যায়

নিজেকে, তুলনা করি পাখির সঙ্গে, ভুবনডাঙার পাখি।

এরপরও তুমি যদি আজ বিচ্ছেদের তুরীয় যমুনা পাঠাতে চাও
তো, পাঠাতে পারো, ঠোঁটে তুলে নেব, গ্লাস
গ্লাসভরতি সমুদ্রের ফেনা...

এই হচ্ছে তোমার-আমার সম্পর্কের মেটাফিজিকাল ধারাবর্ণনা!
কিন্তু নিশ্চিত, তুমি ঠিকানা জানো না —
কারণ, নিঃসঙ্গ ঈগলগোত্রীয় এক পাখি
ব্যতীত আর কেউ-ই তো জানে না
আমি ভুবনডাঙায় থাকি!

সেই ঈগলগোত্রীয় পাখি... আজ আর কোথায় তাকে পাবে?
যার চোখ ক্রোধের আড়ালে বিষণ্ণ, সদাহত, মুখে দু-একটি
বলিরেখা দিয়ে লেখা আমন্ত্রণলিপি — 'আমার সঙ্গে যাবে?'

কাজ

দেবাশিস চাকী

সম্মতিসূচক রেখার কোথায় একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব চোখে পড়েছিল
নীতিবাক্য দিয়ে তোমাকে বোঝানো যত সহজ ছিল
অন্য কোনো মৌখিক আশ্বাস দিয়ে ততটা পারিনি
যেখানে সকাল আর সন্ধেবেলাকার ছায়া একসঙ্গে খাবলাখাবলি করে
আমার যে নাকউঁচু-স্বাদ শুধু ভাত-কাপড়ের গন্ধ পায়
ধূসর দিনের আলাদা আগ্রহ কোনো ঐতিহ্যের ফাঁকে অপেক্ষা করতে দেখি
বুকের ছটফটানি যখন আমাদের স্বপ্নে পা ফেলবে
বুঝব আমার কাজ শেষ হল

যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা টান
কত জটিল প্রক্রিয়ায় একটা একটা মোড় পেরিয়ে যায়, ভাবি —

অমোঘ দাবিও তার যন্ত্রণার কালো দাগ রেখে গেল
প্রকৃত ভয়ের শিহরন কোনো ছোবল দিতে পারেনি
একমাত্র নদী ছাড়া আর কেউই জানেনি
লুকিয়ে থাকা উপপ্লব টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে কোন পরিণতিতে
আমি জানি না
বন্যতার উপলব্ধি মুছে যেন জিগির তুলছে ভেতরের খিদে
এই দ্যাখো স্বীকারোক্তিগুলো কত মারাত্মক আকার ধারণ করেছে
কী করে জানল এরা — এটাই তাদের ভবিতব্য!
অথচ বাঁশি বাজবার পরও জানে না সে আবার বাজবে কী না?

তোমার নড়াচড়া ভালো হোক মন্দ হোক —
সদুপদেশ দিতে ভোলে না!

স্পর্শদোষ

অঞ্জলি দাশ

এই ভরা মেলা, ওই ধুলোয় পায়ের ছাপ,
উড়ে যাওয়া কবিতার পাতা, সব্বাই জানে
তুমি তার হাত ধরেছিলে।

মেলা মাঠে, মাটিতে ছড়িয়ে বসে
লাজুক তুলির টানে,
সেই গল্প এঁকেছে পটুয়া ছেলেমেয়ে।

অগোছালো চুল থেকে রাত্রির আভাস লাগা চোখ,
তার সবটুকু নেশা দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে যাকে,
সে তোমার আঁচলের নকশা থেকে
একটিমাত্র পাখির পালক নিয়ে
সারাটা বিকেল হাওয়ায় লিখেছে নাম।

সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে
ঘষে ঘষে কিছুতেই তুলতে পারছ না সেই দাগ,
শরীরের তাপ লেগে পুড়ে যাচ্ছে ঘর।

স্পর্শদোষে ভেঙে যাওয়া বাঁশি নিয়ে,
একা সুরহীন, মধ্যরাতে ফিরে এলে
ফুরোনো মেলার মাঝখানে,
কিছু কি ফিরিয়ে নিতে এলে?

অলীক

রাহুল পুরকায়স্থ

বসি বাতায়নে
বাতায়ন বিগ্রহ অতীত
বর্ণহত্যা জেগে আছে নিসর্গগভীরে
যত ছলা, ছলাকলা, ভাষা বিলোপন
ওরই মাঝে ওড়ে পাখি, অন্ধ পাখি
ডানা ভাঙা, বাদামি কেশর

ক্ষুধা ও ক্ষুধামান্দ্যের অব্যবধানেও দেখি পাখিটিকে, ওড়ে

ওড়ে উল্কা তেজদীপ্তি, বিদ্রূপপিপাস
পিপাসার্ত কাব্যখানি, বর্ণখানি জ্বলন্ত মাংসের পিণ্ড
লোকালোকচ্যুত
ক্ষিতিরেখা বজ্রযান, তুমি আমি অবাক আরোহী
নেশাচ্ছন্ন, বিভ্রমেরে দিয়ে হাতছানি
হন্তারক, আমি তুমি দেখেছি নিজেকে লোহুরাঙা

পাখি ওড়ে, তবু ওড়ে, অন্ধ পাখি, বাদামি কেশর
ডানা ভাঙা

বাড়িবদল

মন্দার মুখোপাধ্যায়

নতুন বাড়ি। বাইরের ঘর। নতুন
আসবাব। নতুন সাইড-ল্যাম্প। অন্দরে
আরাম। টাটকা তরমুজের শরবত। নরম
সন্দেশ। সৌজন্য ভদ্রতা। তবু বারবার
আমি যেন সেই পুরোনো বাড়িটারই
দরজায়। কলিংবেল ছিল না। সিঁড়ির মুখে
দাঁড়ালেই উপচে নামত ঘরগুলো।
সেই মানুষদুটির উপস্থিতিই যেন গোটা বাড়ি।

চলন গঠন কিছু আলাদা ছিলই। ডাইনিং
টেবিল ছিল না। ড্রেসিং টেবিলও নয়।
আলাদা ছিল তার গড়ে ওঠবার ইতিহাস।
মাঝে মাঝে গেলেও, মনেই হত,
যেন প্রাচীন নয়, যেন নতুনও নয় — শুধু
এক অদ্ভুত আবহমানতা, উৎসব বাড়িটিকে ঘিরে।
দেওয়ালের ছবি, ঘরজোড়া খাট,
আলমারি ভরতি বই, নন্দলাল —
অরিজিনাল — সব নিয়ে চলে গেছে
বাড়িটা কোথাও। কিছুটা দানপত্রে দাবিদারদের
কাজে। কিছুটা অবহেলায় —
সীমাচিহ্নহীন — বাঁটোয়ারা — ভাগে।

এই নতুন অন্দর কেন বারবার
আমাকে ঠেলে দিচ্ছে এক অবুঝ বিষাদে!
হারিয়ে যাওয়া বাড়িটাকে কেন বারবার আঁকড়ে
ধরছে আমার পঁচিশ বছর আগেকার বয়স!
আমার অগাধ অক্ষমতা! আমার কী হবে!
কী করে বাঁচব আমি — এই এক নতুন সময়ে!

অর্ধেক সত্যি

প্রবালকুমার বসু

নিছক দেখাই ভ্রান্তি, যতটাই দেখা যায় চোখে
তাই অভিজাত, তাই মিথ্যে মিথ্যে ঈর্ষাকে জাগায়
পশ্চিমের রোদ এসে কাঁঠালচাঁপার গন্ধ শোঁকে
মধ্যরাতে যেইভাবে চাঁদ কৌমার্য ফিরে পায়

মুহূর্ত বদলে যায়, অলৌকিক শান্তি পারাবারে
ধারাবাহিকতা ছাড়া প্রতিভার মূল স্রোতে যারা সাঁতরায়
সন্দেহ নিবিড় হলে তাদের ভুলের অনুমানে
কৌমার্য উপেক্ষা করে কে বা আর খ্যাত হতে চায়

সতত আংশিক দৃশ্য নেহাতই অনিবার্য না হলে
অন্ধকারে মানুষই তো অতিরিক্ত নির্ভরতা চায়

দুটি কবিতা

সঞ্চয়িতা কুণ্ডু

চুল্লিপুরাণ

হাসতে হাসতে হাততালিতে জন্ম এক...
কেন রাষ্ট্র, কেন দল? এই সামান্য সংসার...
সব চতুরের কূটরঙগুলি ঘৃণার গঙ্গা
কলুষমুক্ত সৃজন ভাসাব ওই বক্ষে
হে পবিত্র অগ্নিজীবন —
জলজ্যোৎস্নায় তোমাকেও নেব কথা দিলাম।

খুচরো পয়সা ব্যাগ ঝনাঝন...
কাঁচের চুড়ি হাত ঝনাঝন...
বেতন কুড়াই হাত বেহাতে
মুখের দিকে তাকাই না তো
তখন আমার আঠারো বছর
লোকের মুখে বিষের থলি!

সব কাঙালের হীনরঙগুলি ঘৃণার গঙ্গা
ধূসরমুক্ত শালুক ভাসাব ওই বক্ষে
হে পবিত্র আরাত্রিকা —
জলজ্যোৎস্নায় তোমাকেও নেব ভেবেছিলাম।

দীর্ঘ সময় বাঁধতে বাঁধতে
দীর্ঘ সময় ভালোবাসা যায়
স্বপ্ন আমি বাঁধিয়েছিলাম
রঙওয়ালার রঙের ঘরে
কেউ বোঝোনি খোঁজ রাখোনি
ভাবছ ভিক্ষাপাত্র ছাড়াই
কী দ্যাখে এ শিরীষ ছাতিম
কীই-বা আছে গাছে গাছে
সময় নষ্ট নষ্ট সময়
রঙওয়ালার রঙের ঘরে
প্রতিবাদহীন সামান্য ঠোঁট

আর্ত পলাশ,
অধৈর্য নয় শিরীষ ছাতিম
মানুষই তো ধৈর্য হারায়
মানুষ দ্যাখে ক্ষতমানবী
ক্ষতমানবী ভিক্ষাপাত্র ছাড়াই বাঁচে
আঠারো বছর স্বপ্ন বাঁধাই
কেউ দ্যাখোনি ফিরেও না না
হে পবিত্র আরাত্রিকা —
স্বপ্নও কি নির্লজ্জ দীর্ঘকাঙাল!

মাগো তোমার আষ্টেপৃষ্ঠে আমরা ক-জন
চোখের মণি আমরাই তো!
মেঘে মেঘে চোখ ঢেকে যায়
আমরা তোমার অন্ধদিন
বোনেরা এখন আগুন বেচে
ভাই কেরোসিন
এই নিয়মেই স্বজন বাঁচে প্রাণের গ্রহে
বিজ্ঞান বেচে অবলুপ্তির কঠিন স্বপ্ন।

মাগো তোমার সেই স্বপ্নে দুঃখ নেই তো?
তুমি বলতে তোমার ছেলে সাহেব হবে
লোকে বলবে—প্রদীপবাবু বাড়ি আছেন?
তুমি বলবে—তিনি এখন অনেক দূরে!...

দেশি কেরোসিন গন্ধ ভীষণ মিষ্টি এখন
ফুলের গন্ধ না
ভাতের গন্ধ হা
মাটির ঠাকুর পোড়াচ্ছে বোন
জ্বলছে সারা গা...

মাটির চুল্লি শ্মশান যেন ঈশ্বরের ঘর
একসঙ্গে অনেক ঠাকুর পুড়ছে পরপর
ভাই-এর হাসি বোনের হাসি মায়ের হাসির পারে
আমি ভীষণ হাততালি দিই ঈশ্বরও যে পোড়ে।

হিমকম্পকথা

এই আকাশ চোদ্দোপুরুষের —
ইথারে কথা হয় আধিভৌতিক,
পূর্বপুরুষের কথা শিশিরে ভেজে না।
হেমন্তের মাঠ ভেজে, কাক ভেজে
তার হু-হু শূন্যতার জন্য দীপাবলী!

কাকের নগরে আমি প্রদীপ জ্বালতে যাই,
কাকের শিয়র জুড়ে চলে গেছে এ কোন বিষাদ!
ধানখেত, শস্যহীন...
এ-কথা কাকের কাছে গোপন রাখব।
দৈন্যের ভিতরে তার শিউলিসফর,
আর এই চুপিসারে অঘ্রাণের শুরু —
ইথারে হিমকম্পকথা...
সমস্ত নক্ষত্র তার দীপ জ্বালুক,

এই মাটি চোদ্দোপুরুষের।

শুভেচ্ছা

সৈয়দ হাসমত জালাল

এসো বৈশাখ, গ্রীষ্মদগ্ধ স্মৃতিদেশ থেকে ভেসে এল
রাত্রির টেলিফোন
যেখানে মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাস ঘিরে জেগে আছে উদ্বিগ্ন ইতিহাস
বাঁধানো পুকুরঘাটের পাশে পুরোনো দালানবাড়ি
আরো সব পুরোনো তোরঙ্গের নীচে কবেকার চিঠির শব্দেরা
ফিসফাস কথা বলে
ধুলো আর চূর্ণ হাওয়ায় মিশে থাকে স্পর্শ ও অশ্রুর চাপা স্পন্দন...
তারা আজ শুভ অশ্রু, শুভ ধুলোকণা, শুভ সব শান্ত বাতাসেরা
আমি ওই দূরতম প্রাণের কলস্বরে সাড়া দিতে চেয়ে
স্তব্ধ বসে থাকি
কথা বলে আকস্মিক রাত্রির টেলিফোন, শুভকামনার দিন, শুভরাত্রি,
শুভ অনড় সময়...

অলৌকিক

বীথি চট্টোপাধ্যায়

তুমি যদি রবীন্দ্রনাথ হতে
আমি হতাম নতুন বৌঠান —
সূর্যাস্ত জোড়াসাঁকোর ছাদে
বৈশাখী ঝড় নতুন বাঁধা গান।

তোমার তখন তেইশ-চব্বিশ
তোমার গায়ে পিরান দুধ-শাদা —
সকালবেলা ভৈরবী সুর বাজে
বাঁধানো ঘাটে বজরাটিও বাঁধা।

নদীর ঘাটে নুয়ে পড়ছে গাছ
জ্যোতিদাদাও ব্যস্ত যথারীতি,
সারা দুপুর দুজনে মিলে ভাবি
কবিতা লেখার নানান রীতিনীতি।

সন্ধে নাগাদ লেখাও হয়ে যায়
তখনো কত গল্প বাকি থাকে,
সেবার তুমি বিলেত যাবার পথে
জাহাজ-ডেকে মনে করতে কাকে?

দেখতে দেখতে তোমার নাম হত
উদীয়মান নবীন কবি বলে,
আমার মুঠি আলগা হয়ে আসে
তোমার জন্যে পাত্রী দেখা চলে।

তুমি নতুন বন্ধু পেয়ে যাও
আমার তো আর কেউই তেমন নেই,
গোপনে রাখা ঘুমের বড়ি নিয়ে
হারিয়ে যাই আলোকবর্ষেই।

সেই ঘটনার বছর দু-এক বাদে
তুমি আমার পরিত্যক্ত ঘরে,
এসে দেখতে ধুলো জমেছে কাচে
হঠাৎ হাওয়ায় বইয়ের পাতা ওড়ে।

তুমি তখন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে
বসে পড়তে পালঙ্কের কাছে...

মৃদু ডাকতে নতুন বৌঠান
কোথায় তুমি? বারান্দার গাছে —

হাত বুলিয়ে জল ছিটিয়ে দিতে
আমি তখন আলোকবর্ষ দূরে,
একা ঘুরছি আকাশ পথে পথে
শুধুই মেঘ নবীন মেঘের সুরে।

অথচ তুমি জোড়াসাঁকোর ঘরে
বসে ভাবছ তোমার বৌঠান,
কোথায় আছে, সত্যি আছে নাকি?
ভেবে তোমার কলম খরশান।

তুমি যদি রবীন্দ্রনাথ হতে
তাহলে এক কিংবদন্তি হত,
বাংলা ভাষা বাংলা কবিতায়
আমি হতাম কাদম্বরীর মতো।

জল

বাদল ঘোষ

সারারাত সমুদ্রজলে নগ্ন কাটালাম
চোখে জল, মুখে জল, শিরায় শিরায় শুধু জলের প্লাবন
বিমুগ্ধ সময় কেঁপে ওঠে শিহরনে।

ক্রমে হল বসবাস জলের জগতে
শরীরের অস্থিমজ্জা সবই ক্রমে জল
নীল জল, লাল জল, বিচিত্র মুদ্রায়
জলকণা জুড়ে ভাসে আদিম প্রজাতি।

আমার শরীর আজ জলে মেশে
আরেক শরীরে
অনিন্দ্য সমুদ্রে করি জলকেলি, আমরা দু-জন
পাখির ডানায় লেখা মানবের খিন্ন পদাবলী
সে-ই জানে হৃদয়ের যাবতীয় জয়-পরাজয়।

যাপন রহস্য

বাসব দাশগুপ্ত

১
অন্ধকার জ্বলছে, আমাদের রোমকূপ থেকে ছিটকে গেল প্লাবনের বীজ,
জল দাও, সুধা দাও, মদ দাও মৃৎপাত্র থেকে, তারপর প্রত্যক্ষ করো
গোপন বাক্স থেকে ঘুম ভেঙে আড়মোড়া ভাঙছে যৌনভ্রমর, হুল দিলে
চেপে যাওয়া ছাড়া অন্য গতি নেই, গ্রহতাপ বেড়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে যোনিপুলক,
এভাবেই আমাদের পরিচয় শুরু, আমাদের শ্বাসবিষ মুখে করে উড়ে গেল
মাংসাশী ময়ূর, কবে যে মেঘ হবে, ময়ূরের নাচে নাচে ছেয়ে যাবে
মধ্যবিত্ত রাত, ইস্কুলের গলির পাশে হেডমাস্টারের বউ বিক্রি করছে
ঋতু-প্রতিরোধ, আকাশবাড়িতে গর্ভস্তব্ধ বুড়ি বিলাপের স্বর এস.টি.ডি.
করে পাঠিয়েছে কাশীর কেদারঘাটে, অন্ধকার জ্বলে, আমাদের ঘুমে-ম্লান
আলোর সন্তান মরে গেছে গত রাতে পুলিশের গুলিতে

এভাবেই চিৎকারে ফেটে যাচ্ছে আমার কবিতা, তার ছিন্ন মাংস,
জীবন্ত রক্ত লেগে যাচ্ছে কথামৃত-র গায়ে, লালাদাগ বহন করেছে কিছু
ঐতিহাসিক ফাজলামি অথচ তুমি তো জানো আমাদের এই বেঁচে থাকা
কেবলই হারিয়ে যাচ্ছে রহস্যময় চৌকিদারের চোখে, আর পিছনে
পিছনে একসার প্রি-প্রাইমারির বাচ্চা হয়ে আমরাই হাততালি দিয়ে বলছি,
'ভালোমানুষি রাখ্ হারামজাদা তোদের আসল চেহারা আমরা চিনে ফেলেছি'

২
বায়ুমণ্ডলের ফুটো থেকে নেমে এল অতিবেগুনি আলো, এখন
কোথায় লুকোবো, কোথায়, চরাচর জুড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে আশ্চর্য নৌকা,
পাল নেই, দাঁড় নিয়ে চলে গেছে রঙিন বালিকা, এদিক ওদিক থেকে
ছুটে আসছে পূর্বপুরুষদের সমস্ত অপকর্ম, প্রাচীন পাতায় লেখা স্বপ্নদোষ
হাত ধরে নিয়ে আসছে সকালবেলার প্রেম, অচেনা বন্দরে ভিড়ল
প্রকাণ্ড জাহাজ, ছেঁড়া কাগজের টুকরো ছিটিয়ে কেউ একজন বলছে,
'ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং...', মুড়ি নারকেল খেতে খেতে ছাত্রদের জ্ঞান দিচ্ছে
আমাদের বৃদ্ধ হেডমাস্টার, কোথায় গোপন হব, কোথায় লুকাবো

যতগুলো গুহামুখে উঁকি দিচ্ছি, প্রত্যেকটার মধ্যে ঘুমাচ্ছে আমাদের কবি,
কবির বন্ধুরা হল্লোড় করছে, যারা গায়ে উলকি আঁকছে, নিজেদের
ক্রমশ অচেনা করবে বলে পরস্পরের স্বাদ নিচ্ছে তারা, অথচ আকাশ থেকে
জিভ বাড়াচ্ছে বিষ-আলো, ছুঁয়ে দিচ্ছে গোপন চিঠি, কবির তৃতীয় নয়ন,
একজনের মৃত্যুর চিহ্ন নিয়ে জন্ম নিচ্ছে আরো একজনের মৃত্যু, এভাবেই
আমরা পাগলাঘন্টি বাজিয়ে যাচ্ছি বধিরদের পাড়ায়

তিনটি কবিতা

প্রবীর রায়

লেখার বিষয়

স্মৃতিরোমন্থনের কেন্দ্রে রাখি ওই জলনিকাশি ফোকর
ওটিই ছিল পিঁপড়েদের যাতায়াতের পথ
আমিও অনবরত যেতে থাকতাম ওদের সঙ্গে
বাইরের রোদ ও মাটির কাছে

তাদের শুঁড় ও পায়ে একটা গান ছিল
যা আমি লিখতে চাইছি আজো।

সময়চিহ্ন

কাগজের পৃষ্ঠাটিতে দেখি আলোপিঠ
যখন তার ওপর একটি কবিতা লেখা হল
রেখাগুলি কখনো সরল কিংবা বল্লম ত্রিভুজ
তাকে কখনোই আধুনিক করে তুলতে পারি না
অতীত কবির বিন্দু অশ্রু এসে পড়ে
পৃষ্ঠাটিতে ভিজে ভাব থেকে যায়।

সম্মতি

জানলায় কুয়াশার পরদা হাতের কবজি অবধি নীল সোয়েটার
ঘরের ম্লান আলোতেও আমন্ত্রণ ছিল
তোমার হাতে ছুরি টেবিলে বাঁধাকপি
বাঁধাকপির ভিতর দিয়ে অজস্র রাস্তা
সুতোর মতো ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে তোমার হাতে

সবুজ আভার শাদা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছি
আছি-ই।

মহাভারতের চরিতাবলী

যশোধরা রায়চৌধুরী

ভীষ্ম

সেই ভদ্রলোক সব বুঝতে পারতেন কিন্তু কিচ্ছু করার ছিল না
সেই ভদ্রলোক মোটা চশমার, সারাদিন স্টেটসম্যান পড়তেন
আর চিঠি লিখতেন স্টেটসম্যানকে : হে সম্পাদক
আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার এত বেশি কেন?

গিন্নি সংসার চালাতে হিমশিম, মেয়ে দুটি বড়ো হয়ে উঠল
ভদ্রলোক সব কিছু বুঝতে পারতেন কিন্তু কিচ্ছু করার ছিল না
রোগা, গালে কাঁচাপাকা দাড়ি, চিঠি লিখছেন, হে সম্পাদক
মেয়েদের এই অবস্থা কেন এ পোড়া দেশে

মেয়েদের বিয়ের গয়নাগাটি আসবাব
দিতে গিয়ে গ্র্যাচুইটি শেষ। গিন্নি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
উল বুনতেন, বিক্রি করতেন আচার আর বড়ি
সেই ভদ্রলোক সব বুঝতেন কিন্তু কিচ্ছু করার ছিল না

নাতিদের ইংরিজি ইশকুলে দিয়ে
জামাইদুটো যখন পয়সা রোজগার করতে খাবি খাচ্ছে
মেয়েদের হাতে একটু বেশি তুলে দিতে
গিন্নির পায়ে হাজা, চোখে ছানি, গলা, হাত ফাঁকা

জিরজিরে বুক, ঢলঢলে ফতুয়া
ভদ্রলোক তখনো... হে সম্পাদক
জলে কেন আর্সেনিক, তৃতীয় বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থায় কেন এত ত্রুটি
আমাদের মূল্যস্ফীতি কেন এত ভয়াবহ...

কর্ণ

আমি কেন বেঁচে থাকব, যদি না অতর্কিতে
তোমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি?
আমি কেন বেঁচে থাকব, যদি না তোমাদের
বলতে পারি
সন্দেহে ভরা এক জন্ম-উপাখ্যান
না-জানা ও ভয় সম্বলিত

ঘুমে ঢলে পড়া, প্রায় বিস্মৃত ছোট্টবেলা
যদি না অতর্কিতে খুলে দিতে পারি
নীচে কয়লার ঘরে আটকিয়ে রাখতে পারি তোমাদের
আরশোলা সহ?
তোমাদের ঢেকে দিই অসম্ভব গুঁড়ো গুঁড়ো
অস্বস্তিকর অন্ধকারে?
মৃতের শরীর আর শবাধারে যেইভাবে ভরা থাকে কালো
পোকা, অবচেতনের
যারা খুবলে খেয়ে নেবে বাকিটুকু, অবশিষ্ট
যা কিছু নিজের বলে ভাবতে তোমরা এতদিন ধরে?

আমি কেন ভুলে যাব যাবতীয় নিপীড়ন আশৈশব, ভুলে গিয়ে
কেন ভালোবাসতে হবে এমনকী শত্রুকে
যেখানে ঈর্ষায় আজ আমার বিকেল থমথমে
যেখানে রাত্তির ভরে যায় উষ্ণ ক্বাথে
ঘামে, হেলে পড়া বীর্যে, বিষণ্ণতায়
ঘটনাক্রমে আমি কামনা করেছি পরস্ত্রীকে

আমি কেন বেঁচে থাকব যদি না সবার মনে মনে, তোমাদের
যাবতীয় ব্যর্থ কামচিন্তা আমি খুলে এনে বাইরে দেখাতে পারি, বলি
তোমাদের দ্বিচারিতা, স্খলন পতন
একটু আধটু অসভ্যতা, আমারই মতন...

অর্জুন

সে-সময়ে ভালো লাগত অর্জুনমামাকে।
মায়ের বশংবদ। প্রায়ই আসত। চুপচাপ বসে
থাকত। কথা বলত। আর বাড়ি চলে যেত।

অর্জুনমামা ছিল তরুণ আর্টিস্ট।
কলকাতায় পাত পায়নি। এত বেশি কমপিটিশন।
চেকোস্লোভাকিয়া গিয়ে একটু আধটু প্রদর্শনী করে
যা কিছু উপার্জন... টাকাপয়সা ছাড়া আরো কিছু
সুন্দরী মারিয়ামামি... আমাদের হিরোইন... সত্তর দশকে
ধবধবে ফরসা মামি শাদা তাঁত পরে এসে আমাদের ছাতে
কাঁচা আম-মাখা খেত। গল্প করত মা-র সাথে। আর

ভিতরে ভিতরে আমি রূপকথা বানাতাম... একটুও ইংরিজি
পারি না, লাজুক, দূরে দেখতাম চাঁদের আলোয়
কীরকম কেঁদে ফেলছে অর্জুনমামার শাদা বউ।

হিন্দু মামাবাড়ি ওকে নিতে পারল না ঠিক। পরে
অর্জুনমামার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল মারিয়ামামির।

তারপরও আসত মামা... বাদামি, নরম, নত মুখ
অভাবতাড়িত, ক্লিষ্ট, পরে কোনো বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করে
অল্প সুখী, রোম্যান্টিক, ব্যর্থ, চুপচাপ

হাতের তুলির টান দারুণ জোরালো

সে-সময়ে ভালো লাগত অর্জুনমামাকে
বার বার প্রেমে লাট খাওয়া, শিল্পী, বনবাসী, দূর

অর্জুনমামাকে আমি কতবার স্বপ্নেও দেখেছি।

দুটি কবিতা

সিদ্ধার্থ সিংহ

ভুল হোক

ভুল হোক।
সূর্য ভুল করেছিলেন।
কুন্তি ভুল করেছিলেন।
ওঁরা ভুল করেছিলেন বলেই
কর্ণ নেমে এসেছিলেন পৃথিবীতে।
ভুল হোক।
সবকিছু ঠিকঠাক চলছে বলেই
যতদূর চোখ যায় শুধু ম্যাদামারা
আর নুলোন্যুব্জ,
শিড়দাঁড়া সোজা করে দাঁড়াবার কেউ নেই।
ভুল হোক, ভুল হোক
মাঝেমধ্যে একটা মারাত্মক রকমের ভুল হোক।

মাপ

কোনদিক থেকে আলো পড়ছে
তার উপর নির্ভর করে ছায়াটা লম্বা হবে, না খাটো।

তোমরা যে যেভাবে পারো ওর ছায়া লম্বা করো
যখন ও থাকবে না
তখন কেউ আর ছায়া দেখে ভাববে না
— লোকটা এত বড়ো ছিল!
তখন ওর মাপটাই শুধু বলাবলি করবে সবাই।

রহস্যের পাহাড়

বিশ্বজিৎ রায়

মৎসকন্যা যারা ছিল, তাদের থেকে অনেক দূরে
তোমায় দেখেছি —
তুমি নীরবতার ছাতা মাথায়
অদ্ভুত এক বিশ্বাস বুকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলে...

চারপাশে কিছু ছিল না, তবু মনে হয়েছিল
তোমাকে ঘিরে জ্যোৎস্না
আর রহস্যের পাহাড়
দীর্ঘচিঠির মতো অদ্ভুত এক রঙ
ছড়িয়ে রেখেছিল নীলিমার দিকে

পাহাড়চূড়ায় দেবীমূর্তির মতো তুমি
নিষ্পাপ দাঁড়িয়েছিলে,
অথচ আমি ছাপোষা মানুষের মতো
আবহাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে
কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম —

এক পা-ও তোমার দিকে এগোতে পারিনি...

দুটি কবিতা

হাফিজ রশিদ খান

ভোটাধিকার

পৃথিবীর সমস্ত ঘুঘুর কবোষ্ণ বুকের জীবনধারায়;
মগ্ন জলাশয়ের কিনারে
সারসের ধ্যানের ভেতর
একটি চঞ্চল খলশের মতো
তোমার সপক্ষে অজস্র ভোটাধিকার আমি সঞ্চয় করেছি।

বাংলার বর্ণিল ঋতুচক্রের সাঁকোয় ভেসে-ভেসে
করেছি অমল জনসংযোগ প্রত্যেক ঘরে-ঘরে।

আমি গেয়েছি তোমার সদিচ্ছার সকল সুন্দর গান,
নুয়ে পেয়েছি অমন শ্রাবন্তী পায়ের নীচে
পালযুগের শ্রীমন্ত কারুকাজ!

একটা-একটা করে আমি অনন্ত ভোটাধিকারে
চাই তোমাকে আবার
খরানকালের
মাটিলেপা শীতলপাটিতে।

খরানকাল (ময়মনসিংহ, আঞ্চলিক প্রয়োগ) — অনাবৃষ্টি।

পারানি

স্টিমার গভীর গোঙানির সঙ্গে চলে লংগদু বাজারে।

স্তব্ধ-পাথরের ভাঁজ কেটে পর্বতেরা দাঁড়িয়েছে
কুয়াশার মসলিন গায়ে।

ঠাণ্ডা ছায়া আর উষ্ণ সূর্য-আলোকের
গভীর দ্বৈরথ মনে আনে
আদিবাসী মেয়ের মলিন অরক্ষণীয়া মুখাবয়ব।

এখনো রিজার্ভ বাজারের ঘাটে
ঘাটতি পয়সার বেদনায়
যে দাঁড়িয়ে আছে।

আট পায়ের ঘোড়াটি

তাপস রায়

একটি তৈলচিত্রের ভক্তি, পূর্ণ করেছে দিবস-রজনী
সত্যি সত্যি মেয়েরাই সুবিধেজনক চুমু খাচ্ছে চরাচরে
অবাস্তব এইসব হিংসে হিংসে চোখ টেপা
সীমান্ত থেকে সরে আসছে কেন্দ্রের দিকে
মনোরম রঙে তাজা বুলেটের শক্তি কুহক চেনাচ্ছে

নৃত্যের শাদা-কালোয় ওই ভ্রূভঙ্গি টের পাওয়া যাচ্ছে না তেমন
দু-একটা আকাশ জলপ্রপাতের দিকে ঝুঁকে আছে
একটা কামে প্রাঞ্জল চারা রোপণ করে গৃহী কৃষক
ফলভারানত দেহকলির নরম আলো মেখে বলছে বেশ
সত্যি সত্যি ফ্লাই-ওভারগুলি রাতের কলকাতাকে কৌতূহলী করেছে

আমরা বেরিয়ে আসছিলাম মিউজিয়াম থেকে
আমরা বলতে তেমন কেউ নয়, সামান্য সাধারণ
ওরকম কঙ্কাল, ওরকম পাথর, ওরকম ভোঁতা অস্ত্রশস্ত্র
সেকেন্ড মিনিট ঘাঁটা দিন-মাস-বছর-যুগ-শতক
ফেলে আসার নিষ্প্রাণ প্রস্তাব শুনতে শুনতে বেরিয়ে আসছিলাম

ঘন থকথকে রসকলি জ্যোৎস্নায় মুখ গুঁজে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র
সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং ভূখণ্ডের পতাকা ওড়াচ্ছে
আর তার সম্ভবামি মিথষ্ক্রিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে পরান্নপ্রেমিক তৎপরতা
একটি রক্তচোখের জলরঙে যেমন মুছে যাচ্ছে দূরপ্রাচ্যের ভাস্কর্য
ওই গ্লোবাল সুড়সুড়িটি সেখানে তেমন করে আনন্দ পল্লবিত করছে

দুটি কবিতা

অলোককুমার বসু

ক্ষতি

একবার এসে এই হাত স্পর্শ করো
না হলে ফুরিয়ে যাব আমি
একবার তুলে ধরো তুলসীপ্রদীপ
দ্যাখো সন্ধ্যা আমার দু-চোখে এসে তারা হয়ে গেছে।

ক্ষমা

ভুল করে প্রতিবারই বলি ক্ষমা
যেন অসাবধানে মাড়িয়ে ফেলেছি
অসমাপ্ত ফসলের মৌসুমি খেত।
হাত থেকে পড়ে গিয়ে পাথরের পার্থিব গ্লাসও
টুকরো হয়ে যায় — ওখানে আমার কোনো বিম্ব নেই!

ভেঙে গিয়ে ভুলে গিয়েছি জন্মদিন কবে
হারিয়ে গিয়েছে বন্ধুদের নাম-লেখা খাতা
স্টেশনের নিবিড় ভিড়ে দ্রুত মিশে যাওয়া সহপাঠীর
নাম কেন মনে পড়ল না, পিছুডাক ডেকে
হয়তো ফেরানো যেত অতীত জীবন।
আসলে সমস্ত জীবনই খাঁচা
হীরামন রূপকথা পাখি গেছে মরে
কতদিন কতবার ভুল করে ক্ষমা চাওয়া যায়।

দুটি কবিতা

মনিকা রায়

পাতিরামের সামনে

তুমি বললেও আমি পাতিরামের সামনে দাঁড়াব না
ওখানে মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল
ওখানে শ্রীলেদার্স-এর ঝকঝকে শো-রুম
চোখ চলে যেতেই পারে সামনের কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের
রুজ-লিপস্টিকের দোকানগুলোর দিকে।

তুমি বললেও আমি আর কখনো পাতিরামের সামনে দাঁড়াব না।
তোমার হাত ধরেই আমার ওখানে যাওয়া
পাতা উলটে উলটে নতুন কাগজ দেখা
হরিদার দোকানে মুখোমুখি বসা
এস.টি.ডি. বুথ থেকে বাড়িতে জানিয়ে দেওয়া —

'ফিরতে দেরি হবে...'
ও প্রান্ত 'ঠিক আছে' বললেই হাত দুটো ডানা হয়ে যাওয়া
কিন্তু এখন!

তোমার মুখের দিকে তাকাতে তাকাতেই
দেয়াল থেকে পালটে যাচ্ছে ক্যালেন্ডারের পর ক্যালেন্ডার
আমাকে ছুঁলেও তোমার মুখে আর সেই আলো দেখি না।

আমি আর কখনোই তোমার জন্য ওখানে দাঁড়াব না
কক্ষনো না।

তবু

বাস্তুশাস্ত্র বলে —
ঘরের জিনিসপত্র একটু এদিক থেকে ওদিকে সরালেই
শান্তি ফিরে আসে।

আমি শিলনোড়া পুব থেকে পশ্চিমে সরালাম
দোরগোড়ায় রাখলাম কানায় কানায় ভরতি কলসি
পরদার রং বদলে দিলাম
হাস্যরত বুদ্ধ রাখলাম ঠিক জায়গায়
উত্তর-মুখ করে বসালাম লক্ষ্মীর আসন
অথচ আজও রাত হলে থেকে থেকে বাসনকোসনের ঝনঝন শব্দ
কিল চড় ঘুঁষির ধুপধাপ,
যা শুনলে প্রতিবেশীরা কানে আঙুল দেয়
সেইসব শব্দের ফুলঝুরি

বাস্তুশাস্ত্র বলে —
ঘরের জিনিসপত্র একটু এদিক থেকে ওদিকে সরালেই নাকি
শান্তি ফিরে আসে!
আমি তো সবই সরালাম
সব।
তবু...

বিকাশ ভট্টাচার্য-র ছবি

মানসকুমার চিনি

একলা মানবীর দিকে তাকিয়ে
যে তুমি ছবির ওপারে
স্বপ্নে ঝাঁপ দাও অনন্ত রঙে —
ক্যানভাস মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে
তুমি শরীরের বিমূর্ত চিহ্ন চেনাও
মন যেন অন্তঃপুরে খেলা করে।
আমি সামান্য দর্শক মাত্র
মুহূর্তে রঙের খেলা দেখি
যেভাবে জেগে থাকে নারী
দশরূপ চিহ্ন ভেদ করে।

দুটি কবিতা

জ্যোতির্ময় ওয়াদ্দাদার

অগ্নিবৃত্ত

মত্ত ছিলি মৃগবধে, মত্ত ছিল কাম
বারে বারে ডেকে যাস এমন উদ্দাম
বারে বারে সেই মতো ছুটে কি আসিনি
পা ছিল মধ্যরাতে, পা ছিল শ্মশানবাসিনী...

প্রতিটি স্বপ্নের শেষে ঘুমভাঙা আজন্ম আক্ষেপ
একই বৃত্তে ঘোরে ফেরে নির্মাণের মত্ত পদক্ষেপ
উদ্দালকের মতো বনে-কোণে ঘুরেছি উন্মন
ছায়াপথে-পথে চলে নিঃসাড় নির্বন্ধু ভ্রমণ...

অগ্নির ভিতরে ঢালি এই শ্রম বিনিময় সম্প্রতি
রং-ওঠা দেহধর্ম্ম দুঃখময় মৃত্যুভয় গতি
হে অগ্নি, তবে জ্বালো নষ্টযূথে পতঙ্গনশ্বর
হাত রাখি মধ্যরাতে, হাতে পোড়ে মহাকালেশ্বর।

একা ও ঈশ্বর

আমার ঈশ্বরকে আমি একা পাব বলে
গহনে ভাসাই চোখ কপোতাক্ষ জলে

নাগরিক ঘটে-পটে ঝড় অবিশ্রাম
মাঝরাতে তার ছিঁড়ে থেমে থাকে ট্রাম

জীবনকে ভাঙে-গড়ে সে কি আরেক জীবন
মৃত্তিকার মানসপুত্র তাই সমূহে লাঞ্ছন

দীর্ঘবাস আজো নুয়ে বেদনার ভরে
একটি পিদিম তবে রাখি তার ঘরে

ছিন্নমিলনের স্মৃতি লিপ্ত কুয়াশায়
শিশিরগুচ্ছ ধোবে তার জন্মদাগ পাতায় পাতায়

ছায়াশূন্য রুক্ষপথ গায়ে ধুলোবালি
যে ছিল আশ্রিত তাকে কোথায় হারালি

প্রাত্যহিক স্রোতে ঘষে রূপকথার চর
নদীতে মিলিয়ে দেয়, আকাশ অতঃপর

ছুটি নিয়ে মেতে থাকে তারাদের ভিড়ে
খড়-মৃত্তিকার এই ভীষণ তিমিরে

বাঁচি প্রভু, রাত্রিদিন বিবেক পেরিয়ে
ছন্নছাড়া ঘুমছাড়া শব্দমালা নিয়ে

আমার ঈশ্বরকে আমি একা একা ডাকি...
কেঁপে ওঠে সঞ্চিত লাঞ্ছন ভীষণ একাকী।

চরাচর

উপাসক কর্মকার

জেগে আছে শান্ত চরাচর

এ তুই কোন ঈশ্বরী
সেই ভোর থেকে সন্ধে
সন্ধে থেকে ভোর...
অপেক্ষা করে আছি

চুপ করে থাক মেয়ে

ভালো আছি

দীপা ঘোষ

আমরা ভালো আছি। জানি তোমরাও।
আশরীর সুখে ভরা জীবন ছড়ানো
মাঝে মাঝে শব্দ ভাসে
রঙিন সুতোর টান — জলে-ঝড়ে ফিকে হওয়া
আলগা বাঁধন। জোর কম।
তোমরা বোঝো, বুঝি আমরাও।
তবু অভিযোগ, মিথ্যে আস্ফালন
একই রক্তের ভুল বাহানায়
চলে সেই চাপান-উতোর ...
তারপর ফেরার রথ হাজির দরজায়
তাই —
মনে হয় এসে গেছে
সুতো গোটানোর সময়। কৃত্রিম দম্ভে
বাতাস এখনো ভারী।
তবু কেন,
মিথ্যে অনুযোগ, অনুতাপ এখনো,
আমরা তো সকলে
একে অন্যকে ছাড়াও বেশ ভালো আছি।

স্বপ্ন দ্বীপ

উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়

দীপকে ঘিরে নাচছে সাগর
সাগর ঘিরে ঢেউ
একলা দ্বীপে দাঁড়িয়ে আছি
চারপাশে নেই কেউ।

স্বপ্নদ্বীপের বাড়ছে বয়স
বয়স ঘিরে আশা

স্বপ্নে ফিরে আসবে আবার
জোয়ার ভালোবাসা।

এই বয়সে যেমন তেমন
অতীত ঘিরে বাঁচা
মরণ বাঁচন ঘিরে কেন
স্বপ্নদ্বীপের নাচা?

স্বপ্ন দেখে মজে ছিল
দ্বীপ ঘিরে দ্বীপমালা
পর্যটনে ঘিরে ছিল
স্নিগ্ধ দীপের ডালা।

দু-চোখ জুড়ে স্বপ্ন উধাও
হঠাৎ উদায় ত্রাস
কোন সুনামি কোথায় ছিল
করল সবই গ্রাস।

তাই তো একা দাঁড়িয়ে আছি
ধ্বংসদ্বীপের স্তূপ
পাখ-পাখালি মেঘমালা
নিথর ও নিশ্চুপ।

নতুন সম্পর্ক

ইন্দ্রাণী দত্ত পান্না

সে তুমি ভরাভরতি, বৃহৎ ও পথ-আগলানো
সে তুমি বিন্দুর মতো — ধীরে বিলীয়মান।
বাথরুমে গায়ে জল ঢালার ফাঁকে ফাঁকে
তোমার সঙ্গে একটা বিদায়ী সংলাপ সাজাই।
খুব বেশি কিছু দেওয়া নেওয়া হল না বলে
সম্ভাবনা ছিল না এমন তো নয়।

এপাশে ওপাশে নানারকম ভয় নিয়ে থাকা
তাদের বয়ে বেড়ানো নিরেট হাতদুটো

এখন কোনো কিছু আটকাতে পারে না।
বহুদিন অন্তরঙ্গতা নেই,
উৎসববাদ্যি নেই শরীরের গলিতে-সড়কে।
জিভ চেনে শুকনো স্বাদ আর চোখ জানে ন্যাড়া গাছ, খড়ি ওঠা মাঠ।
স্মৃতি বলতে কাঁধে মাথা-রাখা একটা নাবালিকা রাত
যা আসলে কল্পনায় খেয়ে-পিয়ে বেড়ে উঠেছে লকলক করে,
ঘুম কেড়েছে, চোখ থেকে হিঁচড়ে টেনে এনেছে জল।
মাঝে মাঝে একা ঘরে পাগল শীৎকার।

অথচ আর কিছুকাল পরে তোমার নাম মনে থাকবে না
শুধু একটা আবছা গন্ধ মাথার ভেতর ঘুরে ঘুরে আসবে
আর চলে যাবে।

অচেনা জলগভীরে

কল্যাণ দাশগুপ্ত

হাসতে হাসতে জল ছুঁয়েছে চুড়ি
চুড়ি তখন খুঁজছে মেঘের হাত
পায়নি মেয়ে বাঁচার সে খড়কুটো
মেঘে মেঘে তখন বজ্রপাত।

ও মেয়ে তুই নামলি কেন জলে?
ও মেয়ে তুই হারালি যৌবন!
ঘূর্ণিজলে পা ডোবানো ভুল
কুঞ্জবনে চলছে নিধুবন।

জলকে চিনে জলে নামতে হয়
বরং ভালো পিছন ফিরে হাঁটা
শ্যাওলা দিয়ে হয় না বোনা বাসা
জলের গভীর রক্ত ঝরায় কাঁটা।

পুরোপুরি ডুবে যাবার আগে
ডুব-সাঁতারেই পালিয়ে আয় ডাঙায়
জলকে পোড়াস আগুন-দৃষ্টি ছুঁড়ে
দেখব তখন কে তোকে চোখ রাঙায়।

ফিরিয়ে দাও

বিপ্লব ঘোষ

ভাবিনি কোনোদিন আমার সাম্রাজ্য হবে...
কিশোরবেলায় যার মাথার ছাউনি ছিল পলকা
ক্লাস সিক্সের আগে যে ভালো করে স্কুল দেখেনি
সে আজ বহু মানুষের আশ্রয়।
বাতানুকূল অফিস, কারখানা, নৈশপ্রহরী
সুন্দরী স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, খিলান-দেওয়া বাড়ি।

নিজের প্রয়োজনে অনেক ভুল কাব্য লিখেছি
যা মিশে গেছে ধুলোয়, তবু কবি বলে
জড়িয়ে ধরেছে আমার স্বদেশ।
হঠাৎ একদিন সব-পেয়েছির জীবনে শুনতে পেলাম
সামান্য হাওয়ায় হাজার দরোজা খোলার শব্দ।

তারপর একদিন ভীষণ ঝড় উঠল
হাহাকারে কাঁপল আকাশ-বাতাস, সসাগরা
বুকের পাঁজর ডুবল সাগরের জলে...
সেই থেকে চিৎকার করে বলি, ফিরিয়ে নাও
আমার সাম্রাজ্য, রাজা হতে আসিনি আমি,
কবিও না হয় নাই হলাম, শুধু মাথার উপরে
থাকুক আকাশ, শয্যা হোক সবুজ ঘাস

দাও ফিরিয়ে দাও আমার হারিয়ে যাওয়া পাঁজর।

অন্য দীপাবলী

গৌতম মুখোপাধ্যায়

ভাঙে পাড়,
হৃদয় অভিজ্ঞ হয়
নদী বাড়ে গাভীর গর্জনে।

রোদের সে-ই নীলাকাশ
দুস্তর একা-র মুহূর্তগুলি

মনে পড়ে,
ছোটো-পুকুরের ডোঙা নড়েচড়ে
জলকাদা মেঘে।
ওপাশে ভাসছে অলক্ষ্মী
বুনো লতা জ্বালায় প্রদীপ
হিম-সাগরের ফুঁয়ে বাজে শাঁখ,
শীতের চাদর ছুঁয়ে হঠাৎ হাওয়ায় পাতা
নেচে যায় শূন্যে কথাকলি

মালার্মে, এ আমার একান্ত দীপাবলী।

জানালা

সুরজিৎ বসু

দপ দপ জ্বলে ওঠে দু-একটি জানালা —
ভোর;
কোনোটি ফের নেভে
কোনোটি জ্বলে থাকে
অন্যমনস্ক;
কেউ ভোরের আলো
দ্যাখে
কেউ দ্যাখে না;
প্রতিটি ভোর —
কারো পুনর্জন্ম
কারোর বা
মৃত্যু-প্রার্থনা!

রিংটোন

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শীত ঝরে গেছে আম-বউলে।
ট্র্যাটোস্ফিয়ারের বারান্দা থেকে এস.এম.এস. করেছিলে
যতবার মনে পড়েছে তোমায়, সান্ত্বনার ঢঙে খুঁজেছি উপমা
রিংটোনে প্রিয় বাক্যবন্ধটি, 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী'
সেল্‌ফ থেকে পেড়ে এনে মেসেজটি রাখি স্রোতোমুখে দাঁড়ের মতন
ঋত, ঋদ্ধ — ওই অপূর্ব মুখশ্রী, আমার সাধের স্বপ্নকুম্ভ
চুঁয়ে আজও কোমল রতিসিম্ফনি, প্রেমজঘ্রাণ,
তৃণীর হাতড়ে গেঁথে নেব আবার অমল স্বপ্নবর্মগুলি...

ঠুকরে চলেছি যেন কাদাখোঁচা পাখির মতন সুখের প্রাচীন শিলালিপি
মেঘডানা থেকে খসে পড়ে না আর জলজ পালক, যদি জানো
কেন ঠোঁটের আগায় 'চোখ গেল', 'চোখ গেল' হাহাকার
যদি নিয়মবন্দী তবু নক্ষত্র, পাখি, গাছ — তাবৎ জীবন, জানিও
পুবের করুণমুখে নিত্য সূর্যাস্ত কেন লেখে তবু রঙিন প্রস্তাবনা!

স্নান

সুনন্দা মিত্র

যেন কোনো কথা ছিলো বাকি —
যেন বহুদূর বৃথা হেঁটে এসে, নিঃসঙ্গ, একাকী;
জলের অতল থেকে জেগে ওঠে স্বপ্নময় তীর —
যেন এক শব্দহীন দূরতম একক গভীর কোনো বহমান স্রোতে
জল ছুঁয়ে দেখে নেওয়া ভুলে যাওয়া মুখ;
যেন কস্তুরীর গন্ধ খুঁজে-ফেরা অস্থির উন্মুখ মন
তোমার দু-হাতে ধরা অঞ্জলিতে সমর্পণ করে স্পর্শ করা
কোনো মুহূর্ত অম্লান —
যেন স্তব্ধতার প্রান্তে শেষ কথা ফিরে পায়
আশ্চরীর স্নান —

অনুবাদ কবিতা

ফ্রান্স

স্পেন

মাক্স জাকব-এর কবিতা

অনুবাদ: **পলাশ ভদ্র**

মাক্স জাকব ১৮৭৬-এ ব্রিটানিতে এক ইহুদি পরিবারে জন্মান। পরবর্তীকালে তিনি ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হন। পিকাসো এবং আপলিন্যের-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এই কবি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাধর। 'কিউবিজম'কে কবিতায় প্রয়োগে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে দ্রাঁসির কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে গেস্টাপোদের হাতে বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ঈশ্বরের উপস্থিতি (Présence de Dieu)

এক রাতে যখন আমি প্রেম-আকাশ জরিপ করছিলাম
এক রাত মিষ্টি মায়ের
যেখানে তারারা ছিল ঘরে ফেরার আলোকসংকেত
আর বিচিত্রশোভিত যেন রামধনু
এক রাত যখন তারারা হাঁকে : 'আমি আবার ফিরব!'
তাদের করুণা বর্ষিত হয় আমার অস্থিরতায়
কারণ দুর্ভাগ্য আমার পা আর হাত খণ্ড খণ্ড করেছে
হে আত্মসমর্পণ, তুমিই মহিমা-সংকীর্তন করো।
এক রাত যখন তারারা আমার উড়ালে ধ্যানস্থ
আমি দেখলাম একটি নক্ষত্র আমার দিকে ধাবমান
আর সে আমাকে ধুইয়ে দিচ্ছে প্রলাপের আফিমে
সেই নক্ষত্র তার আয়ত চোখ দিয়ে আমাকে প্রতারণা করছে
তোমার সোহাগস্পর্শ আমার অবয়বকে করে বিশৃঙ্খলামুক্ত
ভালোবাসা অপেক্ষা করে না, তার অপেক্ষা সয় না।
এ-এক নক্ষত্র আর আমি এক উদ্ভিদ : আমরা একত্রে
তুমি আমার বৃদ্ধি ঘটাও এক বিস্তৃত চিত্রপটের মতো।
আর যখন আমি তারকা-পরিণতির সম্মুখীন,
আমি দেখলাম এই ছিল করুণাঘন ঈশ্বর,
বিশ্বজগতের স্রষ্টা, প্রভু, প্রতিভাবান-নম্র।
তারপর তিনি আমাকে শোষণ করলেন এক তরল পদার্থের মতো :
এ-এক গুপ্ত তথ্য আর বলার মতো কোনো শব্দ নেই,
যে আমার রক্তে ভাটার টান তাঁর ঈশ্বর
যেন এক নিঃসঙ্গ হৃদয়।

জাক ক্রিকিয়োঁ-এর কবিতা

অনুবাদ : তৃণাঞ্জন চক্রবর্তী

বেলজিয়ামের পুরোধা স্থানীয় কবি। জন্ম ব্রাসেলস-এ, ১৯৪০ সালে। অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম সারা জীবনের সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে Prix Charlier-Anciaux de l'Académie Royale de Langue et de Littérature Francaise de Belgique। কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় কুড়িটি। প্রথমটি (*La Défendue*) বের হয় ১৯৬৮ সালে। প্রকাশক Andrē de Rache। কবিতা ছাড়াও লেখেন নিবন্ধ, গল্প, নাটক, উপন্যাস — প্রধানত থ্রিলার। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো সাহিত্য ও দর্শন নিয়ে। সাহিত্যের ইতিহাস পড়ান ব্রাসেলস-এর নামজাদা প্রতিষ্ঠান Conservatoire Royal de Bruxelles-এ। একজন সর্বগ্রাসী পাঠক।

স্মৃতিদানি বই

স্মৃতিদানি বই
ফাঁকা পকেট. বই
পরদা, তালা, দেয়ালের ফুটো
বজ্রনিরোধক, সিঁদ কাটার যন্তর, টিন-কাটার সহ কৌটো
ছিপি-খোলা ছিপি-আটকানোর যন্তর। মহাঝাড়ন। শোধন করে ও জীবাণু হাটায়। বই।
অতি টেকসই পাতলা খুশকি।
কানকোটারী কানের পোকা, মগজ-ফোঁড়া যন্তর, প্রজাপতি। বই।
তালগাছ, মেয়েছেলে, শ্যাম্পেন ও রক্তসমেত বই।
নোংরা রাস্তা, কালো রাত্রি, মেয়েছেলে, বিয়ার ও রক্তসমেত বই।
রকেট, নক্ষত্র, মেয়েছেলে, বড়ি ও রক্তসমেত বই।
বই কবর, আর জিনিস, জঘন্য সব জিনিস আর মেয়েছেলে, প্রণয়োপচার ও রক্ত।
বই রমণীয় উদ্যানে যথার্থ কুমারী, বজ্জাত লোক ও মোটামোটা জানোয়ার সমেত
বই একের উপর আরেক চাপানো তুরঙ্গী তরুণী, শাদা প্রচ্ছদ ও ছবি-আঁকা জ্যাকেট
বিদ্যাবাগীশের মুখবন্ধ
বই অনাথিনী, ভগ্নজানু নারী, অযোগ্যা মা, অনুপযুক্ত বাবা
দুঃখী দাদু, লালু ছোকরা ও বজ্জাত মেয়েবাজ
পরিশেষে কমেডি গ্যারান্টি।
বই এক বিষয়বস্তু কিন্তু শেষটা ট্র্যাজিক। উপহের আদলে উপসংহার।

বই মশার গুহ্যদার গেঁথে জটিল ফর্মুলা। সবার হাতে না পড়াই ভালো।
একলা লোকের জন্য, ফুঁ দিয়ে ফোলানো যায় এমন হিরোইনের ছাঁদে বই
ব্যবহারপ্রণালী ও আনুষঙ্গিক উপকরণ সহ।
পড়তে যদি লজ্জা পান বই আত্মহননের কৌশল সমেত।
নিরুদ্ধ যারা তাদের জন্য বই এক স্বয়ংক্রিয় বিধ্বংসী ব্যবস্থা।
প্রতিটি বস্তু যাদের নাম এখানে বলা হল তাদের প্রকারভেদগুলো
সমস্ত প্রত্যয়িত লিঙ্গের জন্য
ও এরকম আরো কয়েকটা।
ক্যাটালগ চেয়ে নিন, এর নাভির দাগটি আপনাকে টানবে।
বই মগজহরা
বই জঞ্জাল হাটায়
বই ফাঁকা আয়না
বই খোলা দরজা, বনপথ, সমুদ্রের উপর প্রথম পদপাত
বই জীবন
বাসা থেকে উৎখাত, স্ট্যান্ডের উপর দুই প্রণয়িণী
ঝি-এর মাঝখানটিতে ধূসর চটি বই আগুনে ঠাসা। অন্তরের
দূরবর্তী ঢেউ সব! ধিকধিক করছে নরকুণ্ড, আমোদিত মরুভূমি।

দৈববাণী মন্ত্রজপ

এবং ডিঙিটি দূরে সরে যাচ্ছে।
কোথায় তোমরা নভোচর বিধাতাসকল?
ক্লোরোফর্মের কোন কোষের মধ্যে?
কোন কাগজের নরকে?
শব্দব্রহ্মের মালিকদের জন্য কোনো
সরাইখানা নেই এখানে।
পদ্যে পাগল হওয়া লোকেদের জন্য কোনো
উন্মাদাগার নেই।
বালি থেকে পাথর জন্ম নিচ্ছে,
সে এক তুরীয় আনন্দ।

কবিতা আমাদের মধ্যে যেন দাদুর ফোটো,
যেন চাঁদের ওপর বৃক্ষ।

গল্প শেষ। আর ছোটাছুটি নেই। শুধু অপেক্ষা।
আর যদি খুনোখুনি হয় তো সে ভুলবশত।

গল্প নিবে গেছে। আর কোনো বিপজ্জনক পাথর
নেই, শাদা মসৃণ তটভূমি নেই। আছে বরফের
নীচে ঘুমিয়ে থাকা, চোখ ডুবানো মন্ত্রজপের
মধ্যে।

একটা অগ্রপশ্চাৎহীন গল্প, মিথ্যে স্মৃতির
যাদুঘরে। ঠেলে সরিয়ে দেওয়া। পাত্তা না দেওয়া।
অকূলে ভেসে যাওয়া বিস্মৃতির সমুদ্রে। এসব
কিছুকে বিশ্বাস না করেই।

সে ছিল প্রথম বালুকণাটির গল্প। অন্য বালুকণাদের
প্রথম বালুকণাটির বিষয়ে কিছু জানা নেই।

মৃত আগ্নেয়গিরি। ঘুমের নিত্যযাত্রী। আমরা কী
হতে চলেছি? উলটোনো নেনুফার? ভবঘুরে
টালি? নাকি বিষ? চূড়ান্ত সঙ্গীত নিজস্ব।
বিষ। অহংকারী মাতলামি। পবিত্র এক
সপ্তাহ-শেষের কাজ কাঠের ক্রুশগুলোর
মধ্যে। দূরবর্তী ঝড়, তার মরীচিকার ঠোঁটে
বুকের দুধ-ধরানো মা। ছিঁড়ে যাওয়ার পর
গোপন আহ্বান, বৃষ্টির যাত্রীর। গ্রাম
নিভে আসছে। কবিতাও। হারানো বাগানে,
ঈশ্বর চরাচ্ছেন কুকুর।

বারবারির পাড়াগাঁ

প্রেম আমার পাথরগুলোর মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া এক সোঁতা, সে বাগানটা
এক পাক খেয়ে নেয়, মিলে এক হয়, আবার আরেকপাক বাগান ঘিরে,
সে ডুব মারে বৃক্ষের নক্ষত্রলোকে।
গোপন উদ্যান।
বারবারির সাত লক্ষ দিন।
নুড়ি পাথরের তলায় বালি, নদী, জলস্রোত, বিশাল লেগুন যেখানে
ভেসে বেড়াচ্ছে ভগিনী ঈশ্বরী, প্রকাণ্ড কালো জলের আকাশ যেখানে
বিড়বিড় করছে অগ্নিময় ত্রয়োদশভূজা ঈশ্বরী ভগিনী।
প্রেম আমার কুয়াশা-ঘেরা পাতার নিঃশ্বাস।
প্রেম আমার দেয়ালের পেছনে এক ফোয়ারা

প্রেম আমার এক খুকি, ইস্কুলের পথে
বৃষ্টির ধূসর বনের মধ্যে, আমার ছেঁড়াখোঁড়া স্মৃতির মধ্যে।
প্রেম আমার আকাশে ওঠা এক বৃক্ষ।
প্রেম আমার চলমান এক পর্বত পৃথিবী জুড়ে।
প্রেম আমার চাবির শব্দ তালার ভিতরে, একাকিত্বের তালা।
প্রেম আমার, দীর্ঘ রাস্তার শেষে
একমাত্র জলধারা যে আমাকে হত্যা করল না
ঝুলন্ত উদ্যান।
বারবারির সাত লক্ষ রাত্রি।
প্রেম আমার ভোরের বিছানা।
নিয়ত নীরব শব্দের বৃষ্টি, প্রেম আমার
যুদ্ধংদেহি চোখের
উৎসবে মাতা পা-এর
নগ্ন ঠোঁট
যেখানে শোনা যায় মহাজগতের ঊর্ধ্ব-বিসারণ
প্রেম আমার
পাথরের নদী, যেখানে গড়াচ্ছে আমার পাথরের হৃদয়।
রহস্য কী একদিন বলবে নিজেকে?
উন্মাদ আঁখিপল্লবের প্রেম।
শৈশবের উদ্যান যেখানে আমি চিৎকার করছি
জরুরিভিত্তিক সমগ্র নীরবতা।
আসুক না ঊষাকাল সহ
বারবারির সাত লক্ষ জীবন।

পাবলো নেরুদা-র কবিতা

অনুবাদ : **সৌগত চট্টোপাধ্যায়**

প্রতিদিন তুমি খেলা করো (Every day you play)

প্রতিদিন তুমি ধরিত্রীর আলো নিয়ে খেলা করো
হে নিরূপ অতিথি তুমি ফুটে ওঠো ফুলে ও প্লাবনে
এই ধবধবে শাদা চুলগুলিরও অধিক — সে তুমি
যাকে সর্বদা আমি জাপটে ধরে থাকি একগুচ্ছ ফুলের মতো।

তুমি কারোর মতোই নও কেননা আমি তোমাকে ভালোবাসি
এসো তোমাকে আমি ছড়িয়ে দিই হলুদফুলের মালায়
দক্ষিণের তারায় তারায় অঙ্কিত তোমার নাম ধোঁয়াটে অক্ষরে
আমাকে মনে রাখতে দাও প্রিয়তমা ঠিক যেরকম ছিল তোমার অস্তিত্ব
এই জীবনের বহু বছর আগে।

হঠাৎ হাওয়ার ঝাপটা আমার বন্ধ জানলার ওপর এসে লাগে
আকাশ যেন বাড়ন্ত জালের ওপর মাছ
এখানে সব ঝোড়ো হাওয়াই ফুরিয়ে যায়
বৃষ্টি খুলে ফেলে তার সব আচ্ছাদন।

পাখিগুলো কোথায় উড়ে গেছে পালিয়ে গেছে
এখানে শুধু হাওয়া আর হাওয়া
হাওয়া একাই রোধ করে জনশ্রুতি মানুষের
ঝড় এসে ঝরাপাতা উড়িয়ে নিয়ে যায়
আর সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয় সেই নৌকাগুলো যেগুলো কাল রাতে
আকাশে নোঙর ফেলেছিল।

তুমি এসেছ একদা পালিয়ে যেয়ো না
তুমি আমার সব চিঠির উত্তর দিয়ো
আমাকে জড়িয়ে ধরো তুমি যেন ভয় পেয়েছ
যদিও একটি কাল্পো ছায়া তোমার চোখের ওপর আজো ম্লান।

ছোট্ট মেয়ে তুমি আমার জন্য আনবে হানি সাকেল
তোমার স্তনে মধুময় ঘ্রাণ

বিপন্ন হাওয়া যেমন প্রজাপতির মৃত্যু ডেকে আনে
আমি তোমাকে সেরকমই ভালোবেসেছি
আমার সুখ কামড়ে ধরে তোমার ঠোঁট

তুমি কত কষ্ট পেয়েছ আমার জন্য
আমার হিংস্র একাকী আত্মার জন্য
এই আমি যার নাম শুনলে সবাই পালায়
তুমি কতবার দেখিয়েছ আমাকে ভোরের তারার প্রজ্বলন
চুম্বন করছে আমাদের দৃষ্টি ও নয়ন
আমাদের মাথার ওপর ধূসর আলো পাখার হাওয়া।

আমার কথাগুলো যেন তোমার দেহের ওপর বৃষ্টি
বহুযুগ ধরে ভালোবেসেছি তোমার সূর্যস্নাত চুনি পান্নার দেহ
আমি বিশ্বাস করি এই ধরিত্রীর তুমি রূপবতী অধিনায়িকা
আমি তোমার জন্যই ফুল তুলে আনব পাহাড় থেকে
আর আনব ব্লু বেল হেজেল আর বাস্কেটভরতি গ্রাম্য চুম্বন
আমি তোমার সঙ্গে খেলতে চাই যেমন বসন্ত খেলা করে
চেরিগাছের সঙ্গে।

হোসে মার্তি-র কবিতা

মূল স্প্যানিশ থেকে বাংলা রূপান্তর: **গৌতমকুমার দে**

মূল কবিতার নাম বাংলা ভাষান্তরে, 'সোজা-সাপ্‌টা সচেতন এক মানুষ আমি।' কবিতাটি কিউবার জাতীয় কবি হোসে মার্তি-র Versos Sencillos (Simple verses নামে যা বহুল পরিচিত) বইয়ে ছাপা হয়। পরবর্তীকালে পিট সীগার গীত বিখ্যাত 'গুয়ানতানামেরা' গানটিতে এই কবিতার একটি স্তবক গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অনুবাদটি স্প্যানিশ বাক্যরীতির ধরন অনুযায়ী করা। ফলত অনেক জায়গায় 'অসমাপিকা ক্রিয়া'য় বাক্য সম্পন্ন হয়েছে কিংবা 'কর্তা' ছাড়াও কোনো কোনো বাক্য শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে 'প্রাসঙ্গিক কর্তা' এবং 'অসমাপিকা ক্রিয়া'য় সম্পূর্ণ বাক্যগুলির মূল ভাব বুঝতে গেলে সম্পূর্ণ কবিতাটিই পাঠ করা প্রয়োজন।

সোজা-সাপ্‌টা সচেতন এক মানুষ আমি
(Soy un hombre sincero)

সোজা-সাপ্‌টা সচেতন এক মানুষ আমি
যেখানে জন্মায় তালগাছটি
মৃত্যুর আগে আমি চাই
মুক্তি পাক আমার অন্তরের সব কথা।

সমস্ত দিক থেকে আসি আমি
যাই আমি চার-দিকে
শিল্পকলার মাঝে শিল্প আমি
নিবাস গিরি-পর্বতে।

আমি জানি আশ্চর্য সব নাম
ঘাস আর ফুলেদের
বজ্জাতি বঞ্চনার আর
নিভৃত মনের গোপন যন্ত্রণার।

আঁধার রাতে দেখেছি আমি
মাথার ওপর ঝরে পড়া
সুনির্মল আকাশের উজ্জ্বল আলো
অপার স্বর্গীয় সুষমাতে।

দেখেছি আমি, কীভাবে পাখনা
খুলে যায় রূপসীদের

নোংরা জঞ্জাল থেকে
কীভাবে উড়ে যায় প্রজাপতি।

দেখেছি ছটফটে এক মানুষ
যার পাঁজর বিদীর্ণ ছুরিতে
তবুও বলেনি সে, মেয়েটির নাম
যে নিয়েছে তার প্রাণ।

বিদ্যুৎচমকের মতো
দু-বার দেখেছি আত্মাকে
একবার যখন সে দুর্ভাগা বৃদ্ধ মারা গেল
অন্যবার যখন সেই মেয়েটি বিদায় নিল।

আঙুরখেতে ঢুকতে গিয়ে
কেঁপে উঠি আমি,
যখন সেই নচ্ছার মৌমাছিটা
হুল ফোটায় আমারই কচি মেয়েটাকে।

আমি বুঝতে পারি একবারই
সৌভাগ্য কাকে বলে
যখন চোখ-ছলছল মেয়র পড়ে
শোনান, আমার মৃত্যু পরোয়ানা।

জল ও মাটি থেকে উদ্‌গত
দীর্ঘশ্বাস শুনি আমি,
ঠিক যেন দীর্ঘশ্বাস নয়
এ আমার সন্তানের জেগে ওঠা।

আমায় যদি বেছে নিতে বলো
রত্নভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠতমটিকে
বেছে নেব আমার দরদী সুহৃদ
সরিয়ে রাখব আমার ভালোবাসাকে।

দেখেছি আমি নীলাকাশের বুকে
এক আহত বাজের উড়ে যাওয়া
এদিকে নিজের গর্তে পচে মরে
বিষধর সাপটা।

আমি জানি, যখন পৃথিবী
মাথা এলায় সুগভীর ক্লান্তিতে
তির তির, তখনো বয় ক্ষীণ জলধারা
সুগভীর নিস্তব্ধতা ভেঙে।

বাড়িয়ে দিয়েছি নির্ভীক হাত
ভয়-ভীতি আর আনন্দের আতিশয্যে
নিষ্প্রাণ যে তারাটি আমার দরোজায়
পড়েছে খসে, তার দিকে।

লুকিয়ে রাখি বুকের মধ্যে
যে-দুঃখ আমায় তিলে তিলে নিঃশেষ করে যায়
না-স্বাধীন এক জাতির সন্তান
তাই বেঁচে থেকেও নীরবে ঝরে যায়।

সবই সুন্দর ও চিরস্থায়ী
অর্থপূর্ণ এবং সঙ্গীতময়
এই সবকিছুই আলোর অভাবে
হীরের মতোই অঙ্গার রয়ে যায়।

আমি জানি, বোকারাই শুধু
অশ্রুজলে তলিয়ে যায়
কাঙ্ক্ষিত বস্তু মেলে না দুনিয়ায়
যা পাওয়া যায় কবর খুঁড়ে।

এই চুপ করলাম আমি
থামালাম চারণ কবির বকবকানি
টাঙিয়ে দিচ্ছি মৃত গাছ থেকে
আমার বিদ্যের ঝোলাখানি।

কবিতাগুচ্ছ

গ্রীষ্মকালে লেখা বর্ষা

পিনাকী ঠাকুর

বুকপোস্টেই হৃদয় পাঠাও, দারুণ ব্যস্ত
এখন থেকে তিন মাস
বসন্তে প্রেম চাকরি পেল, গ্রীষ্ম এসে
মাথার উপর গর্জায়
পিচের রাস্তা গলিয়ে দেবার চাকরি পাবে
আবার একটা বৈশাখ
তারপরে ভোট, ভোটের পরে কেন্দ্র থেকে রাজ্য ভরা মেঘ চায়

বর্ষা মানে লাইফটা হেল্, শহরতলির
ড্রেন-উপচানো রাস্তার
ফুলপাঞ্জাব লরির সঙ্গে বাস মিনিবাস
ট্যাক্সি অটোরিকশা
দিনমজুরের পয়সা কাটা, অফিসবাবুর
সাতটা সি.এল. নষ্ট
পেটের অসুখ, বাজার বন্ধ, ভগ্ন ছাদের নতুন করে দুর্দিন

এখন তোমার হৃদয় পাঠাও, হ্যাঁ ডাকযোগেই
অন্ধকারের সঙ্গে
সবুজ তোমার সবুজ চুল আর সবুজ কপাল
সবুজ ঠোঁটে মুখ ডুবিয়ে
আসবে আমার নিষিদ্ধ নীল পাগলা দুপুর আবার নতুন বর্ষায়...

ককেশিয়ান চক সার্কল্

শিবাশিস মুখোপাধ্যায়

আকাশ থেকে চাঁদ কেড়ে নিয়ে একটা অমাবস্যা ঘটালে তুমি
আর আমি ছিটকে পড়লাম আরো
অন্ধকারে।
অন্ধকার অন্ধকার অন্ধকার
ঠা-ঠা রোদ্দুরে ঘোরা কাঠ-বেকারের মতো অন্ধকার

হপ্তা-লেবারের সামনে ঠং লক আউটের মতো অন্ধকার
ফুটো পকেটের সামনে বাইজিপাড়ার ঝমাঝমের মতো —
অন্ধকার।
শুটকি, মরা, শুকনো জীবন এখন আমার।

ওগো আমার আলোকমালা আলো,
আমার শুকিয়ে আসা গলার দু-ঢোঁক পানি,
আমার হিরে মোতি,
পায়ে ধরি তোমার, শক্ত মুঠোর ফাঁস খুলে
চাঁদ বেচারিকে আবার আকাশে ছেড়ে দাও।
নিজের মতো খেলে বেড়াক।

কথা দিচ্ছি, আর কখনো আমি ওর জোছনা দেখে
হামলে পড়তে যাব না।

হে নূতন

মন্দাক্রান্তা সেন

১

কত নতুন নতুন কবি তৈরি হচ্ছে রোজ। কত
নতুন নতুন ছেলে আর তাদের পুরোনো পুরোনো
রং-চটা জিন্‌স। কত নতুন নতুন মেয়ে আর
তাদের জিন্‌সে নতুন নতুন এমব্রয়ডারি।

জিন্‌স নামটা এসেছে জেনোয়া শহর থেকে,
যে নাকি কবিতার মতোই সুন্দর। ইতালি
দেশটাই হয়তো তাই। আর তার মানুষেরা,
প্রত্যেকে একেকজন আল পাচিনো অথবা
দেল পিয়েরো — কবিতার কাছাকাছি
না থেকেও যারা নিজেরাই কবিতা।

একদিন যাবই ইতালিতে, ভেনিসের
জলপথে আলাপ জমাব গন্ডোলার
ছিপছিপে অল্পবয়সী মাঝির সঙ্গে, যে
হয়তো এ-পৃথিবীর তরুণতম কবি...

২

নতুন নতুন ছেলেমেয়ে আর তাদের নতুন
নতুন চোখমুখ। আমারও একদিন ওইরকম
বয়েস হয়েছিল এইসব মেলার মাঠে, ঘোড়-
দৌড়ের মাঠে। এইসব এমনি এমনি পাশাপাশি
শুয়ে থাকার মাঠে।

ঘাসের সমুদ্রে যেভাবে মিলিয়ে যায় ছোটো ছোটো
রংদার পোকা আর তাদের শিরা উপশিরাময়
পাতলা ডানা, সেভাবেই, একতিরিশ বছরব্যাপী
এগারো হাজার দিনের সমুদ্রে মিলিয়ে যাচ্ছে
এইসব আশ্চর্য মুহূর্ত — নতুন নতুন ছেলেমেয়েদের
সঙ্গে আলাপ হওয়ার...

৩

ওদের সঙ্গে যত কথা বলি, বুঝতে পারি
বয়েস বাড়াটা একটা মজার খেলা।
ওরা যে ভাষায় কথা বলে তা বুঝতে চেষ্টা
করি, ধরতে চেষ্টা করি ওদের চোখের নীলাভ
ঝিলিক

ছন্দা বলে যে মেয়েটি এখনো কোনো কবিতা
লেখেনি, তার থুতনির টোল থেকে আমি
অরুণাভকে কুড়িয়ে নিতে দেখলাম ওর
চতুর্থ কবিতা।

দেখলাম, দেখতে পেলাম, দেখার বয়েস
হয়েছে বলেই না!

৪

ওরা কাছাকাছি আসে, কাছাকাছি ঘিরে গোল
হয়ে দাঁড়ায়, চুপ করে থাকে, কথা বলে।

ওদের ঘামের গন্ধে ওদের শ্বাসের গন্ধে ওদের
চুলের গন্ধে ওদের জামার গন্ধে আশ্চর্য মহিমা
যা ধীরে ধীরে নুইয়ে আনে আমার বয়েস

বুড়ি ঠাকুমা যেমন, ন্যাংটো নাতিটাকে রোদে
শুইয়ে তেল মাখাতে মাখাতে বুঁদ হয়ে ওঠে

সংসারের গন্ধে, আমিও তেমন, ওদের চোখে
দেখতে পাই ওদের না লেখা কবিতা

৫
যারা যারা বলেছিল দিদি তোমাকে চিঠি দেবো,
তাদের মুখ মনে রাখিনি।

যারা যারা বলেছিল দিদি তোমার কবিতা
ভালো লাগে, তাদেরও মুখ মনে রাখিনি।

যারা যারা বলেছিল দিদি তোমার লেখা
কিচ্ছু হচ্ছে না, এমনকী তাদের মুখও নয়।

মনে রেখেছি স্বর
মনে রেখেছি স্বর
মনে রেখেছি স্বর
আগামী দিনে বাংলা কবিতার

দুটি কবিতা

রূপক চক্রবর্তী

বরকত-সালাম : ২১ শে ফেব্রুয়ারি

আমার পোষা পাখির বয়স হাজার বছর,
কাবলিছোলা, ডাল ভেজানো সঙ্গে ছোটো পোকামাকড়
এ-সব খেয়েই মস্ত বাঁচা, একলা হলেই — হরেকৃষ্ণ।
আমি কিন্তু বয়স্ক নই
পাখি আমায় দিয়েছিলেন থুরথুরে এক বৃদ্ধ কবি,
বলেছিলেন লেখেন তিনি দু-চার রকম চর্যাগীতি
হঠাৎ আমায় পেয়ে গিয়ে
এখন কেমন হচ্ছে লেখা, তারই কিছু নমুনা চান
তারপরেতেই খাঁচাশুদ্ধু হাজার বছর বয়স পাখির
ঝুলিয়ে দিলেন আংটা দিয়ে
যেখান থেকে বেড়ালের হাত, হায়না থাবা
বহুত দূরে

কবি নারায়ণ, সে বিনা পূজা নাই

সাংবাদিক-এর 'ক' যেখানে শেষ, কবির তখন শুরু
তবুও দেখি সাংবাদিকের গেরামভারি ভাব,
খানিক যেন রাজ্যটাজ্য আছে।
এবং বোঝে ফন্দিফিকির কোন ধানে চাল কত,
কবি কিন্তু হাবলাগোবলা আহাম্মকের ছানা
শাক দিয়ে মাছ ঢেকেই দেখে মাছ নিয়েছে বেড়াল
বোঝার ওপর শাকের আঁটি ছন্দ আছে।
তা হোক গিয়ে — যা হোক গিয়ে,
যতই কাঁচা যতই কেঁচো হোক না কবির এলেম
শেষ কথাটা ভালো করেই সাংবাদিকও বোঝেন
যখন গিয়ে লেখালেখির 'ক'তেই তাদের শেষ
কবির তখন শুরু

মনোরমার মায়েরা

সেবন্তী ঘোষ

আমিও চিনেছি যেন
আমি সেই লোক
বলি যুদ্ধ নাই চাই
তবু যুদ্ধ হোক।

আমি দয়া, রামনাম
অহিংসার দূত
আমার সেনারা 'বাছা'
বড়োই নিঁখুত।

আমি ত্যাগ, স্বস্ত্যয়ন
প্রেমের কানাই
সিয়াচেনে বারবার
সেনানী বাড়াই।

আমি ধর্ম, ইষ্টকাম,
দুষ্ট মনোরমা

তোমাকে বধিবে যারা
তাকে দিও চুমা।

পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমে
কুঞ্জে অলি ওড়ে
সন্দেহভাজন নারী
কে পরোয়া করে?

দুটি সিসা যোনিদ্বার
দুটি গুলি স্তন
ওষ্ঠাধরে প্রিয়ভাবে
বুলেট চুম্বন!

এ দুখ কহানি ভরা
তবু হারে কই?
মনোরমা মা আমার
একা নেই তুই।

আমরা মায়েরা আছি
এবারে নিপুণ
বারে বারে ধান খাবে
তুমি অর্জুন?

মায়ের চোখের তাপে
পুড়েছিল কানু
এ মহা-ভারতে সেনা
পুনঃ নতজানু।

তুমিও চিত্রাঙ্গদা
ছিঁড়িয়াছ আজ
রথের রশির গায়ে
গলিত সমাজ।

দীপ্র মাকুর তলে
জ্বলে নেভে তাঁত
রাষ্ট্র যতই দিক
মৃত্যু বরাত।

নিশিপ্রলাপ

অভীক মজুমদার

কয়েকটি ঘুমের কিংবা কয়েকটি যক্ষের সঙ্গে রাত জেগে আছি
স্মৃতি, সে তো পূর্বপুরুষের গোপন লঙ্গরখানা
প্রকাশ্যে সহজে বসে পাশাপাশি মাতাল, পাগল আর ছদ্মবেশী রাজা
সকলি খুঁচিয়ে তুলি, হু হু করে পুড়ে যায় তেলরঙে আঁকা ছেলেবেলা
হু হু করে পুড়ে যায় পতাকার পেশি, বুক, পিঠ

এইবার স্বপ্ন লেখো, চাঁদু
এবার দুঃস্বপ্ন লেখো, স্বাদু

১
আমাদের বাড়ির নম্বর রোজ বদলে যেত বৃষ্টি হলে, ঝড়ে
ভারতবর্ষের মতো মন্ত্রীসভা সে-তল্লাটে কখনো ছিল না
টিউবওয়েল ছিল একাধিক, ছাদের ওপরে
হ্যান্ডেল টিপলে খুব আধঘন্টাটাক পরে রক্ত গড়িয়ে পড়ত, লোনা...

২
নিষ্ঠুর বেড়াতে এলে, সুটকেসে তোরঙ্গে অতি সযতনে রাখা
গুলির বিকট হাসি, গ্রেনেডে উড়িয়ে দেয়া হাত
রাত্রে খুটখাট, আলো, শার্সি বেয়ে লাল কালচে-লাল
অসহ্য অসহ্য হত্যা, বাথরুমের আরশি জুড়ে খুনে

ছোটোকাকা ঘুমে ঘুমে কী ধর্ষণ দেখে ফেলে নিজের মেয়ের
মা হঠাৎ চিৎকার জুড়ে দেয়, থালায় ভাতের পাশে লাশ
আমার ডায়েরি জুড়ে লক-আপে বন্দীর কাতরানো
পিসিমার দেওরের অঙ্কখাতা খুলতেই পিছমোড়া মুণ্ডহীন ধড়

নিষ্ঠুর, বেড়াতে এলে, বলে গেলে জন্মসাল : হ্যাঁ ফর্টিসেভেন
বলে গেলে পরপর সংসার পাতার গল্প, খাদ্য আন্দোলন
সেভেন্টিওয়ান আর বড়ো চাকরি, গাড়ি-বাড়ি, চলে যেতে যেতে
ইত্যাদি প্রভৃতি করে বেরোবার মুখে হল আমেদাবাদের কথা,
এখন শেয়ারে কত, জনজাতি নিশ্চিহ্নকরণ...

৩
পশুপালনের যত্ন দেখিয়েছ দাম্পত্যজীবনে
অতঃপর মৃত্যু এসে আমার পাঁজরে তার জবাগাছ পুঁতেছে নির্মম

অতঃপর তোমার স্বামীর কোনো বৈতনিক পরিণাম ছিল কি ছিল না
এই প্রশ্নে সারারাত সারারাত কেঁপেছে সন্দেহ

৪

তুমি হেরে গেছ। হারতে হারতে উঠে এসেছিলে রাতে
পেটে খিদে ছিল, নিজেরই মুণ্ড খেয়েছিলে শেষপাতে

ভেবেছ মুণ্ড তরুণ কবির, অথবা সে-মেয়েটির
যে স্টিমার চলে যাবার পরেও উগ্র, অন্ধ জেটি
ছাড়তে অযথা দেরি করেছিল — তারপর যা যা হয়
গলায় কষ্ট শরীরে পেরেক বীভৎস এক ভয়...

অথবা ভেবেছ শত্রুর মুখ, চোখ, নাক, গলা, কান
চেটে চেটে ক্রমে উদ্‌গার তোলো, পাশে খোলা *বলাকা*
দেওদার বন শিউরে উঠেছে কেননা নিজেরই ঘিলু
কেন ও খাচ্ছে, প্রতিভা পুড়ছে, দৌড়ে জড়াই, আঃ
পুড়তে পুড়তে চিৎকার করি, বুক চাপড়াই, আর
করজোড়ে বলি, ব্রহ্মঋষিরা তামাশা দেখো না, রোখো
দোহাই বোলো না, নিজেরই মুণ্ড গিলছে যখন, গিলুক!

৫

পথে পথে ঘুরে আজব জ্যোৎস্না দেখি
দেখি নারী সেজে পাশে এসে বসা সমকামী গণিকার
ঠোঁটের কোনায় রক্ত রয়েছে
টর্চ জ্বেলে দেখি মেঘে
বিদ্যুৎ আজো ক্রুদ্ধ বাক্যে জেগে

পোড়া গালে কষে মলম লাগায় স্ত্রীলোক
নরমাংসের কিত্‌না রুপেয়া কিলো?

৬

তোমার দু-চোখ জুড়ে উন্মাদ প্রণয়
দেখে বুঝি বিস্ফোরণ ঘটাবার এই তো সময়!

দুটি কবিতা

সুনীল আচার্য

আমার মধ্যে

আমার মধ্যে দিগন্ত বরাবর নীল রাত্রি, নীল মরুভূমি
আলো তবু জ্বলে ওঠে পরিণামহীনভাবে ভিজে ওঠা
পাতাটির হাড়ে ও শিরায়!

আমার গোড়ালি ছুঁয়ে সমাপ্তিচিহ্নের মতো নেমে
যায় কার আঙুল?

আমার নীরবতা বারবার ভুল শব্দে ভুল হয়ে যায়!

যে সব রাস্তায়

যে সব রাস্তায় আমি কখনো হাঁটিনি
যে গভীর সেতুটি অপরিচয়ের তৃষ্ণা নিয়ে
ভেঙে গেছে —

যে দ্রবণে গলে গলে গেছে আমার
স্বপ্নের মাটি —
সেই কাহিনী —
আমার কাছে বার্তা পাঠায় জারুল পাতায়

দুটি কবিতা

চিরঞ্জীব বসু

অন্ধকার

নষ্ট গর্ভ, নর্দমায় ভেসে যায় সদ্যমৃত ভ্রূণ
সম্পর্ক গোপন থাকে, বাতিহীন পথ
তবু রাত জাগে কেউ, বাদুড়ের চোখের মতন
অসম্ভব খুঁজে চলে সম্ভাব্য শপথ...

প্রেম

যতটা এসেছ কাছে ততদূর দূরে চলে যাও
যে-প্রেমিক গোপনীয় তাকে তুমি নিহত বানাও —

তার চোখ উপড়ে নিয়ে গরম অ্যাসিড ঢালো তাতে
এভাবেই প্রেম দাও, দৃষ্টিহীন মৃতদেহ বানাতে বানাতে

সুড়ঙ্গ গভীরে বাস করো, নিরাপদ, তবু তার কাছে যাই
মদের গেলাসে ভেজে রাত আর নথিপত্র গোপনে বানাই

সে-সৃষ্টি সরল খুব, সে-সৃষ্টি বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে যায়
তবু বিসর্জন শেষে পটুয়ারা পরবর্তী প্রতিমা বানায়...

দুটি কবিতা

শ্রীজাত

সোনার কেল্লা

কথার ভেতর শর্ত
লুকিয়ে ছিল দিব্যি
হেরেছিলাম যুদ্ধে
নকল সোনার কেল্লা

আজ এতদিন পর সেই
ভাঙা কাচের বৃষ্টি
চুল ঝাঁকানোর ছন্দে
ফালতু স্মৃতির জেল্লা

সন্ধেবেলার আড্ডায়
যে যার মতো মশগুল...
লেখার ছলে আজ সব
আঙুল কেটে ফেললাম

না হয় তোকেই ডাকব,
তুই তো জানিস একদিন
হেরেছি কোন যুদ্ধে
নকল সোনার কেল্লা...

এভাবে তোমার সঙ্গে

এভাবে তোমার সঙ্গে দানসামগ্রীর মতো ভেসে উঠতে পেরে
হয়তো গর্বিত আমি, কিন্তু এই উপায়ের প্রচারও তো বেশি
লোকে এসে ভিড় করে শ্যাওলা আর মুখোশের দেয়াল সরিয়ে
আলোদের মতো চোখ কণা-কণা ছড়ায় ঘরের চারপাশে
তখন তুমি তো গেছ মুখ ধুতে, যাবতীয় ক্লান্তি ধুয়ে নিতে
ওদিকে আমার ঠোঁট ফেটে পড়ে জলের অশেষ বিস্ফোরণে
যা-কিছু তোরঙ্গকথা, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে অকারণ ভাগ হয়ে যায়
আরেকবার ডুব দিয়ে সত্যি করি সব ভুল, মিথ্যে করি, ভাবি
এভাবে তোমার সঙ্গে দানসামগ্রীর মতো ভেসে উঠতে পেরে
সত্যিই গর্বিত আমি, কিন্তু এরপর থেকে অন্যথা জানিও
যেখানে সম্পর্ক সোজা, মহাজাগতিক কোনো অস্থিরতা নেই
সেখানে কখনো গেলে সঙ্গে ভেসে উঠব ঠিক, উপার্জন হয়ে

দুটি কবিতা

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

ধনী ভারত

সরকার মায়ের মতন
তাই তার মারছি টাকা,
ঘুরছে তুমুল স্পিডে
বেওসার চারটে চাকা...

আমি তো ঋণ-খেলাপি
প্রতিদিন করছি হাপিস
গরিবের পাস্তা ও নুন
লক্ষ্মীর হাতের ঝাঁপি

আমার এই কথার খেলাপ
তোমাদেরই নিয়তি বাপ
একা কেন করছ দায়ী
আমিও তো স্তন্যপায়ী

মানুষ না মনে হলেও
মানুষেরই মতন রে ভাই
আমি কেন শুধব টাকা
আমি তো ডলার জমাই।

আমি তো লগ্নি করি
বিদ্যুতে, আবাসনে
দিই ঘুঘু চড়িয়েও দিই
এর-ওর ভদ্রাসনে

তা বলে অভদ্র নাকি
শিল্পের পৃষ্ঠপোষক;
আমার কী করতে পারে
নিউজের দু-চারটে লোক?

করলেও ছাড়ব নাকি
সবই তো আমার মুঠোয়
সবাইকে ছুঁইয়ে রাখি
কার দম, আমাকে ছোঁয়?

জনতা দুঃখে, ক্ষোভে
সরকার পালটে, হাসে
আমিও হেসেই মরি
আমার কী যায় বা আসে?

তখ্‌তে যখন যিনি
দেখি ঠিক তাকেই চিনি;
আমি কেন শুধব টাকা
আমি তো ডলার কিনি।

দরিদ্র ভারত

আমার কিছু করুন, আমি নিঃস্ব...
বাতজ ব্যাধি-বেদনাদিতে পঙ্গু...
বাসের গায়ে জোঁকের মতো লেপটে আছি, হাজার মগ
জল ঢেলেও ধোয়া যাবে না, দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ব
রিজার্ভড কামরায়।

চির-পোয়াতি মেয়েমানুষ পায়ের কাছে বসিয়ে দেবো
বনবিতানে, হেগোডাঙায় এক ছটাক মুক্ত জমি
পেলেই চষে ফেলব আর চাইব আরো একটুখানি
টন-কে-টন, ঘুগনি-রুটি — শালপাতায় উড়িয়ে দিয়ে
অনেক জল ভিতরে টেনে, বলব, বাবু এসেছি।

ফাল্গুনের কৃষ্ণচূড়া ফুলে যেমন উরলি-ঝুরলি
ঠিক তেমনই অধিকন্তু, দোষ হলেও ন-দোষায়...

অনেকদিন ছুটি-ছাটাটো না পেয়ে বাবু ক্লান্ত খুব
তবু টুকুন দয়া করেন — আপনারই তো গোলাম আর
আপনাদেরই বাপ-মা হারা ভাই;
আমায় বাবু আজ্ঞা দ্যান, প্রতিবছর পয়দা করে
ছ-টা, আটটা পয়দা করে...
আপনাদের দেশ এবং আমাদিগের জাহান্নাম ভরিয়ে দিয়ে যাই।

বস্তুবিশ্ব থেকে

অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

মোহদিন ছুঁয়ে যায় সারল্যের তীব্র প্রতিভা
বস্তুবিশ্ব থেকে অপার্থিব প্রেম, ক্ষুধা-বিনিময়ে
হাতবদল হতে থাকে।
যে-সব বালিকা, কিশোরী
কষ থেকে বিষ-ফেনা মুছে
মেখে নেয়, গাঢ় মুখে শ্রাবস্তীপুরের ঘামতেল
ক্লান্তির রাতে, আহত প্রবাস-দিনে
পাখির নীড়ের মতো চোখদুটি মেলে
বরাত পেয়েছে ওরা,
নীড়বদলের মতো প্রতিভা-যাপনে।

তিনটি কবিতা

কৌশিক চক্রবর্তী

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

প্রাসঙ্গিক পৃষ্ঠাগুলি দাগ দিয়ে পড়ে
অনুগত পেনসিল লেখে নোট
পাশের মার্জিনে যা কিছু
বস্তুমতে গুরুত্ব দাবি করে,
সেখানে নিজের কথা নেই, কবিতা নেই
কারণ পরীক্ষাকেন্দ্রে অবাঞ্ছিত অতিথিকে
বাইরে অপেক্ষা করতে বলা রীতি;
সাজেশন নামক এক পরিযায়ী পাখি
এতসব অঙ্ক বোঝে না, সে কেবল ভোরবেলা অ্যালার্ম
বাজিয়ে নিয়মমাফিক পড়া করে, রাত হলে
বাথরুমে নিজের ক্যাবলামোর কথা ভেবে
পড়া ভুলে মাঝে মাঝে কাঁদে

বহুৎসব

আগুন নিভে গেলে কী থাকে, তার কথা যেমন দেশলাই জানে না, তেমনই টেলিফোন তারের
জল ঝরে কোন টবে, কার গোলাপ ফুটে ওঠে ছাদের গোপনীয়তায়, সে-খবরে
চড়ুইপাখিদের কী?
আসলে তো আগুনই পোড়ায়, কখনো নিজেও পুড়তে পুড়তে নাচতে থাকে ডালপালা;
বুক ছুঁয়ে আসা কথামালা জ্বলে যায়, মাথা ঢাকা ঝড় ও বরফের আস্তানা —
না-বলা কথার মানে শূন্য রানওয়ে ভাঙা এরোড্রোমের পাশে বসে বসে বিড়ি জ্বালে
বেকার পাইলট, এ-ছবি কি স্পষ্টভাবে বোঝে কেউ; সে-ই জানে যে এখন রাত হলে
দেখতে পাচ্ছে কোটরের ভেতরে চোরাস্বপ্নের থালায় পুড়ে যাচ্ছে তার বহুদিনকার
না-পড়া ছোপছোপ বংশতালিকা

মর্নিং ওয়াক

একটা আর্তনাদের ভেতর থেকে স্বপ্নের শব্দ
উঠে এসে ভরিয়ে দেয় চত্বর
কেন এত প্রশ্ন ওঠে যদি আমরা ধরেই নিই

যুক্তিজালে আজ কোনো মাছ পড়েনি
যেভাবে এতদিন হেঁটে গেছি মিউজিক কলোনির রাস্তায়
আর ফুরফুরে হাওয়ায় শীত শীত করেছে
ছন্নছাড়া গুমোট নিঃশ্বাস সকালের রোদ
চাদর জড়িয়ে নেমে আসে সেভাবে আবার
গানগুলো উথলে ওঠে তবু
ভয়গুলো মলাট খুলে কাঁধে হাত রাখে
এমন হালকা, সকলে সমবেত স্বরে
চশমা খুলে রেখে তাই দেখতে থাকি
লেকের মাঠের ধার ছেয়ে গেছে
সারি সারি শিকারি কুকুরে

দুটি কবিতা

সৌমনা দাশগুপ্ত

আমি শুধু কবিকে পড়েছি

(জীবনানন্দ আপনাকে)

'এ-নদীর জল
তোমার চোখের মতো ম্লান বেতফল;
সব ক্লান্তি রক্তের থেকে
স্নিগ্ধ রাখছে পটভূমি;
এই নদী তুমি।'

১
কী হত বলুন তো যদি এ-মধ্যরাতে
আপনাকে পাঠিয়ে দিতাম আমার
বিংশপদী অভিমান! হাহাকার উঠত শহরে
অথবা ছিছিক্কার। তবু তো পাঠিয়ে দিতাম।
বালতি বালতি জল উঠিয়ে, লণ্ঠনের স্তিমিত
আগুনে তুমি শব্দ রেখেছ। আমি শুধু
গহন কুয়োর থেকে তুলে আনি অন্ধকার।

কত দিন ধরে তোমাকে পড়েছি —
যা কিছু ছিল না তোমার বৈভব।
তবুও অপার তুমি শব্দে ঐশ্বর্য ঢেলেছ।
ছারপোকার চেয়েও পুরোনো কোনো শহরে
প্রবীণ ছাউনির নীচে অনুমতি ছিল —
অদ্ভুত এক আঁধারের অনুমতি। কতদিন
এইসব গাঢ় রং, এতসব নিরেট দেওয়াল নিয়ে
আমিও খেলেছি; ভূগোলের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে
যে লাভা তোমার করতল ছুঁয়ে
উড়ে গেছে: নিরুত্তাপ প্রজাপতি;
আমি শুধু অই লাভা খুঁজি, প্রান্তিক উদ্বেগ
নিয়ে পাতাল ব্রহ্ম খুঁড়ছি.....

২

জানি এক উত্তাপহীন নীল আগুনে
ঝলসে নেবে আমাকে। এতটুকু আঁচ
লাগবে না, একটুও কুঁচকে উঠবে না
চামড়া। তবু জ্বলে যাক দহনে দহনে।
তখন আশ্চর্য কোনো হাওয়া দেবে অরণ্যে!
থমথমে শিকড় থেকে দাবানলে নেমে যাবে
গাছ। কেউ জানতেই পারবে না — গাছের ফুসফুস থেকে
শুধু ছাই পড়ে, শুধু ছাই পড়ে।

৩

সেগুনের চূড়ান্ত মোচন — এভাবে তোমাকে জানি,
তোমাকে কি সত্যিই জানি!

৪

প্রাগৈতিহাসিক কোনো শহরে, যা ছিল
কাকের ঠোঁটের চেয়েও পুরোনো,
কোনো সৎকারগৃহে মৃতদেহ থাকছিল
পাশাপাশি — নির্ভার কঙ্কাল শুধু
হাত ছুঁয়ে ছিল পরস্পরের।

৫

প্রথাসিদ্ধ প্রেমিকের মতো তুমি আসবে না
জানি। কেননা বসন্তের ঠিক নীচেই

বসিয়ে রেখেছ শকুন। তবু যে শুশুক উঠে আসে
অন্ধকারের এই স্তনের ভিতর থেকে যোনির ভিতর থেকে
তার উন্মুখ ঠোঁটে যদি হৃদয়ের লোনা জল ঢেলে দিই
সম্পূর্ণ নগরী যদি সুনামি হয়ে দুলে ওঠে,
সমগ্র বিদ্যুৎ —
তবুও চুম্বনে যাব
কেননা হৃদয় ফুটছে সোনালি বলের মতো
কেননা তীক্ষ্ণ আদরে ডাকছ
কেননা যুগ্ম পাখির ঢঙে আজ
ঠোঁট নেব, ঠোঁট খাব
বসন্ত! বসন্ত!

৬

মাঝরাতে পৃথিবী নেমে আসে মৃতদের বিছানায়।
রাস্তা খুঁড়ছে শুধু ভাদ্রের কুকুর।
ফ্যাকাশে কাগজ জ্বলে — জ্বলে ওঠে শব্দ!
তখন আমিও কোনো এক ঘাই হরিণীর মতো
তোমার কবিতা থেকে উঠে এসে
তোমাকেই ডাকি লবণের ঘনিষ্ঠ বিনিময়ে

দূরে সেই বাতিঘর আবারও প্রজ্জ্বলিত।

৭

অশ্বত্থের পাতা চুঁয়ে চাপ চাপ ঝরছিল
বাতাস!

ঘাস বলে ডেকেছ আমায় — আসলে
আমি নয়, অন্য কিছুই নয়, জমে যায়
ঘাসের হৃদয় — বালি পোড়ে, বালি পোড়ে।
হৃৎপিণ্ড থেকে খুলে পড়ে তাপ,
ঘাস বলে ডেকেছিলে আমার হৃদয়!
তাই তো ধারালো বিন্দুগুলি গনগনে:
ঘায়ের দগদগে স্বরে শেষ নাভিকুণ্ড থেকে উঠছে
শীৎকার!

নাভি বলে ডাকছ কি আমায়?

৮
অধিকার চাইছি অথবা অনুমতি,
তোমার স্নায়ুর পাতাগুলি সমগ্র পড়বার।
জলের নিভৃত কুঞ্জে আমি তো হতেই পারি
কোনো গাছপাখি — পর্ণমোচনের সুখে
খুলে রাখি সমূহ পালক।
আমি এক ধানসিঁড়ি নদী হয়ে
শুয়ে থাকি তোমার ওপর।

৯
বিছানায় লকলক করে রক্ত!
নির্জন ক্ষত চেটে নেয়।
ফসলের মাঠে ডেকেছিলে — আমি শুধু
উপড়ে এনেছি শিশুগাছ। জনন ঋতুর
থেকে তুলে রাখি আলজিভ: সমস্ত ঠোঁটে
দ্যাখো আজো লেগে আছে মাটি।

১০
কিছুই তো নেই বাকি। তবু তার জের টেনে
শতাব্দীর ব্যাধ আমি ঢেউয়ের শ্বাসরন্ধ্রে
রাখি অলীক বিদ্যুৎ। ভূগোলক একদিন
নামবে প্রপাতে, এমন অর্ধবিশ্বাস নিয়ে
আলোর গতিবেগে ছুঁড়ি হাড়ের কারুকাজ।

একটি জলের গল্প

বুকের ভেতরে জ্বালিয়ে দিয়েছ নীল অহঙ্কার!
তাতেই পুড়ে যাচ্ছে সোনালি জলের আকাশ।
মাস্তুলে এতটা অন্ধকার দেখে গুটিয়ে নিয়েছ
ডানা; অথচ দ্যাখো, শুধু তোমার সঙ্গে
হাঁটব বলেই উজিয়ে এলাম লবণের পাহাড়।
দূরে আমাদের জন্য জ্বলছে আলোঘর.....
এখন তোমার হাতের মুহূর্তটিকে আস্তে
ঠেলা দিলেই শুনতে পাবে তোমার উঠোনে
আমার ডাক। এরপর নিজেকে নৌকো করে দাও,
দেখবে কেমন ভেসে যাচ্ছ আমার জলে.....

রাত্রির আচ্ছন্ন সঙ্গীত

শমিত মণ্ডল

মাথার ওপর রাতের চাঁদ স্থির
এক টুকরো মেঘ এখন তার সঙ্গী।
পাশের ঘরে শিস দিয়ে ডাকছে কম্পিউটার।
একা একাই ছুটে বেড়ায় মাউস
হাবিজাবি লেখা ফুটে ওঠে স্ক্রিনে —
গানের স্যারের প্রেমপত্র, দোলাবউদির বাজারের
ফর্দ। রাত গভীর হলে ফুটে ওঠে, তাঁর, জীবনানন্দের
ডায়েরির কয়েকটা পৃষ্ঠা।

কম্পিউটার শিস দিতেই থাকে। জানি —
একটু পরেই পালিয়ে যাবে কেয়ারটেকারের বউ।

তিনটি কবিতা

অংশুমান কর

ঘরকুনো

বাড়ি পালটালে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় আসবাবপত্রের। পুরোনো বাড়িতে ঠিক যেখানে ছিল ফ্রিজ, তার পাশেই ছিল তেল চিটচিটে কালো বাদামি এক ছোপ। নতুন বাড়িতে ফ্রিজ খুঁজে বেড়ায় সেই কালো ছোপ — সেই তেলতেলে গন্ধ। আলনার ফাঁকে কতকাল লুকিয়ে ছিল তিন আরশোলা। আলনার বুঝি মনে পড়ে না সেই কথা, সেই রোমাঞ্চ? আর ছোট্ট সেই কোণটার জন্য কী যে মনখারাপ হতে থাকে ড্রেসিং টেবিলের। নতুন বাড়িতে আসবাবপত্রের রূপ আর খোলে না। তখন আমরা পরদা পালটাই। ঘর রঙ করি। চাকচিক্যে চেষ্টা করি ভুলিয়ে দিতে ওদের শোক। একসময় সয়ে যায়, পুরোনো হয় শোক। কিন্তু ভোলা যায় না। অনেক অনেক দিন পরে ওদের মন কেমন করতে থাকে পুরোনো সেই ফেলে আসা ঘরের জন্য। তখনই আলনা থেকে হড়কে পড়ে জামাকাপড়, চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হয় ফ্রিজ আর খামোখাই টুকরো টুকরো হয় ড্রেসিং টেবিলের কাচ। হৃদয়-বিদারক সেই শব্দ যে একবার শোনে সে মায়াবী ওই আসবাব ছেড়ে আর দূরে কোথাও যেতে চায় না। লোকে তাকে বলে মূর্খ বড়ো। লোকে তাকে বলে সামাজিক নয়। শুধু আদর করে আসবাবপত্রেরা ডাকে 'ঘরকুনো'।

মধ্য তিরিশে

মাঝে মাঝে একদিন জঙ্গলে যাওয়া ভালো
মাঝে মাঝে একদিন মুখ ডোবানো ভালো তোমার নদীতে
মাঝে মাঝে একদিন
পুরোনো ভুলভালের কথা মনে করে মন খারাপ করা ভালো
ঠাণ্ডা মন খারাপ
মাঝে মাঝে একদিন চলন্ত বাসের আয়নায়
বাঁকাচোরা নিজের মুখ দেখে চমকে ওঠা ভালো
— এ আমি?
না না, সব দিন নয়
একদিন, মাঝে মাঝে একদিন
তোমাতে ভ্রমণ ভালো, বন্ধুর প্রেমিকা

বাজার

বিক্রির দুনিয়া ঘোরে, বিক্রির সূর্যের ডাকে দোর খোলে
বিক্রি লেখা ভোর
কিনেছ নতুন প্রেম, কে বিকোলো? বন্ধুর প্রেমিকা?
সম্পর্ক ঘুরেছে শুধু কেনা-বেচা-বেচা-কেনা-কেনা
অর্ধেক বিক্রেতা, আর অর্ধেক পৃথিবী হল ক্রেতা!

পৃথিবী বিভক্ত করে, সে ভাগ মাথায় নিয়ে
প্রেম ভুলে, সুখ ভুলে, দুঃখবোধ ভুলে, কী মোহে অন্ধের মতো
বাজারের দিকে দেখি ছুটে যাচ্ছে হাজারো পাগল
রাতে ঘুমোবার আগে প্রশ্ন করি : আমি কোন দল?

দেবদূত

তুষার ভট্টাচার্য

বৃষ্টির সম্ভাবনায় জেগে থাকে কোজাগরী ফসলের রাত
মাটির বাড়িতে চাষি ঘুমোয়, পাশে পোয়াতি বউ স্বপ্ন দ্যাখে
পূর্ণচাঁদ আকাশ থেকে নেমে আসে তাঁর কোলে, 'মা' বলে ডাকে।
ভরা ফসলের আশ্বাস নিয়ে ভাঙা ঘরে আসছে দেবদূত।

মায়ার সংসার

মিতুল দত্ত

শূন্য ভেঙে যাওয়ার মতো কেউ
আলগা-হাতে দিচ্ছে নিশিডাক
ভাবের ঘরে শিকল তুলে দিয়ে
আপনমনে পেরোচ্ছি চৌকাঠ

বন্ধ ঘরে মায়া বসত করে
শূন্য মানে মায়ার খোলা দেহ
চামড়া খুলে ডুগডুগি বাজাব?
মায়ার মুখে রামধনু সন্দেহ

মায়ার মুখ মায়ের মতো ভিজে
বুকের দুধ গভীর গাঙীর মতো
এড়িয়ে যাই, পালিয়ে আসি ভয়ে
আড়াল করি ছেঁড়া নাড়ির ক্ষত

ক্ষতের মুখে পাথর জমে ওঠে
যত এগোই, শূন্য বেড়ে যায়
মায়ার পেটে ছিলাম কতকাল —
কত জীবন মায়া আমায় খায় —

ভাবি না আর, আপনমনে হাঁটি
শূন্য থেকে সংখ্যার সীমানায়।

দুটি কবিতা

মলয় দে

শান্তিনিকেতনে একদিন

বিকেল — সমস্ত রাস্তা জুড়ে হলদে লাল প্রসূনের দল —
দেখা যাক, আমাদের, হাঁটার প্রতিভা কতখানি।

রাত — পুরুষের কাছ থেকে সরে, পুরুষেরই মতো তুমি বাঁচো —
বহুদূর চলে গিয়ে বোঝো, অগত্যা সেখানেই আছ।

ভোর তখন ঘুমের ঘোরে, এড়িয়েছ প্রসারিত আলো —
আমি স্নানঘরে, খোলা জানালায় দেখি, সেই প্ররোচনা
ভুলে যাই শাওয়ারের মুখ, বেমালুম স্নানের তাগিদ।

বেলায় তবুও বলেছ তুমি, তোমার রচনা আঁকা পোস্টকার্ডখানা
খামের মতোই অভিজাত — সরাসরি হিংসা ছড়ায়
হিংসা, তবুও ও যে রবিবারে মাংসের স্বাদ!

স্থিতিশিল্প

আবার ডেকেছ তুমি, কর্ষিত হৃদয় থেকে এক আঁজলা আনন্দ চেয়ে;
যদিও বয়েস আছে, তবু আজ — ওইসব কাজ, কথা থাক...
নতুন বসতি হল স্টেশন রোডে, চলো দেখি, কেনাকাটা করি।

মানায়নি মোটে বিউটিপার্লারের অবদান —
সলিটেয়ার, মাদার অফ পার্লের মালা...

তুমি লজ্জা পাও, যেন আমারই স্খলিত অপসৃয়মান মেধা ওইসব —
দেখি, তোলো দেখি, গ্রীষ্মকুঁজোর মতো মুখ...
স্বাস্থ্য ফেরানো চাই — চলো একটু মাংস কিনে নিই, কতদিন পরে...

কী আশ্চর্য দ্যাখো, একটা কুকুর, কখন যে প্রহরী হয়েছে আমাদের —
আকাশে মেঘের স্তূপ বৃষ্টিও হল চারফোঁটা...

শাক্ত চতুর্দশপদী

অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়

১

হৃদয়কমল জুড়ে ধূম জাগে, শোনো পাখোয়াজ
অন্তে তার 'ধূম' শব্দ ওড়ায় ধুনোর আঙরাখা
নৈবেদ্যে সুরুচি নাই, তাই শ্যামা ধূম্রময় চাকা
ঘুরিয়ে পরখ নিচ্ছ সময়ের ধোঁয়াস্রোতে আজ?

আমি যে ধোঁয়ার কথা লিখে দিতে পারি শতকোটি,
ধোঁয়ার পাঁচালি পেড়ে দিতে পারি বঙ্গের বাতাসে —

স্মৃতির ধোঁয়াটে রূপ, ধোঁয়া-ওঠা ভাত আর ধূমবর্ণ কাশে...
তুমিও ভুলো না মাগো পদপ্রান্তে শায়িত ধূর্জটি।

চাপান-উতোর আর তরজামাখা কথা কতদিন
তোমার আমার মাঝে মন্ত্ররূপে ধোঁয়াশা বাড়াবে?
হৃদয়কমলে শুধু সুর বাজে, এ-জীবন যাবে
ধোঁয়ার চরণতলে যেইক্ষণে, সময়ের ক্ষীণ
কেতুপুচ্ছে দেখা দেবে নীহারিকা, চেতনাকুসুম —
তালের ফিরত বৃত্তে পাখোয়াজ সায় দেবে — 'ধূম'।

২

লেলিহরসনা রূপ, কৃষ্ণবর্ণে স্বর্ণের ফোয়ারা,
স্বর্ণকার জানে বুঝি, সোনা ও শোণিতে কিবা স্বাদ?
বিশালাক্ষী ব্যেপে নামে সময়ের গাঢ় পরমাদ
করুণাধারার স্রোতে, রূপ পেয়ে জেগেছ মা তারা?

রসনাকে সোনা মুড়ে কোন স্বাদ ভুলেছে বাঙ্গালি?
রুপোলি ইলিশমাছ, ডাঙাভরা সোনাবর্ণ ধান,
খেতের আনাজ আর গৃহভরা সুখের প্রমাণ
কোথায় লুকাবে বলো, পানের বরজে একফালি
চাঁদের আলোর মতো, ঈদশান্তি, কিবা কারুকাজে
সোনা হয়ে ফলে রবে গৃহস্থের শীতল মাচান
সুবর্ণকুমড়োর লতা, গৃহপার্শ্বে গাভীর বাথান
কীরূপে লুকাবে মাগো, তৃপ্তিময় এশার নমাজে?

লেলিহান জিহ্বা তোর জানে বুঝি, সব স্বাদ জানে?
সোনার সমগ্র জাগে শোণিতের বিলুপ্ত প্রমাণে।

৩

করালী চরণে দ্যাখো প্রচণ্ড করাল মাথা কোটে
করাল কামঠরূপ, কামধেনু অথবা কিঙ্করী —
যেমন আকৃতি নেয়, সেইরূপ দামিনী সঞ্চারি
সে কালো মেয়ের পায়ে করালেরা তারা হয়ে ফোটে।

আকাশ সুনীল নয়, তাতে বুঝি রক্তরাগ মাখা?
হে বঙ্গ, জ্যামিতি ছাড়ো, লয়কালে কিবা আসে যায়!
তথাপি লয়ের ফাঁকে যদি দ্যাখো সুস্থিত প্রজ্ঞায়

ফুটেছে তারার কলি মধুলীন ছায়াপথে আঁকা,
বুঝিবে কলঙ্ক নাই, করাল কেবলি এক ধ্বনি
গণিতে গণিত মিশে লুপ্ত হয় রূপের লাবণি...

'অরূপ! অরূপ!' — ডাকি, রূপে তোমা ভুলাব না তারা,
রূপের পালকি টেনে হেঁটে মরে সে ছয় বেহারা,
করাল তাদের টানে, সেই টানে ভূমার বিলয় —
করালী চরণে দ্যাখো ঠাঁই নেয় সুষুপ্ত সময়।

৪

হৃদয়প্রকোষ্ঠে রাখা আদরিণী শ্যামার চরণ,
উন্মাদ কিশোরী সে যে, ধুলোময় চৈত্রের দুপুরে
পাগলী মেঘের ছায়া, গৃহস্থের খোড়ো চাল জুড়ে
স্নেহের প্রলেপ সে-ই, শ্যামরূপ জলদবরণ।

তাঁহাকে দেখেছে কারা? এই প্রশ্নে গার্হস্থ্য উতল,
গৃহিণী দেখেছে তাঁকে, গৃহস্থও এবং ছাওয়াল
দেখেছে মাঠের মাঝে কৃষ্ণকলি দিক্‌চক্রবাল
ধূলায় আন্ধার ঝড়, বৈশাখের আসন্ন আঁচল...
দেখেছি উড়ন্ত তাঁর প্রান্তহীন ও দিগ্‌বসন
উড়িতেছে রাঢ়ে-বঙ্গে-সমতটে আশার মতন
চৈত্রধূলির দিনে, কালবোশেখির ঝোড়ো পাতা
ভরেছে শ্যামার নামে, বাঙ্গালির চির হালখাতা
বলেছে বছর শুভ, খোড়োচালে যদি দ্যাখো মেঘ,
গৃহ শুভ, স্বস্তি শুভ — দেখিয়াছে বাঙ্গালি অনেক।

পথচলতি

সন্দীপন চক্রবর্তী

বাবা ভেবেছিল
আমি একদিন ইউক্যালিপটাস গাছের মতো লম্বা হয়ে যাব
আমি পারিনি।
মা ভেবেছিল
আমি একদিন শিউলিফুলের সুগন্ধ ছড়িয়ে দেবো
আমি পারিনি।

আরো অনেকে অনেক কিছু ভেবে রেখেছিল
কিছুই আমি পারিনি।

এই না-পারার মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ কাটতে কাটতে
আমি পৌঁছেছি
এক প্রাগৈতিহাসিক গোলোকধাঁধার কেন্দ্রে —
এখানে আমার কোনো বন্ধু নেই, শত্রুও নেই
শুধু এক নরখাদক আমায় সমস্তদিন পাহারা দেয়
রক্তের গন্ধ শোঁকে...

এভাবেই হঠাৎ মাঝরাস্তায়
এই লেখা আমায় থামিয়ে দিতে হচ্ছে।
এরপর ঠিক কী ঘটবে
কেউ জানে না...

গোখেল কলেজ : পুনর্মিলন

বল্লরী সেন

সেদিনকার আইবুড়ো মেয়েদের খোঁপা কিন্তু মাস্ট
হাত-খোঁপা, নেট-খোঁপা, উৎকৃষ্ট বিনুনিবেড়-খোঁপা

স্টাফরুম তাও দেখেছিল কীভাবে বিয়ের দু-দিন
পূর্বেও কলেজে আসতে সে বাধ্য হয়েছিল, সে মানে মেয়েটি

স্টাফরুম মেয়ে-কলেজের কলিজায় হাত রাখে
এখনকার মুখরা নম্বর ওয়ান কেমন অবলীলায় লিপস্টিক

ঠোঁটে দেয়, ব্যাগে নিয়ে আসে। ভেঙে গেছে চুল বাঁধার বালাই
এখন শুধু মাসিক বেতনের মতো কদমছাঁট, আরো ছোটো আরো...

ব্রাদারহুডে ভরে উঠেছে সোফা, টেবিলফ্যান। কাঁটা ক্লিপে
খুব ধার। হাঁ-মুখে ঢুকে যাচ্ছে ডিমের চপ আর মামলেট

কেউ আসে কেউ চলে যায়। যে যাবেই, তার ঠাণ্ডা হাত
ধরা আছে যে এসেছে তার মুঠোর মধ্যে। মণিকোঠায়।
এই সেই নবীনতার ইতিহাস : উপবাস আর উৎসব

বোধন

মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়

লিখতে বসেই দেখি এক যুবতীর দেহ
কাগজের ওপরে শায়িত
নখে নখে বয়সের শব্দ
সকালে বিকালে ম্লান করে,
তাকে দেখবে বলে
জানালা গরাদে মুখ রাখে প্রেমিকেরা
গরাদের ফাঁকে ফাঁকে হৃৎপিণ্ড থেমে আছে।
উত্তেজনা, উদ্বেল সংলাপ টেলিফোনে
এই মেয়ে, শুতে যাবি চল
কাগজ কলম থেকে এবার বিছানা
দেবো প্রাণ, আয় শুরু হোক সুতোগল্প
নানা রূপকথা,
টানটান চুলবাঁধা, প্রদীপের মতো
শান্ত মৃদু জ্বলে ওঠা,
এবার তাকাবি?

চারটি কবিতা

বিক্রম পাকড়াশী

তোমার জন্য

তোমার জন্য সূর্যমুখীর তোড়া
তোমার জন্য সাড়ে-সাতখানা ঘোড়া
সাতখানা তার সূর্যের সাথে ছোটে
বাকি আধখানা ঘুম থেকে জেগে ওঠে
সেই ঘুম যার জেগে ওঠা বিস্ময়
আধঘোড়াদের শরীরে লেগেছে ক্ষয়
লাগাম ছাড়িয়ে বিদ্যুৎ চমকালো
তোমার দু-চোখে রেসকোর্সের আলো

মেঘে মেঘে তার অনুনাদী কম্পনে
বলিষ্ঠ, দ্রুত পেশির সংকোচনে
গোলচক্করে ঘুরছে বিষণ্ণতা
এই ঘোড়া আর নেই ঘোড়াদের কথা

দোপাটির ছড়া

আয় দোপাটি পথ ভুলে
চুল থেকে তোর নিই খুলে
শিমুলতুলো বকুলফুল
তেলকালি আর এত্ত ঝুল
একের পর এক খারাপ লোক
বকুল দিয়েই বাগান হোক
বকুল বাগান বন্ধ ঘর
ঘরের মধ্যে আস্ত ঝড়
ঘর ভেঙেছে সাত কূলে
আয় দোপাটি পথ ভুলে

বর্ষাবরণ

মদ খাব আজ, ভিক্ষাপাত্রে
পয়সা, সঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটা
জমেছে। শীতের পশম হাতড়ে
আগুনের থেকে দূরে কেঁপে ওঠা।
ঘরদোরচালচুলোহীন জামা
কাপড়বিহীন দু-এক বোতলে
ফুটপাথ জুড়ে আলোর বিছানা
বৃষ্টি পড়ছে শহরের কোলে।
দু-হাত বাড়িয়ে আমাদের মুখ
নেশা ধরাচ্ছে ঘর থেকে ঘরে
ভিজে গেছে বুক ভিজেছে চিবুক
খুচরো পয়সা ঝকঝক করে।
আমরা কখনো চাঁদ হয়ে আসি
আমরা কখনো উল্কার বেশে
আমরা কখনো ভালোবাসাবাসি

আমরা কখনো একটি নিমেষে
বৃষ্টি, সঙ্গে কুড়িটা রুপোর
পয়সা। কখনো এভাবে দু-হাত
ভরেনি। কখনো কোনো রাতভর
এভাবে করেনি কেউ মৌতাত।
তারায় তারায় বুড়ি ছোঁয়াছুঁয়ি
পুলিশের গাড়ি, রাতের টহল,
বৃষ্টি, সঙ্গে ঝরে পড়ে জুঁই
রক্তে ছড়িয়েছে অ্যালকোহল।
হাড় হিম করা হাওয়ার কামড়ে
হাত পেতে থাকি স্থির দৃষ্টিতে,
আবার আসব আজকের পরে
কালকে শীতের ভরা বৃষ্টিতে।
গেলাসে গেলাস ঠেকে বহুবার
তারার আলোয় জ্বলে ওঠে মন
ভিজে ভিজে যায় এভাবে আমার
ভিক্ষের বাটি, বর্ষাবরণ।

তোমাকে চাইছি

মৃত্যুভয়ে ভীত প্রাণীকে দৌড় করাতে হয়
বাঁচার আশায় (যদিও বাঁচার কোনো আশা নেই)।
দৌড়তে দৌড়তে দৌড়তে...
তারপর তাকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা বিধেয়।

যখন তার সারা শরীরে মৃত্যুর আর্দ্রতা ছড়িয়ে পড়ছে
গরম নিঃশ্বাস এসে লাগছে মাটিতে
তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে লালা প্রস্রাব বিষ্ঠা —
এসময়ে হত্যা করলে রাঁধলে মাংসের স্বাদ হয় অন্যরকম
একটু আলাদা, খেতে অনেক বেশি ভালো।

তোমাকে এভাবেই চাই,
এভাবেই পশ্চাদ্ধাবন
নিশ্চিত মৃত্যুর মতো —
তোমাকে চাইছি আড়াইখানা পোঁচে,
সেটাই দস্তুর।

প্রেমের প্রথম পাঠ

সৌরভ মুখোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা

রেখেছি তোমার সামনে কিছু শর্ত। সহজ, স্বাধীন।
চোখের ভঙ্গিমা দেখে মনে হয়, এইভাবে নয় —
জলের মতোই আরো সহজে আসার কথা ছিল
বিশ্বাস এমন বস্তু, কখনোই প্রকাশ্যে আসে না।

আলাপ

এসব মুহূর্তগুলো ভালো লাগে, মনে রেখে দিই
না-হওয়া অনেক কথা আচম্বিতে বলা হয়ে যায়
অথবা কিছুই নয়, চুপচাপ অপেক্ষায় দিন
সমূহ প্রস্তুত থাকি, এই বলবে, এই বলবে, এই...

ভালোবাসা

অল্পেতে রেগে যাচ্ছি না, অসম্ভব ফুরফুরে আছি।
সমস্ত ঝামেলাঝক্কি, কুল ব্রেনে প্রবলেম সল্‌ভ
শত্রুকেও ডেকে বলছি, না ভাই রাগ করতে নেই
মাথায় একটাই চিন্তা, সন্ধেবেলা দেখা করতে হবে।

মন্দবাসা

মতে মত মিলছে না, পথে পথ মিলছে না মোটেই
কথার ওপরে কথা, অশান্তিও পাল্লা দিচ্ছে খুব
অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। নাক, চোখ, গলা বেয়ে বেয়ে —
বিন্দু বিন্দু ঝুটঝামেলা ঝরে পড়ছে সন্ধেবেলায়।

হুঁশ

সুমন্ত্র রায়

একটা পাখির শোক টলটল করছে
বারান্দায়; গাঢ়তর হচ্ছে দুপুর।
সুনিপুণ কেঁপে উঠছে ঘোলাটে যুক্তিতে,
শাদা মৃত অভিলাষ; দু-বালতি জল ছাড়া
কারও হুঁশ নেই।

দুটি কবিতা

সুস্মেলী দত্ত

অনুভব

ওই স্পর্শ বড়ো ঠাণ্ডা আর সঞ্চরণহীন
পারে পারে ধূসর কুয়াশা
মহাকাল শান্ত ও নির্জন
শুনতে পাই শব্দ ও ছন্দের সন্ন্যাস।

পর্যটন

চপল দেরাজ জুড়ে সৌজন্যসম্মত আয়োজন
অন্য পারে স্বচ্ছ সম্ভাষণ
দিকে দিকে কমে যাচ্ছে আয়ুর সঞ্চার

চারপাশে নষ্ট পারাপার।

দুটি কবিতা

হিন্দোল ভট্টাচার্য

ঠিকানা

গরিব আমিষগন্ধ চোখে ছুটে যাই
চকচকে তরকারির এত রক্তপাত, যেন পুজোর উঠোনে
এঁটো হয়ে যাচ্ছে ধূপধুনোর বাতাস।
বিষণ্ণ থলের মধ্যে বেচাকেনা করে কাঁধে শ্মশানযাত্রীর
ভার লাগে, — একরাশ রোদের ভেতর
শরীরসমুদ্র থেকে নুন ঝরে যায়।

বয়স হয়েছে, তবু আমার ধারণা
সারাদিন ধরে চারদিকে সব জানলা বন্ধ করে
ভেতরের ঘরে চলে যাব...
যেখানে দেওয়াল ধরে সার বেঁধে পিঁপড়েরাও
গর্তে ঢুকে যায়

অবলম্বন

আমার উচ্চাশা জুড়ে মেঘ করে আসে
কালো কম্বলের নীচে ম্যালেরিয়া কাঁপে যে রকম

অথচ খুব একটা উঁচু শীর্ষের জগতে
কখনো যাইনি আমি। আমার উচ্চাশা শুধু
মাধবীলতার মতো থাকা।

অভাব-ই অহঙ্কার। ছোটোবেলা টিফিনকৌটোয়
যে বিষাদ ছিল, তার শৈশবের সঙ্গে দেখা হয়
আজো, প্রায় প্রতিদিন।

মশা ওড়ে — মাথার বাইরে থেকে মাথার ভেতরে।
জলমগ্ন শোকসভায় ছেলেবেলা থেকে
আমি, বাবাকে হারাই।
কাঁদি না কখনো...

দুটি কবিতা

স্নেহাশিস পাল

অন্ধ ধূপবিক্রেতা

নিবিড় ঘ্রাণে ফুল ফোটায় অন্ধ ধূপবিক্রেতা
পাশে যদি সেভাবেই থাকো তবে কেন
আমার তৃতীয় নয়নে ফুটে ওঠে রুক্ষ-ফসলহীন জমি, বিকল সেচযন্ত্র...
এ হয়তো কোনো অনন্ত শ্রাবণেরই কথা

আবার মাঝরাতে হারিয়ে যাওয়া কোনো তারা
তার সুখ-স্মৃতির গল্প শোনাতে চায় কোনো কসাইকে
তখন আমি সাইকেলে চলেছি গান্ধর্ব-গ্রামে
ওই যে নদীর পাড়ে জেলেদের বস্তি
ওখানে মহুয়া পাওয়া যায় — পান করলে
আমার চৈতন্য বাড়ি ফেরে,
আমি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাই ভাটিয়ালি সুরের মতো

মনে কিছুটা
হেমন্তের বিকেল তখন, কেমন জানি পাখি হতে ইচ্ছে করে
দূরে আরো — দূরে, আরো কাছে... চাঁদের উপর বসি
আকাশের উপর পড়েছে ছায়া : অন্ধকারবীজ...
তা গুঁড়ো করে — তাতে সুগন্ধি ঢেলে
কাঠিতে লাগানো হচ্ছে... হয়ে থাকে...
তাই নয় কি — অন্ধ ধূপবিক্রেতা?

চির

(গোটা দেশকে গুজরাত করব, বলল পরিষদ - আ. বা. পত্রিকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩)

প্রহর জেগে জেগে চোখ ফেরার
প্রহরী শুধু মৃত অন্ধকার নিয়ে
প্রদীপ হয়ে যায়
নিভে যায় পৃথিবীর সব তারা
সব ফুল

সব ফল আজ ধানশিষ হোক
হোক দাড়িওলা রসিদের চাল
হোক পাশের বাড়ির যাদবের গরুর দুধ
প্রস্ফুটিত হয় সুজাতার মাথায়
পরমান্ন ফেরি করে শাদা তার রং

পায়ের তলায় এখনো রক্ত গায়ে তার অশান্ত গন্ধ
আজ শান্তির হাঁড়িতে হিংসার কালো দাগ
পাশে তাকিয়ে আছে নৈরঞ্জনা নদী, প্রতিটি জলকণা যেন সহস্র লাশ
সিদ্ধার্থ কহেন : দাও, সেবন করি পৃথিবীর সব গুজরাত

দাহ্য

সুমন গুণ

১

ডানহাতে গুনে গুনে একুশটা চুড়ি পরত কামিনী। নানা রঙের সব কাচের চুড়ি। প্রতিবারই ওর হাত টেনে গুপ্তকোটরে চেপে ধরার সময় পটপট করে দুটো-একটা ভেঙে যেত।

মহিলাদের সুগঠিত বাহু দেখলেই আমার মুগ্ধদণ্ড কীভাবে তা পেঁচিয়ে ধরবে, আমি ভাবতে থাকি। কামিনীর আঙুলগুলি ছিল খুব পুষ্ট ও সোচ্চার। উত্তেজক পাঞ্জা।

এখন আর কোনো যোগাযোগই নেই ওর সঙ্গে। ফোন করে কথা বলতেও মিহি আলস্য হয়। স্বেচ্ছাবিলাসে ওর কথা ভাবি। ওর নধর কোমর, ভরা গাল আর উপদ্রুত বনপথের কথা।

২

সামনের বেঞ্চে একেবারে বাঁদিকে বসত মেয়েটি। অনুচ্চারিত চুড়িদার, একটি নিঃশব্দ বিনুনি আর সামান্য পাউডারে যে কী গনগনে দেখাত ওকে!

তবে ওর স্বরে কোনো সম্ভাবনা ছিল না। খসখসে আর নিরুত্তাপ শোনাত ওর গলা, যখন কথা বলত।

এই মেয়েটিকেই নবীনবরণের দিন করিডোরে দেখে থেমে গিয়েছিলাম। হলুদ-সবুজে হিংস্র একটি শাড়ি পরেছে, ছাড়া চুল হিলহিল করে ঢেউ তুলছে সারা শরীরে, চোখে-ঠোঁটে সহাস্য প্রসাধন। বন্ধুদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসের মধ্যে আমাকে দেখে তাকাল, অনুতাপহীন ওর হাসির ছোবল নিয়ে আমি, নিরপরাধ স্টাফরুমের দিকে হেঁটে গেলাম।

অনুসরণ

তীর্থশঙ্খ মজুমদার

দ্বিধাগ্রস্ত গোয়েন্দার উদ্বিগ্ন কৌতূহল নিয়ে
উন্মাদের পিছনে আমি কেন হেঁটে যাই!

আশ্চর্য ঘোরের মধ্যে তাঁদের উদাসীন শান্ত বিচরণ
বস্তুজগতের দিকে তর্জনীর ইঙ্গিতে
উন্মত্ত হো হো উল্লাস
দূর থেকে লক্ষ করে বিভ্রান্ত হয়েছি।

পথ-বৃক্ষে ঠেস দিয়ে প্রায় নগ্ন দেবদূত
প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে

মায়ামুক্ত সন্ত যেন ঘন-শ্মশ্রু-ঢাকা-মুখে
বোধিপ্রাপ্ত শ্রমণের নির্লিপ্ত আত্মজ্ঞান লেগে।

ধূসর চুলের জটে, ছেঁড়াখোঁড়া ধুলোর পোশাকে
সেই সব রহস্যের গূঢ় বোধ লুকিয়ে রয়েছে।

গুপ্ত সংকেতের মতো ঐশী তাঁদের দুর্বোধ্য বিড়বিড়
অস্ফুট ধ্বনি।
পাঠোদ্ধারে বারবার উন্মাদের পিছন নিয়েছি।

যমুনা বইছেই

সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য

প্রথম রাত এলে
ছমছম করেছিল
শরীরী বিভ্রম
তুমি ধীরে ধীরে বলেছিলে,
আজ নয়
অভিক্ষেপে স্থির হও আগে
আমার আকাশ ছিল
স্বচ্ছ নীল
চূড়ায় চূড়ায়
কৃষ্ণচূড়া রঙ
হলুদ বনের ডাক
এসেছিল
দূর থেকে
তবু এই রাতটার
জন্য নিশ্চুপে অপেক্ষা
ভুল।
ভাঙতে ভাঙতে পেরিয়ে গেল
ষোলোটি বছর
এখন অপেক্ষা নেই
বিভ্রম নেই
চূড়ায় চূড়ায় কৃষ্ণচূড়া রঙ
ধুয়ে গেছে

বুক তির তির বুক তির তির
যমুনা কিন্তু বইছেই —

বাগানবাড়ি

পাপড়ি গঙ্গোপাধ্যায়

আমরা আজ শহর থেকে দূরে
কেউ কি ছিল মাটির কাছাকাছি?
রাত নামল নিশাচরের সুরে
একটু যদি অন্যভাবে বাঁচি!

কে কাকে ভেবে দরজা রাখে খোলা
একটি ছায়া পুকুরপারে একা
বস্ত্রহীন গাছ দু-হাত তোলা
কৃষ্ণ তবে কলির লীলা দেখাক!

হামা দিচ্ছে সাহসী ক-টা শিশু
উচ্ছিষ্ট ছিল সকালবেলা
একসঙ্গে খাবার-খোঁজা খেলায়
কুকুরগুলো চেঁচায়নি, খুব মিশুক।

আকাশ ফুঁড়ে সার্চলাইট চাঁদ
শোলার থালা-বাসন এলোমেলো
কিছু মাংস, ছড়ানো হাড়গোড়
এ-গ্রাম কবে শেষ খেয়েছে ভাত?

জ্যোৎস্না বেয়ে গড়িয়ে যায় মদ
বাগানবাড়ি মাতাল আজ খুব
সব আত্মা প্রেতাত্মার মতো
জলতেষ্টা — মদে দিচ্ছে ডুব

বিষাদ বয়ে উড়েছে ঈশ্বরী
তার দু-চোখে অ্যালার্ম দেওয়া ঘড়ি
ঘড়ি খুঁজছে হৃদয়-সহ ছেলে
ও ঈশ্বরী, প্রেমের দেখা পেলে?

ছবির মুহূর্ত

সঙ্ঘমিত্রা চক্রবর্তী

স্বপ্নচাষের খুব শখ ছিল রাতজাগা মেয়েটির তাই
সে মনের মাটিকে খুঁড়ে সার মিশিয়েছিল ফুলের
আর তাতে গান লেগে একটা ছবির মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল
ফোটোর বাঁধা-ধরা থেকে ছুটি নিয়ে নেমে এসেছিল
অশোকের বোন, যামিনী রায়ের মেয়েরাও যেন
ঝোঁক ধরে আছে বেড়াতে যাবে বুদ্ধের দেশে

খেতের পর খেত যেখানে লাল গোলাপের মাসে
নতুন পাতায় খেলছে দম্পতি দোয়েল
আর পুত্রকন্যা নিয়ে মধু সংগ্রহে নেমেছে মৌমাছিরা
আজ রাত জাগবার খবরে নিজেকে উজার করে ঋতু

সংক্রামক ব্যাধির জন্য নহে

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্পর্শে এত জলস্ফীতি? পলির গোপন স্তরে তোপ
বেজে ওঠার আগেই চাপ চাপ কাদার আঘাত ছিটকে
ওঠার আগেই আড়ালে রেখেছি যত ভাঁজ খড় চাবির উপমা...
শীতঘুমে অন্ধবেলা ছুটতে ছুটতে তালুর উলটোপিঠে
মুছে নিয়ে ছোপ ফেনা চুম্বনের বিষ... পেরিয়ে গিয়েছি
ছায়া ময়দান তাঁবুর কুয়াশা... নিজেই নিজেকে পিষে
গলিয়ে দিয়েছি ওম... ফোঁটা ফোঁটা পড়ে থেকে বাইপাস
পিচে... খাঁচার কানাচ থেকে ডোরাকাটা অন্ধকার ছুঁয়ে
দর্শক আসনে বসে তুমি আপনি তোমাকে দ্যাখাচ্ছি ট্রিক, দেখুন ওই
শেষ শো-এর আগে রিংমাস্টারের শাসন ছিঁড়ে ধীরে পালিয়ে যাচ্ছে
পেটের গভীরে বেঁধা গুলি রক্ত পুঁজ নিয়ে বেঙ্গল সার্কাসের বাঘ...

বিশল্যকরণী

শবরী ঘোষ

চাবুক মেরে চমকে দাও — আচ্ছা করে বাঁধো
সপাটে গালে থাবড়া মেরে — নিজেই বসে কাঁদো।

তোয়াজ পেয়ে মাথায় ওঠে — মনটা মরে পাথর
পাপড়িগুলি ঝলসে ফেলে — ঢালছে কষে আতর!

দম্ভ, এত দম্ভ ওর! — দম্ভ ভাঙা চাই
জীবন ওর জীবন নয় — তেজস্ক্রিয় ছাই।

আঘাত ওর খুব প্রয়োজন — আঘাত করো ওকে
পাথর কেটে ঝোরা নামুক — গভীরতম শোকে।

জলের হাতে সৃজন আছে — জলেরই নাম প্রাণ
দুই হাতে ওর জীবন ঢালো — ফেরাও সম্মান।

পতঙ্গ

সত্যজিৎ গুপ্ত

আমার ডানায় উত্তাপ ছিল
আগুন ছিল না
পুড়ে যেতে চেয়ে নারী
আমায় ধরাই দিল না।

পুড়তে যদি এতই সুখ
দাবানল জ্বাল্, এ-বুকে
এই ডানা, পুড়ে হোক খাক।

রাক্ষসী আমি তোকেই চাই,
যে কোনো মূল্যে
রাক্ষসী তুই এই বুকে থাক।

তিনটি কবিতা

হিমালয় জানা

খড়কুটো

এই সব আলো-জ্বলা পথে
আমাদের রোজ আনাগোনা
এই সব পরিচিত ভিড়ে
উড়ে উড়ে বেড়ায় বাসনা...

খড়কুটো ধরে এতদিন
ভেসে গেছি পথ থেকে পথে
এ-শহর আমাকে শুধুই
বাঁচিয়ে রেখেছে কোনোমতে

এখানেই আমি একদিন
খুলে দেবো দু-হাতের মুঠো —
যদি তুমি বলে দিতে পারো
কোন হাতে আছে খড়কুটো!

এ-বারের শীতে

কী আর তোমাকে দেবো...
খড়কুটো, মরা ডাল, আগন্তুক
দু-একটা চিঠি?

এর বেশি কিছু নেই
এর বেশি কিছু নই আর

দুঃখের শিরা উপশিরা
তোমার স্পর্শ পেয়ে কেঁপে ওঠে
যে-সব পাতায় —

যদি বলো, এবারের শীতে,
তাদের কাঁপনটুকু পারি
চোখের পাতায় এঁকে দিতে...

বালুচর

যে সব পায়ের চিহ্ন মুছে গেছে এই বালুচরে
যে সব বালির দুর্গ ঢেউ এসে শুধু ভেঙে দিত
তারা আজ জেগে উঠছে দিনান্তের আলোর ভিতরে
অতীত সে বালুচর — সমুদ্রের বাতাসে প্রহৃত —

না-জেনে বুকের মধ্যে বহন করেছ এতদিন...
দ্যাখো সেই বালুচরে সমুদ্র ফিরে আসছে আজ
দ্যাখো ফের মুছে যাচ্ছে, সূর্যাস্তবিভায় রঙিন,
আসক্ত আঙুলে আঁকা বালিতে তোমার কারুকাজ...

রক্তকরবী, রজনীগন্ধা ও 'রাঢ় অঞ্চলের ফুল কার?' ইত্যাদি...

অহনা পাণ্ডা

শুনতে পাচ্ছ?
হ্যাঁ নন্দা, আমি শুনতে পাচ্ছি...

১
করবী শাদা থেকে রাঙা হয়
মানুষ প্রেমে যাচ্ছে
অল্প থেমে থেমে
দ্যাখো...
দাঁড়াও পথিকবর
দ্যাখো...
শতকোটি বুদ্ধিবিকাশ
নীল যে আকাশ
সেই আমার আকাশে
বর্ণহীন মেঘ শুধু ভাসে।

২
রজনীগন্ধা সহজে শুকায় না
শুকায় না আমার শুক্ল বিষণ্ণতা...
আর অমরতা
মধ্যবিত্ত জীবনের প্রস্তর পদাবলী।

৩
লালমাটির গন্ধে
জুড়িয়ে যায়...
সকাল দশটা বাজল প্রায়।
গোবর ও গোবর্ধনের পুজো
নিশ্চয়ী আসব-এ।
ফুলের চিন্তা আমার উপর
(প্রশ্ন একটাই :
ফুলগুলি কার?
তুলতে পারি??)

৪
আমরা সবাই জমিদার, আমাদের
এই জমিদারিগুলিতে...
তাই বলছি
রজনীগন্ধা থাকবে ও
থাকবে রক্তকরবী।
আছে নানা প্রকার ফুল
ও
জ্ঞানী-বিজ্ঞানী (অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক)
গবেষক, চিকিৎসক,
ছিন্নমস্তা ও
স্বর্ণচরি-বালুচরি।

শ্মশান পদাবলী

রজতশুভ্র মজুমদার

দেহ আছে প্রিয় আছে তবু প্রেম পুড়ে ছারখার
জল পড়ে পাতা নড়ে ঘরে ঘরে চৌচির সংসার

চাঁদ ওঠে ফুল ফোটে ভোটে ভোটে কত কথা দান
দিন যায় রাত যায় ক্ষমতায় আসে শয়তান

হাতি নাচে ঘোড়া নাচে দূরে কাছে কত আহ্লাদ
দাঁত নখ ক্ষুরধার জিভে তার রক্তের স্বাদ

যাকে পাবি তাকে ছুঁবি হাবিজাবি কত কলতান
ঘুষখোর জোচ্চোর রাতভোর করে সুরা পান

এত ক্ষয়! ভয় হয়, দেশময় শ্মশানের ছবি
'পাখি সব করে রব?' যত ঢপ মেরে গেছে কবি

তিনটি কবিতা

দেবজ্যোতি মণ্ডল

প্রতীক ভেবে পড়ুন

দিনের পর দিন ধরে এই পাপখেলা
আর খেলতে পারছি না দাদাভাই,
এবার একটা বিহিত জরুরি।
নদীর মধ্যে মড়া স্ত্রী-শরীর
কাঠের লগির মতো এমন ভেসে যাচ্ছে,
লোকে তো কুমির বলে ভুল করছে অহর্নিশ
কুমির এখানে কোত্থেকে আসবে দাদাভাই,
একটু বুঝিয়ে বলুন!
পোষা পায়রা উড়িয়ে ধরে বেচার
ব্যবসা ছিল আগে।
একদিন দেখলাম ডানায় ছিট ছিট দাগ।
ভয় হল। ছেড়ে দিলাম।
ছেড়ে যে দিলাম, কিছুই আর
শক্ত করে ধরা গেল না কোনোদিন
এ-বয়সে আমার ছেলেরও
বড্ড ঘুড়ি ওড়ানোর শখ ধরেছে তার ওপর;
উপায় চাই। উপায়। বাতলাতে পারেন দাদা?

চশমাঘটিত প্রচারকাজ

নাকের ডগায় যদি চশমা থাকে, তবে সেটা হাতে নিয়ে বসুন। একবার ভাঁজ করুন, হাঁটুর উপর রাখুন। বেশ। এবার আবার ভাঁজ খুলে ফেলুন। ফেলেছেন? এবার ভেঙে দিন ডানদিকের ডান্ডিটা। কেমন, এটা তবে এখন চশম হল। খাবেন না, গলায় দিন। শুনুন, প্রতি শনিবার ওটাকে গঙ্গাজলে ধুয়ে নেবেন। ওটাকে উপসর্গ নিলে আপনার বেদনার উপশম। অনুসর্গ নিলে অনুশম। তবে বিসর্গ নেবেন না, বিষম খাবার ভয় আছে। শুনুন, ভয় পাবেন না। পরীক্ষিত। আরো শুনুন, ভুলে যাবেন না কিন্তু।

পোকা

চাষা লোকটির নাম রাষ্ট্রযন্ত্র। দেখা যাচ্ছে সে একটা মাছের চোখ খুবলে ছাড়িয়ে নিয়ে একটা সুতোর ডগায় বেঁধে পরম নিশ্চিন্তে হাতে ঝুলিয়ে দোলাতে দোলাতে হাঁটা দিয়েছে। বাড়ি ঢুকে দাওয়ার ঈশানকোণের কড়িকাঠে ওটাকে বেঁধে রাখবে বলে মনস্থির। পরম আহ্লাদে ভাবছে রাত্রিবেলা চোর ঢুকলে কিংবা মৃদুমন্দ বাতাস দিলে ওইটা প্যাঁক-পোঁক করে শব্দ করে উঠবে, আর সেও সজাগ হয়ে যাবে।

বাঁধ

ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী

আমায় বেঁধেছ তাই আর পিছোব না
পিছোব ভাবলে করেছ মস্ত ভুল
আমার প্লবতা দিয়ে মাটি ধুয়ে খায়
তোমার রক্তে যে-সাপ কুলক্ষণা
কষ্টিপাথরে আঘাতের খাঁজে ফুল
আমাকে ছুঁয়েছ চুম্বনে তাই শিহরন
শেষ বিপদের জেনো তা প্রস্তাবনা
নীবিবাঁধ খুলে দ্যাখো যদি নাভিমূল
সলাজ পরদা ছিঁড়ে হই বিবসনা
ধ্বংসখেলায় মেতে নিঃশেষ হলে
আত্মরতির বিকৃত প্ররোচনা
সব সীমারেখা পেরোব ছাপিয়ে কূল
ষাঁড়াষাঁড়ি বানে সৃষ্টি ভাসিয়ে যাব
সমাজসেবীর শুরু হবে আনাগোনা।

সম্ভার

সুপ্রকাশ ঘোষ

যাওয়া বললেই যাওয়া! শিকড় চারিয়ে গেছে
মাটিতে গভীর। তবু, শিকড় ছিঁড়ে যেতে হবে।
সাপের সঙ্গে কতক্ষণ একসঙ্গে থাকা যায়?
কে চায় সর্বাঙ্গে কাদা মাখতে?

বাতাসে পাল তুলে নৌকো
হু হু ভেসে যাবে। পথে পড়বে কালিদহ, নেতার
ঘাট। হয়তো গভীর সমুদ্রে ডুবে যাবে বিপর্যস্ত তরী।

তবু রেখে যাবে অমূল্য সম্ভার...

দর্পণ

অরিন্দম নিয়োগী

দু-দিকে বন, শাল ও শিমুলের — সামনে প্রান্তর ধু-ধু
পেছনে দিঘি, ঝাঁক ঝাঁক আপেল এসে
ঢেউ তোলে এখানে, তারপর সোনার বুদবুদ সৃষ্টি করে
চলে যায় দুই পাড়ের নৈঃশব্দ্যরেখায়

অনেক কাহিনীর পাটিগণিত পিছনে ফেলে
আমি দিঘির তীরে আসি, বসি
নীল শাদা জল, জলের রসায়ন, নৌকো
কাছিমের পিঠের মতো বিস্তীর্ণ অন্ধকার
ক্রমশ অসত্য হয়ে আসে আমার বসে থাকা
নিস্তব্ধ সূর্যের ম্লান এসে ঠেকে আমার কপালে
রাত্রি ওড়ে, এরকম সময়ে তাকে অনুবাদ করি
যে আমার দিগন্তের দীর্ঘতম দর্পণ!

আগুন

অদিতি ঘোষ

আগুন, এই ক্ষীণ বাহু তুমি আঁকড়ে রইলে সারারাত
সেই সুনামির রাত আমার খড়কুটো আঙুল নিয়ে
তুমি ঘুমিয়ে রইলে, জলের ভিতর
গুঁড়ো গুঁড়ো জ্যোৎস্নার প্লাবন, জলোচ্ছ্বাস —
তুমি উত্তাপ দিলে
তাই তো ভেসে চললাম
এক তীর্থ থেকে দ্বিতীয় তীর্থে।
আগুন, সে আজ পুরোনো কথা।
আজ তোমার উত্তাপ স্তিমিত,
শান্ত হয়েছে জলোচ্ছ্বাস।
আমার গৃহে তোমার উদ্ধারকার্য সমাপ্ত,
তুমি যাও অন্য গৃহে। জলের নীচে সেই কবির ঘর —
পোড়াও আগুন, দগ্ধ করো হিম হয়ে আসা
কবির হৃৎপিণ্ড, আঙুল, দীর্ঘশ্বাস...
আমার এই হাত, এতে সংকেত রেখেছি
যাও আগুন, জলের অন্তরে যাও, এই হাত তাকে দাও
জ্বালানির ব্যবস্থা করো তার
আর আমি এই পড়ন্তবেলায়
ঈশান-অগ্নি-নৈর্ঋতে জলস্থল তার লেখার আয়োজন করি।

একটি আবেদন

বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের জন্য

খেলার সূত্রে দেশ-বিদেশের সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখবার সুযোগ পাই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, উত্তরবঙ্গের পাহাড়, নদী, অরণ্যঘেরা অঞ্চলের মতো এত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ খুব কম জায়গাতেই রয়েছে। **'ইকো ট্যুরিজম'** আর **'অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের'** জন্য তো আইডিয়াল। এখানকার জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণী বিশেষ করে রেডপাণ্ডা, বাঘ, হাতি আর একশৃঙ্গী গণ্ডার তো অসাধারণ। এছাড়াও এখানে দূষণ কম থাকায় এখনও এদিককার জঙ্গলে, জলাভূমিতে নানা প্রজাতির পরিযায়ী পাখিরা আসছে। এরা আমাদের দেশের সম্পদ। এদের সবাইকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদেরই নিতে হবে। হাতির **'করিডোর'** যাতে বিঘ্নিত না হয় সেটা আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। যাতে বাইরে খেলতে গেলে আমরা গর্বের সাথে উত্তরবঙ্গের উদাহরণ দিতে পারি।

আশা করি, আমার এই অনুরোধটুকু রাখবেন। অন্যদিকে কথা দিচ্ছি আমিও চেষ্টা করে যাবো ভালো খেলা উপহার দিয়ে আপনাদের সকলের মাথা উঁচু রাখতে।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়
অধিনায়ক,
ভারতীয় ক্রিকেট দল

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
আই.সি.এ. ৯৪৫/২০০৫

Price : Rs. 75
Vol. : 26 No. : 2

BIVAV

Special Poetry Issue
JAN 2005 - MAR 2005
Published in May 2005
ISSN 0970-1885

Reg. No. : 30017/76
93rd Issue

অল্পদিনেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে
প্রমথনাথ বিশী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট প্রকাশনার
প্রথম আন্তর্জাতিক বাংলা পত্রিকা

প্রতীচী প্রনাবি

একটি সেতুবন্ধনের পত্রিকা

জীবিকার সন্ধানে উচ্চশিক্ষিত, মধ্যশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত বাঙালি জনসমাজ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসে বাধ্য হচ্ছেন। এই বঙ্গভাষী জনগোষ্ঠীর একটি বড়ো অংশ আজ মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। তাঁদের কেউ বুদ্ধিজীবী, কেউ চিকিৎসাজীবী, কেউ শ্রমজীবী। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন জনসমষ্টির অন্তরে রয়েছে একটি দীপ্ত আলোকশিখা। মাতৃভাষার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও প্রীতি এবং সেই সঙ্গে নিজের ভাষায় আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা ও অপরকে জানবার আকাঙ্ক্ষা, তাঁদের আজও বর্তমান। এঁদের এবং অবশ্যই ভারতীয় বাংলাভাষাভাষীদের মিলিত প্রতীক হয়ে অসামান্য মুদ্রণসৌকর্যে প্রকাশিত হয়েছে প্রতীচী।

তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে

সম্পাদক : চিরশ্রী বিশী চক্রবর্তী
মূল্য : ১০০ টাকা (বাংলাদেশ ও ভারত)
যোগাযোগ : জে-২১৭ সাকেত, নিউ দিল্লি-১১০০১৭
দূরভাষ : ৯১-১১-২৬৮৫ ৫৯৫২
দূরবার্তা : ৯১-১১-২৬৯৬ ২৭৩৫
ই-মেল : pratichi_pnb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.pramathanathbisi.org

প্রাপ্তিস্থান
পাতিরাম / দে'জ পাবলিশিং